তারিখ-ই-বাংগালা-ই-মহাবতজঙ্গী

ইউসুফ আলী খান

তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-
মহাবত জঙ্গী

তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই মহাবত জঙ্গী

ইউসুফ আলী খান

কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত
ডক্টর আবদুস সোবহান কর্তৃক সম্পাদিত
মূল ফারসি গ্রন্থের
বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪/জুন ১৯৯৭

বাএ (৯৬-৯৭ ভাসাসপ : ভাষা ও সাহিত্য : ১৪) ৩৬০০

পাণ্ডুলিপি
ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ

প্রকাশক
আজহার ইসলাম ভূঁইয়া
পরিচালক
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

কম্পোজ
চৌকস
১৩১ ডি-আইটি
এক্সটেনশান রোড, ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
একশত পঁচিশ টাকা মাত্র

TARIKH-E-BANGLA-E-MAHABATA JANGI by Usuf Ali Khan in Persian. Edited by Dr. Abdus Sobhan and Published by Asiatic Society, Calcutta. Translated and edited into Bengali by Abul Kalám Muhámmad Zakariah. Published by Azhar Islam Bhuiyan, Director, Language, Literature, Culture and Journal Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Edition : June 1997. Price : Taka 125.00 only.

ISBN 984-07-3609-4

উপক্রমণিকা

১. গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খানের জীবনী

গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খানের জীবনী সম্পর্কে কোনো স্বতন্ত্র রচনা পাওয়া যায় না। এমনকি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন তবতবায়ি তাঁর রচিত সুবিখ্যাত রচনা সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন গ্রন্থে ইউসুফ আলীর রচনা থেকে অনেক কিছু ধার করলেও তাঁর জীবনী সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই বলেননি। তবে তিনি তাঁর সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সিয়ারে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৪৬৬ পৃঃ) বলেন, গ্রন্থকারের পিতা, "গোলাম আলী খান ছিলেন একজন চরিত্রবান ও বিখ্যাত আমির; তিনি কিছুকাল আজিমাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তার (প্রকৃতপক্ষে খালিসা ভূমির দিওয়ানের) পদে কাজ করেন এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ আলী খান সরফরাজ খাঁর এক কন্যা বিবাহ করেন।"

সিয়ারের এই এবং আরও সামান্য কিছু উক্তি ছাড়া ইউসুফ আলী খানের জীবনী সম্বন্ধে আর যা কিছু জানা যায় তা সবই তাঁর রচনা বিশেষ করে আলোচ্য গ্রন্থ ও তাঁর রচিত 'মজমু'-ই-ইউসুফি' গ্রন্থ থেকে। গ্রন্থকার ইউসুফ আলীর প্রথম উল্লেখ দেখা যায় আলোচ্য 'তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গী' গ্রন্থে (তা-ই,৩২ পৃঃ)। সেখানে বলা আছে যে, ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে মীর্জা বাকেরের নিকট থেকে কটক পুনরুদ্ধার করে বাঙলায় প্রত্যাবর্তনের কালে নবাব আলিবর্দী খান বর্ধমানে মারাঠী বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হন। সেখানে আরও বলা হয়েছে, গ্রন্থকার তাঁর পিতাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের সময় তিনি নবাবের সান্নিধ্যে ছিলেন।

গ্রন্থকারের বয়স তখন কত ছিল তা বলা হয়নি। তবে তাঁর বয়স যে খুব বেশি ছিল না এবং তিনি যে বয়সে তরুণ ছিলেন তা অনুমান করা যেতে পারে। তাঁর শ্বশুর নবাব সরফরাজ খান মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন। মৃত্যুকালে ছয় কন্যা ও দুই পুত্রের জনক ছিলেন সরফরাজ খান। মৃত্যুর পূর্বেই গ্রন্থকার নবাবের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন কিনা তা জানা নেই। তবে গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রন্থকার নবাব সরফরাজ খানকে সঙ্গ দিতেন। তাতে মনে হয় খুব সম্ভব গ্রন্থকার নবাবের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তখনকার দিনে বেশ কম বয়সেই বিবাহ হতো বলে আলোচ্য গ্রন্থেই দেখা যায়। খুব সম্ভব গ্রন্থকারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেক্ষেত্রে গ্রন্থকার নবাবের মৃত্যুর সময় আনুমানিক বিশ বছরের ছিলেন বলে ধারণা হয়। তাতে ধরা যায়, গ্রন্থকারের জন্ম হয়েছিল ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে।

আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে দেখা যায় গ্রন্থকারের পিতা গোলাম আলী খান ছিলেন আলিবর্দী খানের অন্তরঙ্গ লোক এবং সেনাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। যখনই তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে আলিবর্দী কোনো বড় ধরনের অসুবিধায় পড়েছেন তখনই তিনি সেই সমস্যা সমাধানের জন্য গোলাম আলী খানের শরণাপন্ন হয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি হায়দর আলী খানের সৈন্যরা বিদ্রোহী হলে আলিবর্দী গোলাম আলী খানকে পাঠিয়েছিলেন সেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসা করতে। এক বর্ণনায় (সিয়ার-ই, ১ম খণ্ড, ৩৮৬ পৃঃ) দেখা যায় ভাস্কর কর্তৃক প্রথম আক্রমণের সময়ে নবাবের প্রধান সেনাপতি মোস্তফা খান যুদ্ধের ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করলে আলিবর্দী তাঁর বন্ধু গোলাম আলী খানকে মোস্তফা খানের নিকট পাঠিয়েছিলেন তাঁর ও অন্যান্য আফগানের মনোভাব জানার জন্য।

আলিবর্দী খানের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন বন্ধু এবং সেনাপতি গোলাম আলীর মতো তাঁর পুত্র ইউসুফ আলী খানও যে তাঁর প্রায় সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন তা বোঝা যায় আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে। আলিবর্দীর জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার সময় গ্রন্থকারকে তাঁর সঙ্গী হিসাবে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মোস্তফা খানের সহচর আউদলশাহ্ মোস্তফা খানকে হত্যা করার তথাকথিত ষড়যন্ত্র নিয়ে আলিবর্দীর দরবারে হৈচৈ ও গোলমাল সৃষ্টি করার সময় গ্রন্থকার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বর্ষাকাল আগত দেখে আলিবর্দী কটক অভিযান থেকে বাঙলায় প্রত্যাবর্তনকালে বাঙলা ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী এলাকায় বরওয়া, ভদ্রক, জাজপুর প্রভৃতি নদী ও ত্রিমোহিনী খাল অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি যে ভয়ঙ্কর অসুবিধায় পড়েছিলেন সেই সময় গ্রন্থকার নবাবের সঙ্গী ছিলেন। এরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে।

গ্রন্থকারের পিতা ছিলেন নবাবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিশ্বস্ত সেনাপতি। কিন্তু গ্রন্থকার কি হিসাবে নবাবের সহচর ছিলেন সেকথা কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নেই। তবে তিনি যে নবাবের কোনো সেনাপতি ছিলেন না তাতে বোধ হয় কোনো সন্দেহ নেই। তবে তখনকার দিনে রাজ দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে যোদ্ধা হতে হত। সেই হিসাবে একজন সৈনিক হলেও গ্রন্থকার ছিলেন খুব সম্ভব নবাবের দরবারের গুণীজনদের একজন। তিনি যে একজন সুপণ্ডিত ও উঁচুমানের লেখক ছিলেন তা আলোচ্য গ্রন্থ এবং এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তাঁর রচিত আরো তিনখানা গ্রন্থই তা প্রমাণ করে।

প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন তাঁর শ্বশুর সরফরাজ খানের সহচর, তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি হন নবাব আলিবর্দী খানের সহচর। কিন্তু সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে তাঁর আদৌ কোনো সদ্ভাব ছিল বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হয়েছে। নবাব মীর মোহাম্মদ জাফর খান ছিলেন তাঁর শত্রু। তবে মীর কাসিম (পরে নবাব) ছিলেন

তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নবাব মীর কাসিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এলাহাবাদ পালিয়ে গেলে গ্রন্থকার তাঁর পিতাকে নিয়ে আলীজা অর্থাৎ নবাব মীর কাসেমের সঙ্গী হন। সেখানে তাঁর বৃদ্ধ ও রুগ্ন পিতা ১১৭৭ হিজরী (১৭৬৩-৬৪ খ্রিঃ) সনে মৃত্যুবরণ করেন। গ্রন্থকার তখন নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সে কারণে তিনি নবাব মীর কাসিমের এলাহাবাদ থেকে চলে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গী হতে পারেননি।

সেই সময়ে তিনি নবাব মীর জাফরের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত থাকলেও দেশে ফিরে আসার জন্য তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছাকে রোধ করতে না পেরে তিনি এলাহাবাদ থেকে পাটনায় আসেন এবং সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার জন্য তাঁর ইংরেজ বন্ধু ডক্টর ফুলারটনের (Dr. Fullerton) সাহায্য প্রার্থনা করেন। মীরজাফর প্রথমে অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেও ডক্টর ফুলারটনের বারবার অনুরোধে নবাব সেই প্রস্তাবে সম্মত হলে গ্রন্থকার ১১৮০ হিজরী সনের রবিউস-সানি মাসে (১৭৬৫-৬৬ খ্রিঃ) মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন এবং এর কয়েক মাস পরে মীরজাফরের মৃত্যু ঘটলে গ্রন্থকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। গ্রন্থকার খুব সম্ভব ১৭৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দে কঠিন অসুখে ভুগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী নবাব নন্দিনীর গর্ভজাত তাঁর একমাত্র কন্যা জরিয়ত-উজ্-জোহরা জীবিত ছিলেন। যুগের বিখ্যাত ব্যক্তি আলী ইবরাহিম খানের সঙ্গে সেই কন্যার বিবাহ হয়। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে বারাণসীতে আসেন এবং সেখানকার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট (প্রকৃতপক্ষে প্রধান বিচারক) পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে 'তারিখ-ই-ইবরাহিম খান' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। বিহার রাজ্যের মুঙ্গের জেলার হাসনাবাদের জমিদার বংশ তাঁর ভাই কাসেম আলীর উত্তরপুরুষ।

আলোচ্য 'তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবতজঙ্গী'-ই ছিল বহুকাল ধরে ইউসুফ আলী খানের রচিত বলে পরিচিত একমাত্র গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষদিকে পাটনা কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারীর অতি মূল্যবান গবেষণার ফলে ইউসুফ আলী খান রচিত আরও তিনখানা অতি মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি হচ্ছে ঃ (১) মজমু'-ই-ইউসুফি (مجموعه يوسفى), (২) হাদিকত-উস্-সফা (حديقة الصفا) ও (৩) ফারসি কবিদের একটি তায্‌কির (تذكر)। নিম্নে গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হল।

(১) মজমু-ই-ইউসুফি ঃ ফারসি ভাষায় রচিত ৩৩৬ 'ফলিওর' (পাতার) এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ আছে এবং তাতে গ্রন্থকারের জীবনের কিছু অংশের দিনপঞ্জি ও আছে। আর আছে হিজরী ১১৭৪ থেকে ১১৮০ (১৭৬০-৬১ থেকে ১৭৬৫-৬৭ খ্রিঃ)

সন পর্যন্ত পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলির সঠিক ধারাবাহিক বর্ণনা। সেই সঙ্গে আছে নাদির শাহ্‌র ভারত আক্রমণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বর্ণনা। তাঁর নিজের জীবনের দিনপঞ্জিতে উল্লিখিত নবাব মীর কাসিমের সঙ্গে গ্রন্থকারের পাটনা গমনের ঘটনাবলীর ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ।

(২ হাদিকত-উস্-সফা ঃ আরবি 'হাদিকুত' (حديقت) শব্দের অর্থ উদ্যান ও আরবি থেকে ফারসি ভাষায় গৃহীত সফা (صفا) শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র। তাতে এই শব্দদ্বয়ের অর্থ পবিত্র উদ্যান বলে ধরা যেতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে ১১৭৩ হিজরী (১৭৫৯ খ্রিঃ) সন পর্যন্ত সময়ের সাধারণ ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উপক্রমণিকা (Introduction) ও উপসংহার (conclusion) ছাড়াও গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। বিভিন্ন খণ্ড বিভিন্ন উপবিভাগে এবং উপবিভাগগুলি আবার বিভিন্ন উপ-উপবিভাগে বিভক্ত।

গ্রন্থের উপক্রমণিকা থেকে জানা যায় যে, গ্রন্থকার নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বকালেই (১৭৪০-৫৬ খ্রিঃ) তাঁর রচনার উপকরণাদি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তিনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন (সেই সমস্যাগুলির কথা তিনি প্রকাশ করতে চান নি)। সেই কারণে সেই সময়ে গ্রন্থটি রচনা করতে পারেননি। আলিবর্দীর মৃত্যুর পরই প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭ খ্রিঃ তিনি গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১১৭৩ হিজরী (১৭৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দে) সনকে গ্রন্থ রচনার বর্তমান বর্ষ বলে তিনি অভিহিত করেছেন। কিন্তু ১৭৫৬-৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আরম্ভ করলেও ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তিনি এই গ্রন্থ শেষ করতে পারেননি। গ্রন্থটির মধ্যে কিছু অসমাপ্ত কাজ ছিল এবং তাঁর জামাতা আলী ইবরাহিম খান তা সমাপ্ত করেন।

এই গ্রন্থে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, গ্রন্থকার একজন প্রথম শ্রেণির ঐতিহাসিক ছিলেন।

(৩) ফারসি কবিদের তায্‌কির ঃ আরবি তায্‌কির (تذكر) শব্দের অর্থ এখানে জীবন স্মরণিকা (a biographical memoir)। এই গ্রন্থে অতি প্রাচীনকাল থেকে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত ৩০০ জন ফারসি কবির সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য আছে এবং তাঁদের তালিকা বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থটি ১৭৭০-৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে রচিত হয়েছিল।

২. বাঙলার নবাবী আমলের ইতিহাস

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আরম্ভ করে বাঙলার শেষ স্বাধীন নরপতি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার (মৃত্যু ১৭৫৭ খ্রিঃ) রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কে বাঙলার ইতিহাসে মোটামুটিভাবে নবাবী আমল বলা হয়ে থাকে। এই সময়ে বাঙলার শাসনকর্তা ছিলেন মুর্শিদকুলী খান নামে অধিক পরিচিত নবাব জাফর খান, তাঁর জামাতা নবাব

শুজা-উদ-দৌলা মোহাম্মদ শুজা-উদ-দীন খান, তাঁর পুত্র নবাব আলা-উদ-দৌলা সরফরাজ খান, আলিবর্দী খান নামে অধিক পরিচিত নবাব মহাবত জঙ ও তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা।

১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য নগ্ন রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব, সরকারি আমলাদের অপরিমিত ক্ষমতা লাভ ও তাঁদের সৃষ্ট প্রাসাদ চক্রান্ত, দক্ষিণে মারাঠাদের অভ্যুদয়, নাদির শাহ্‌র ভারত আক্রমণ ইত্যাদি কারণে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনে শুধু সীমাহীন দুর্বলতাই নয়, চরম বিশৃঙ্খলাও পরিদৃষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার কারণে সাম্রাজ্যের অযোধ্যা, বাঙলা প্রভৃতি অঞ্চলের শাসনকর্তাগণ অধিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং সরকারিভাবে দিল্লীর অধীনে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সেইসব শাসনকর্তা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন। এই সময়ে মারাঠারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠে যে, তারা মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব দাবি করে বসে এবং তা জোর করে আদায় করতে থাকে। কেন্দ্রীয় মোঘল প্রশাসন শেষ পর্যন্ত আপোসেই তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এটিই 'চৌথ' নামে পরিচিত।

সমগ্র দেশে এই 'চৌথ' প্রথা প্রচলিত হলেও বাঙলা ছিল এই অভিশাপ থেকে মুক্ত। তখন বাঙলার শাসনকর্তা ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলী খান। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সরকারিভাবে বাঙলার পূর্ণাঙ্গ সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত না হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙলার প্রশাসনে প্রধান কর্মকর্তা। অবশ্য ১৭০৮ থেকে ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান থাকা কালে তিনি বাঙলার বাইরে ছিলেন। ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাঙলার দিওয়ান পদে পুনরায় নিযুক্ত হওয়ার পর শাহ্‌জাদা আজিম-উশ-শান বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার থাকলেও দিওয়ান মুর্শিদকুলী খানের প্রাধান্য বরাবরের মতোই বাঙলায় বিদ্যমান ছিল বলে প্রামাণ্য ইতিহাসে দেখা যায়।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদকুলী খান (তখনও কারতলব খান নামে পরিচিত) বাঙলার দিওয়ান ও সেই সঙ্গে মুখসুসাবাদের (পরে মুর্শিদাবাদ) ফৌজদার পদে নিযুক্তি লাভ করে ঢাকায় আসেন। তখন সম্রাট শাহ্ আলম বাহাদুর শাহ্‌র দ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌জাদা আজিম-উদ-দীন (পরে আজিম-উশ্-শান নামে অভিহিত) ছিলেন বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার। ১৭০১ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান বর্ধমান ও উড়িষ্যার ফৌজদারি পদ এবং সেই সঙ্গে উড়িষ্যা ও বাঙলায় আজিম-উশ-শানের নিজস্ব ভূমির দিওয়ানি পদ লাভ করেন। ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদকুলী খান উপাধিতে ভূষিত হন। পর বছর (১৭০৩ খ্রিঃ) বাঙলার উপরে উল্লিখিত পদসমূহ ছাড়াও উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। পরের বছর (১৭০৪ খ্রিঃ) তিনি উড়িষ্যা পরিভ্রমণে যান এবং সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই বছরই (১৭০৪ খ্রিঃ) তিনি বিহারের দিওয়ান পদেও নিযুক্ত হন।

অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও সম্রাটকে শুধু নিয়মিতই নয়, বর্ধিত হারে রাজস্ব প্রদান করে থাকার কারণে সম্রাট অওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খানের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন এবং তাঁর প্রিয় পৌত্র ও বাঙলার সুবাদার আজিম-উশ্‌-শানের চাইতেও সম্রাট তাঁকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন সম্রাট এবং সেই যুদ্ধের অধিকাংশ অর্থ যোগান দিতেন বাঙলার দিওয়ান মুর্শিদকুলী খান। সেই রাজস্ব সংগ্রহ করতে তিনি যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেন তাতে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা ও অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জনে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। ফলে সুবাদার আজিম-উশ-শান তাঁর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৌশলে ও প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করলে দিওয়ান মুর্শিদকুলী খান মুখসুসাবাদে (পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ করা হয় মুর্শিদাবাদ) তাঁর সদর দফতর স্থানান্তরিত করেন এবং সমুদয় ঘটনা সম্রাটকে জানিয়ে দেন ফলে সম্রাট আজিম-উশ-শানকে তিরস্কার করে পত্র লিখেন। প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রদেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন তখন সুবাদার। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে দিওয়ান দুই নম্বর ব্যক্তি হলেও তিনি সুবাদারের সরাসরি অধীনে ছিলেন না। তিনি সম্রাট কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হতেন। সুবাদারের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেও মুর্শিদকুলী খানের মতো একজন দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা সুবাদারের অন্যায় ব্যবহারের কাছে নতি স্বীকার করেননি এবং স্বাধীনভাবে তাঁর রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করেন।

সম্রাটের আদেশে আজিম-উশ্‌-শান জাহাঙ্গীরনগর পরিত্যাগ করে বিহারে চলে যান এবং পাটনাতে তাঁর বসতি স্থাপন করেন। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তিনি নিজের নামানুসারে সেই স্থানের নামকরণ করেন আজিমাবাদ। ঢাকা ছেড়ে তাঁর পাটনা যাওয়ার পর এই ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পুত্র শাহ্‌জাদা ফররুখ সিয়ার ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে থাকলেও তাঁর সরকারিভাবে নিয়োগের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাঙলা থেকে সুবাদারের অনুপস্থিতির ফলে মুর্শিদকুলী খাঁন ছিলেন তখন সম্রাট কর্তৃক বাঙলায় নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে উঁচুতম ব্যক্তি এবং তখন (১৭০৪ খ্রিঃ) তিনি ছিলেন তখন (১৭০৪ খ্রিঃ) বাঙলার দিওয়ান, বিহারের দিওয়ান, উড়িষ্যার সুবাদার এবং মুর্শিদাবাদ, শ্রীহট্ট, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও কটকের ফৌজদার। তাতে দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে বাঙলা ও বিহারের প্রশাসনের ব্যাপারে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল এবং ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট অওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর এই কর্তৃত্ব বজায় ছিল।

১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহ আলম বাহাদুর শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে নিজ পুত্র আজিম-উশ্‌-শানের প্ররোচনায় মুর্শিদকুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে পদোন্নতিই দেন। কিন্তু ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকেই মুর্শিদকুলী খানকে বাঙলার দিওয়ান পদে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়। পরের বছর তাঁকে মেদিনীপুর ও

হুগলির ফৌজদার পদে নিযুক্ত করা হয় এবং ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাঙলার নায়েব-সুবাদার পদে নিযুক্তি লাভ করেন। (১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে) তাঁকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করে জাফর খান উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে মোতা-মাম-উল-মুলক আলা উদ্-দৌলা জাফর খান বাহাদুর নাসিরী নাসির জঙ উপাধিতে ভূষিত করে বাঙলার সুবাদার পদেও নিযুক্ত করা হয়। তবে তখন থেকে বিহার রাজ্যের সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক থাকেনি।

এর আগে তিনি তাঁর অধীনস্থ রাজ্যসমূহের বিশেষ করে বাঙলার রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুসংহত করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে যতটা সম্ভব প্রশাসনিক ব্যবস্থাকেও। সুবাদারি লাভের পরে মুর্শিদকুলী খান প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় হস্তে পরিচালনা করেন। সমগ্র বাঙলা সুবাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করে রাজস্ব ব্যবস্থাকে তিনি নতুন করে ঢেলে সাজান এবং রাজস্ব আদায়ের পথ অধিক সুগম করেন। নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সময়মতো রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ জমিদারদের কারারুদ্ধ পর্যন্ত করেন। তাতে অনিবার্য কারণেই প্রজা সাধারণের উপরও সেই উৎপীড়নের প্রভাব পড়ে। তবে তাঁর কঠোর শাসনের ফলে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

তিনি ছিলেন আদিতে একজন ব্রাহ্মণ সন্তান, কোন স্থানের তা তথ্যের অভাবে সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। বাল্যকালে শফি ইসফাহানি নামক মোঘলদের একজন ইরানি উচ্চপদস্থ রাজস্ব কর্মকর্তা তাঁকে ক্রয় করেন এবং মোহাম্মদ হাদি নাম দিয়ে তাঁকে পুত্র রূপে পালন করেন এবং তাঁকে সুশিক্ষা দান করেন। হাজী শফি ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে নিয়ে ইরানে চলে যান। তাঁর মৃত্যুর পর মোহাম্মদ হাদি খুব সম্ভব ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ভারতে ফিরে আসেন এবং বেরারের দিওয়ান হাজী আবদুল্লাহ্ খোরাসানীর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। সেই চাকুরিটি ছিল খুব সম্ভব রাজস্ব বিভাগে।

অসাধারণ মেধা ও কর্মদক্ষতার কারণে তিনি চাকুরিতে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করতে থাকেন এবং সম্রাট অওরঙজেবের সুনজরে পড়েন। তিনি করতলব খান উপাধিতে ভূষিত হন এবং বাঙলার দিওয়ানের পদ লাভ করে ১৭০১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ঢাকাতে প্রেরিত হন তারপর তিনি যে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করে শেষ পর্যন্ত বাঙলা ও উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

দাক্ষিণাত্যে থাকা কালে তিনি শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খানের সান্নিধ্যে আসেন। ইরানের তুর্কী আফশার গোত্রীয় ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় শুজা খানের এক পূর্ব পুরুষ আলী ইয়ার সুলতান ছিলেন খোরাসানের ফারাহ্ প্রদেশের গভর্নর (শাসনকর্তা)। শুজা খানের পিতামহ ছিলেন নবাব আকিল খান এবং তাঁর পুত্র ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুরের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা নূর-উদ-দীন খান। করতলব খান শুজা-উদ-দীনের সঙ্গে

তাঁর একমাত্র সন্তান জেবুন্নেসার (মতান্তরে জিন্নুতেন্নেসা) বিবাহ দেন খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে। উড়িষ্যার সুবাদারি লাভের পর তিনি তাঁর জামাতাকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অচিরেই জামাই ও শ্বশুরের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরে। এর প্রধান কারণ ছিল দুইজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ধর্মান্তরিত মুসলিম হলেও ব্যক্তিগত জীবনে নবাব মুর্শিদকুলী খান ছিলেন একজন আদর্শ মুসলমান তিনি তাঁর একমাত্র স্ত্রীকে নিয়েই জীবন অতিবাহিত করেন এবং অন্য কোনো নারীর সংসর্গে আসেননি। আর অসংখ্য মানবিক গুণের অধিকারী হলেও নারী দেহের প্রতি শুজা খানের আসক্তি ছিল সীমাহীন এবং সমসাময়িক একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে জানা যায় তিনি চার ঘন্টার অধিককাল কোনো না কোনো নারীর সংসর্গ ছাড়া থাকতে পারতেন না। জেবুন্নেসার গর্ভজাত সন্তান ছিলেন নাফিসা বেগম ও নবাব সরফরাজ খান আর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন নবাব তকী খান ও দুর্দানা বেগম। (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী)। খুব সম্ভব শেষোক্ত এই স্ত্রী ও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে শুজা খান কটকে থাকতেন এবং জেবুন্নেসা থাকতেন তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে মুর্শিদাবাদে তাঁর পিতার সঙ্গে।

শুজা খানকে সহ্য করতে পারতেন না বলে নবাব মুর্শিদকুলী খান তাঁর দৌহিত্র আলা-উদ-দৌলা সরফরাজ খানকে বাঙলা ও উড়িষ্যার সুবাদারি দিয়ে যেতে চান এবং তাঁকে বাঙলার দিওয়ান পদেও নিযুক্তি দান করেন। দিল্লীর ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেও সেখানকার আনুষ্ঠানিক সমর্থন ছাড়া বাঙলার সুবাদার নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না বলে নবাব মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সম্রাটের দরবারে শুজা খানের অধিক প্রভাব থাকার ফলে বাঙলার সুবাদারের জন্য তাঁর আবেদনই সম্রাট কর্তৃক গৃহীত হয়। এই সংবাদ পাওয়ার আগেই শুজা খান মৃত্যু পথযাত্রী শ্বশুরের মসনদ অধিকারের জন্য কটক থেকে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বর্ধমানের নিকটবর্তী এক স্থানে তিনি বাদশাহী নিযুক্তিপত্র ও শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ পান। মৃত্যুর আগে মুর্শিদকুলী খান সরফরাজ খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেলেও সরফরাজ খান পিতার অবাধ্য না হয়ে তাঁর অধীনে দিওয়ানের পদ গ্রহণ করেন। শুজা খান কটক ছাড়ার আগে তাঁর অপর পুত্র তকী খানকে উড়িষ্যা প্রদেশের শাসনভার দিয়ে আসেন। এই সব ঘটনা ঘটে ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে।

নারীদেহের প্রতি সীমাহীন লোভ থাকলেও শুজা খান ছিলেন অশেষ মানবিক গুণাবলির অধিকারী। তিনি ছিলেন ন্যায় বিচারক এবং দান-খয়রাতের ব্যাপারে অত্যন্ত মুক্তহস্ত। সর্বোপরি প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। তাঁর শ্বশুরের কঠোর রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি সহজতর ব্যবস্থা গ্রহণ করে অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু পরিণত বয়স হওয়া সত্ত্বেও নারীদেহের প্রতি তাঁর

আসক্তি বাড়তেই থাকে। রাজকার্য অবহেলা করে তিনি ভোগ-বিলাসে নিজেকে মত্ত রাখেন এবং রাজ্যশাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত করেন হাজী আহমদ, রায় বায়ান আলম চাঁদ ও ধনকুবের জগৎশেঠের হস্তে। পরিণামে এই সব লোকের কর্তৃত্ব খুবই বেড়ে যায়।

হাজী আহমদ ছিলেন সম্রাট অওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহ্জাদা আজমের 'শিলাঞ্চী' (খানসামা) তুর্কী আফশার গোত্রীয় মীর্জা মোহাম্মদের জ্যেষ্ঠপুত্র ও মীর্জা মোহাম্মদ আলী বা মীর্জা বন্দে ছিলেন (পরে নবাব আলিবর্দী খান) তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধে শাহ্জাদা আজম নিহত হলে মীর্জা মোহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ চরম দুর্দশায় পতিত হয়ে প্রায় কর্পদকহীন অবস্থায় নবাব শুজা-উদ-দীনের কাছে আসলে সগোত্রীয় ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় এই পরিবারকে তিনি আশ্রয় দেন এবং মীর্জা মোহাম্মদ, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মীর্জা মোহাম্মদ আলী, জ্যেষ্ঠ পুত্র হাজী আহমদ ও তাঁর তিন পুত্রকে বিভিন্ন চাকুরি প্রদান করে তাঁদের বেঁচে থাকার পথ সুগম করে দেন। হাজী আহমদ ও আলিবর্দী উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কর্মতৎপর। মীর্জা মোহাম্মদ আলী অচিরেই চাকুরি ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন এবং হাজী আহমদ তাঁর দক্ষতার পরিচয় দেন শুজা খানকে পরামর্শ দানের ব্যাপারে। তবে শুজা খানের প্রথম রিপুর পরিতুষ্টির ব্যাপারে হাজী আহমদ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করতেন বলে কোনো কোনো সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিশেষ করে আলোচ্য গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খান বলে গেছেন।

বাঙলার নবাবি লাভের পর শুজা খানের নিকট রাজ্যের স্তম্ভ বলে বিবেচিত হতেন হাজী আহমদ, আলম চাঁদ ও জগৎশেঠ। তখন ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন শুজা খানের জামাতা (কন্যা দুর্দানা বেগমের স্বামী) দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ। ইতোমধ্যে (খুব সম্ভব ১৭৩৪ খ্রিঃ) কটকের নায়েব নাজিম তাঁর পুত্র নবাব তকী খানের মৃত্যু হলে নবাব শুজা খান রুস্তম জঙকে কটকের নায়েব সুবাদার করে সেখানে প্রেরণ করেন। মীর্জা মোহাম্মদ আলীকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করে তাঁকে আলিবর্দী খান উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং সম্রাট কর্তৃক বিহারের সুবাদারির দায়িত্ব শুজা খানকে প্রদান করা হলে তিনি আলিবর্দী খানকে বিহারের নায়েব নাজিমের পদে নিযুক্ত করেন। অত্যধিক ভোগ বিলাস ও অমিতাচারের কারণে নবাব শুজা খান দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র নবাব আলা-উদ-দৌলা সরফরাজ খান বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

পিতার মতো নারীদেহের প্রতি যথেষ্ট আসক্তি থাকলেও প্রকাশ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। রমজান মাস ছাড়াও আরও দুই মাস এবং আরও অনেক বিশেষ দিনে তিনি রোজা রাখতেন। নামাজ আদায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই তৎপর ও নিয়মনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ এবং প্রশাসনের দক্ষতা তাঁর খুব একটা ছিল না। তিনি মানুষকে বিশ্বাস করতেন এবং সরল মনে এমন সব কথা বলে

ফেলতেন যা একজন প্রশাসকের পক্ষে মোটেই সমীচীন ছিল না। তাঁর পিতার আমলের উল্লিখিত তিন নেতার উপদেশেই তিনি চলতেন এবং পিতার আমলের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরই তিনি তাঁদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন। ফলে তাঁর তিন উপদেষ্টা হাজী আহমদ, রায় রায়ান আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃতপক্ষে শাসনব্যবস্থা তাঁদের নির্দেশ মতোই চলতে থাকে। সেই সুযোগে অতিশয় চতুর হাজী আহমদ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলিবর্দীকে বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত করার চক্রান্ত কার্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হন তাঁর অপর দুই সতীর্থের সহযোগিতায়।

আলিবর্দী খান ছিলেন অসাধারণ প্রশাসনিক ও সামরিক প্রতিভার অধিকারী। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিক্ষুব্ধ বিহার প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে কৃতকার্য হন। কিন্তু তাঁর উচ্চাভিলাষ ছিল আকাশচুম্বী, লোভ ছিল অপরিমেয় ও স্বার্থপরতা ছিল সীমাহীন। সেই সঙ্গে মিথ্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তবে মিতাচার ও নারীঘটিত ব্যাপারে তাঁর চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ। কিন্তু তাঁর এসব দৈন্যকে নিজের মধ্যে পূরণ করে দিয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদ। আলিবর্দীর মতো তাঁর সীমাহীন লোভ ও স্বার্থপরতার সঙ্গে যোগ করা ছিল নীতিজ্ঞানহীনতা। দুই ভাইয়ের মধ্যে বহুদিন ধরে পরামর্শ চলছিল কি করে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসন ক্ষমতা অধিকার করে একটি স্থায়ী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করা যায়। দুই ভাইয়ের স্বার্থও ছিল এক এবং অভিন্ন। কারণ, আলিবর্দীর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না, ছিল মাত্র তিনটি কন্যারত্ন এবং তাঁদেরকে হাজী আহমদের তিন পুত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছিল। অতএব দুই ভাই সুযোগের সন্ধানে রইলেন।

সুযোগ করেও নিলেন তাঁরা। তিন উপদেষ্টার অন্যতম হাজী আহমদ থাকতেন মুর্শিদাবাদে। তিনি সুকৌশলে আলমচাঁদ ও জগৎশেঠকে নিজ দলে টেনে নিলেন এবং কি করে সরলপ্রাণ সরফরাজ খানকে অপসারিত করে আলিবর্দীকে সিংহাসনে বসানো যায় সেই চেষ্টায় লেগে গেলেন। ইতোমধ্যে রাজ্যে কোনো অশান্তি না থাকার কারণে ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে হাজী আহমদের পরামর্শে নবাবের সৈন্য বিপুলসংখ্যায় হ্রাস করা হয় এবং বিহার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা বিরাজমান বলে আলিবর্দীর সৈন্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করা হল। রাজমহল ছিল বাঙলা ও বিহারের মধ্যে একমাত্র প্রবেশপথ। সেখানকার ফৌজদার ছিলেন হাজী আহমদের এক জামাতা আতাউল্লাহ্ খান। তাঁকে অপসারণ করে সেখানে নিজের জামাতাকে নিয়োগ করার আদেশ দিলেন নবাব। এই রাজমহলের ভিতর দিয়েই আলিবর্দী আসবেন মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করতে। অতএব সে স্থান কিছুতে হাতছাড়া করা যায় না। নীতিজ্ঞান বিবর্জিত হাজী আহমদ নবাবের পদলেহন করে কয়েক মাসের জন্য আতাউল্লাহ্ খানকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করলেন সরল হৃদয় সরফরাজ খানের নিকট থেকে। ইতোমধ্যে আলিবর্দী কর্তৃক মুর্শিদাবাদ অভিযানের প্রস্তুতি চলছে পূর্ণ উদ্যমে।

ইতোমধ্যে দিল্লী দরবারে নিযুক্ত বাঙলার উকিলের মাধ্যমে আলিবর্দী আবেদন করলেন বিহারের (কোনো কোনো মতে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার) সুবাদারির পদে তাঁকে নিযুক্ত করার জন্য। দরবারে নিযুক্ত বাঙলার উকিল ছিলেন আলিবর্দীর প্রতি অপ্রসন্ন। তিনি সেই আবেদনপত্র নবাব সরফরাজ খানের কাছেই পাঠিয়ে দিলেন। নবাব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আলিবর্দীর নিকট থেকে হিসেব চেয়ে বসেন এবং নবাব শুজা খানের সময় থেকে যেসব সৈন্য সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে মুর্শিদাবাদে ফেরৎ পাঠাবার জন্য আদেশ দেন। আলিবর্দী সৈন্যদেরকে মিথ্যা কথা বলে নবাবের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলেন। যথাযোগ্য প্রস্তুতি গ্রহণের পর রাজমহল অতিক্রম করে এবং সুকৌশলে সব সংবাদ গোপন রেখে এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আলিবর্দী বাঙলায় উপস্থিত হয়ে নবাবের নিকট কপট বিনয়ের সঙ্গে এই পত্র লিখেন ঃ

"হাজী আহমদের প্রতি অপমান ও অবমাননা সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং তা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এখন তা প্রকাশ্যে মুখোমুখী হওয়ার অবস্থায় এসে পড়েছে। আপনার অনুগত ভৃত্য (অর্থাৎ আলিবর্দী) তার পরিবারের সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে এ স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং মহানুভবের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য প্রদর্শন ব্যতীত ভৃত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, মহামান্য প্রভুর অনুগ্রহ ও বদান্যতার ফলে হাজী আহমদকে আমার নিকট প্রেরণ করা সম্ভব হবে।"

নবাব সরফরাজ খান আলিবর্দীর এই পত্র এবং সসৈন্যে তাঁর বাঙলায় আগমনের এই সংবাদ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কারণ, আলিবর্দীর সার্বিক প্রচেষ্টার ফলে তাঁর এই অভিযানের সংবাদ এর আগে মুর্শিদাবাদে পৌঁছেনি। তাঁর সভাসদদের মধ্যে হাজী আহমদকে আলিবর্দীর নিকট প্রেরণের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত ভাল মানুষ নবাব তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে আলিবর্দীর নিকট যেতে দিলেন এই মিথ্যা আশায় যে, তার ফলে হয়ত আলিবর্দী নবাবকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবেন।

কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল এবং সেই সঙ্গে দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীদের আসা-যাওয়াও চলল এবং নবাব বিশ্বাস করলেন যে, আলিবর্দীর পক্ষ থেকে হয়ত আক্রমণের কোনো আশঙ্কা নেই। তবু তাঁর যুদ্ধের ছাউনি থেকে তিনি তাঁর দু'জন অতি বিশ্বস্ত কর্মকর্তা পাঠালেন আলিবর্দীর প্রকৃত মনোভাব অবগত হওয়ার জন্য। তাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রভুর মতোই বুদ্ধিমান। তাঁরা আলিবর্দীর শঠতাপূর্ণ বাক্য এমনভাবে বিশ্বাস করলেন যে, তাঁরা এসে নবাবের নিকট নিবেদন করলেন ঃ "মহাবত জঙ [বরাবরের মতো] আজ্ঞাবহ ও অনুগত আছেন এবং তিনি নিবেদন করেছেন 'কোনো মহান ব্যক্তি যখন কোনো মানুষকে হীন ও অখ্যাত অবস্থা থেকে উন্নীত করে বৈশিষ্ট্য

প্রদানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করে তাঁর সভাসদ ও অমাত্যদের পর্যায়ভুক্ত করে সম্মান দান করেন তখন সাধারণত তাঁর আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা করা ও তাঁর মান-সম্মান রক্ষা করাকেও তাঁর দায়িত্ব বলে মনে করেন। মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি (অর্থাৎ আলিবর্দী) এই রাজপরিবার কর্তৃক প্রতিপালিত ও সম্মানিত এবং সেই কারণে মহামহিমের (অতীত) অনুগ্রহের জন্য এই পরিবারের প্রতি অনুগত থাকা সঠিক বলে মনে করে। খেদমতের জগতে হুজুরের প্রতি গভীর অনুরাগ ও বিশ্বস্ততা ব্যতীত প্রকাশ্যে বা গোপনে এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তি এ পর্যন্ত অন্য কোনো অপরাধ করেনি। আমি মনে করি যে, এই ব্যাপারে আমি হুজুরের আর সব ভৃত্য ও কর্মকর্তার প্রত্যেকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা করি যে, আপনি আমার দু'টি অনুরোধ রক্ষা করবেন। প্রথমত পরলোকগত নবাবের আদেশে এই রাজ্যের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য আমি একটি সেনাবাহিনী গঠন করেছিলাম। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এই রাজ্যের রাজস্ব থেকে তাদের বেতন দেওয়া যায়নি। সেই কারণে সৈনিকেরা তাদের বকেয়া বেতন পাওয়ার জন্য আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে যাতে তারা মহামহিমের নিকট থেকে তাদের বেতন পেতে পারে। আমি আশা করি যে, মোট সাত লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে যাতে তাদের দাবি পূরণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত মর্দান আলী খান, মীর মর্তুজা, হাজী লুৎফে আলী খান ও মোহাম্মদ ঘউস খান প্রমুখদের নিয়ে গঠিত যে দলটি হুজুরের মনে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং হুজুরের দীন ভৃত্যের প্রতি আপনার মনকে বিষিয়ে তুলেছেন তাঁদেরকে দরবার থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে যাতে আপনার এই গোলামের প্রার্থনা গৃহীত হলে সে আপনার সান্নিধ্যে বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা, বিশ্বস্ততা ও শান্তির সঙ্গে উপস্থিত হতে পারে। কোনো কারণে এই প্রস্তাব যদি হুজুরের মনঃপূত না হয় তবে হুজুর নিজেকে এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন করুন এবং তাঁদেরকে আমার সম্মুখীন হতে পাঠিয়ে দিন। যদি তাঁরা বিজয়ী হন তবে [তাঁদের] আশা পূর্ণ হবে কিন্তু তাঁরা যদি পরাজিত হন তবে এই ভৃত্যের মনের অন্তর্নিহিত পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য নিয়ে নিজেকে হুজুরের সমীপে হুজুরের খেদমতের জন্য উপস্থিত করবে।"

একখানা কোরান শরীফের উপর হাত রেখে আলিবর্দী এই শপথ গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল একটি বাক্সের মধ্যে রক্ষিত ও বস্ত্রাদি দ্বারা সুন্দর রূপে আচ্ছাদিত একটি ইষ্টক মাত্র। সরলহৃদয় নবাব এই প্রতারণায় বিশ্বাস করে নিজের তাঁবুতে সৈন্য সামন্ত নিয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন থাকাকালে আলিবর্দী খান শেষ রাতে নবাবের শিবির আক্রমণ করেন। নবাব সরফরাজ খান সেদিন রোজা রেখেছিলেন। কামান-বন্দুকের গোলার আওয়াজে নিদ্রাভঙ্গের পর বাধ্য হয়ে তাঁকে যুদ্ধে অগ্রসর হতে হলো। তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধে অগ্রসর হলে হস্তীপৃষ্ঠে তাঁর দেহে একটি গোলার আঘাত লাগলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করেন। কোনো কোনো সূত্রে জানা যায় যে, আলিবর্দীর নির্দেশে এক গুপ্ত ঘাতকের গুলিতে নবাব নিহত হয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরও তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিগণ প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করতে থাকেন এবং সেনাপতির মধ্যে অনেকেই নিহত হন এবং কেউ কেউ আহত হন। কিন্তু নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতিদের মধ্যে কেউ রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেননি। অতি কষ্টে যুদ্ধে জয় লাভ করে আলিবর্দী চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে নিজে মুর্শিদাবাদে না গিয়ে তিন দিন শিবিরে অপেক্ষা করেন এবং হাজী সাহেবকে সৈন্য-সামন্ত দিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। বিজয়ী সৈন্যরা তিনদিন ধরে শহর লুন্ঠন করে।

তিনদিন পরে বিজয়ী আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে পৌছে সরাসরি সিংহাসনে উপবেশন না করে চাতুরি করে নবাব সরফরাজ খানের জ্যেষ্ঠ্যা ভগনী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয়া নফিসা বেগমের গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁর কৃতকর্মের জন্য গভীর অনুতাপ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং মরহুম নবাবের পরিবাবের শুধু প্রতিটি সদস্য নয় তাঁদের ক্রীতদাসদের স্বার্থও সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন বলে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতি দেন। উত্তরে নাফিসা বেগম একটি শব্দও উচ্চারণ না করে স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

আলিবর্দী সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করতে থাকেন এবং প্রজাদের মন জয় করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু নফিসা বেগমের নিকট তাঁর প্রতিজ্ঞা যে নিছক ভন্ডামি ছিল সেই প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর উড়িষ্যা রাজ্য অধিকার করার প্রচেষ্টা দেখে। মরহুম নবাব শুজা-উদ-দীন খানের জামাতা লুৎফউল্লাহ মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ ছিলেন বহু বছর আগে (১৭৩৪ খ্রিঃ) থেকেই সেখানকার নায়েব নাজিম। আলিবর্দী সেই রাজ্য অধিকার করতে চাইলে দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব হল। আলিবর্দী দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে লিখে পাঠালেন তাঁর ধন দৌলত ও পরিবার-পরিজন নিয়ে উড়িষ্যা রাজ্য ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে যেতে। এই-ই-ছিল তাঁর সন্ধির শর্ত। রুস্তম জঙ দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর জামাতা মীর্জা বাকের তাঁদের রাজ্য রক্ষার জন্য কটক থেকে সামান্য অগ্রসর হয়ে উড়িষ্যার বালেশ্বর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা সমুদ্রপথে নৌকাযোগে বালেশ্বর থেকে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান।

আলিবর্দী উড়িষ্যা রাজ্য অধিকার করে তাঁর দ্বিতীয় জামাতা ও ভাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহমদ খান সওলত জঙকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করে তাঁকে সৈন্য-সামন্তসহ কটকে রেখে রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। ইতঃপূর্বে বাঙলা অভিযানে আগমন কালেই তিনি তাঁর তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও কনিষ্ঠ জামাতা নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পিতা জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানকেও বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্তি করে এসেছিলেন এবং প্রথম ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রথম কন্যার স্বামী নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান শাহামত জঙকে বাঙলার খালিসা ভূমির দিওয়ান ও ঢাকার নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেছিলেন সিংহাসন লাভের পরেই। এইভাবে বাঙলা বিহার উড়িষ্যা রাজ্য আলিবর্দীর পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই

উড়িষ্যা থেকে দুঃসংবাদ আসল এই মর্মে যে, সেখানকার সৈন্যরা সৈয়দ আহমদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে সপরিবারে বারবাটি দুর্গে বন্দি করে রেখেছে এবং মীর্জা বাকেরকে দাক্ষিণাত্য থেকে ডেকে এনে কটকের সিংহাসনে বসিয়েছে।

সংবাদ পেয়ে আলিবর্দী এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে কটক অভিযানে অগ্রসর হন ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে এবং অতি সহজেই মীর্জা বাকেরকে বিতাড়িত করে বন্দি সওলত জঙ ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করেন এবং শেখ মাসুমকে সেখানকার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করে সৈয়দ আহমদকে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন। আর কোনো বিপদের আশঙ্কা না দেখে তিনি তাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক কমিয়ে দিয়ে ধীরে-সুস্থে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু বর্ধমানের কাছে আসতেই তিনি সংবাদ পেলেন যে, বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাঙলা আক্রমণ ও অধিকার করতে এসেছেন।

সারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের চৌথ আদায়ের উপদ্রব চললেও এতদিন পর্যন্ত বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য এই উপদ্রব থেকে মুক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় মোঘল সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ও হায়দবাবাদের নিজাম-উল-মূলক আসফ জঙের প্ররোচনায় এইবার মারাঠারা এখানে এসে হানা দিল এবং চৌথ দাবি করে বসল। ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর সৈন্যবাহিনী দিয়ে আলিবর্দীর সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেললেন এবং নগদ এক কোটি টাকা ও নবাবের সমুদয় হস্তীর বিনিময়ে তাঁকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব দিলেন। আলিবর্দীর সেনাপতিদের অনেকেই সন্ধির শর্ত মেনে নেবার প্রস্তাব দিলেও আলিবর্দী যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য ও অল্পসংখ্যক কামান বন্দুকের সাহায্যে প্রাণপনে যুদ্ধ করে এবং বহু সৈন্য ও প্রায় সব কামান-বন্ধুক হারিয়ে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে প্রথমে কাটোয়া ও পরে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

এইবার শুরু হল দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম এবং তা চলল দশ বছরেরও অধিককাল ধরে। বর্গী নামে অভিহিত মারাঠারা পঙ্গপালের মতো আসতে লাগল এবং আলিবর্দীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে বিশেষ কোনো সুবিধা লাভ করতে না পারলেও তারা প্রজা সাধারণের উপর জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগল এবং প্রজাদের ধনসম্পদ লুন্ঠন করে, নারীদের ধর্ষণ করে এবং গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। ফলে জনসাধারণের দুর্দশার সীমা রইল না। আলিবর্দী প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন এবং প্রায় প্রত্যেকটি সম্মুখ যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করলেন। বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে তিনি ভাস্কর পণ্ডিতসহ ২২ জন মারাঠা সেনাপতিকেও হত্যা করলেন। এবার সসৈন্যে রঘুজী নিজেই এলেন প্রতিশোধ নিতে। এদিকে আলিবর্দীর আবেদনে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ পাঠালেন তাঁর অনুগত মারাঠা নৃপতি বালাজী রাওয়ের পুত্র বাজী রাওকে রঘুজীর বিরুদ্ধে। রঘুজী তাঁর ভয়ে পালিয়ে গেলেন বটে কিন্তু সম্রাটের প্রাপ্য বলে কথিত বাঙলার বকেয়া রাজস্ব এগার লক্ষ টাকা নিয়ে

গেলেন বাজী রাও, প্রকৃত পক্ষে চৌথ হিসাবেই বোধ হয়। কিন্তু এর পরেও মারাঠাদের উপদ্রব সৃষ্টিতে ভাটা পড়ল না। তারা তাদের অত্যাচার চালিয়ে যেতেই লাগল। ইতোমধ্যে মারাঠাদের প্ররোচনায় আলিবর্দীর আফগান সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহ করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তেমন একটি ঘটনায় নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা ও সিরাজের পিতা জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান ও তাঁর পিতা হাজী আহমদ নিহত হয়েছেন। অবশেষে রণক্লান্ত উভয় পক্ষ একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে।

সন্ধির শর্ত অনুসারে মারাঠাদের সেনাপতি ও সাহায্যকারী মীর হাবিব উড়িষ্যা রাজ্যে নবাবের নায়েব নাজিম হিসাবে নিযুক্ত থাকবেন কিন্তু সেই রাজ্য থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব রঘুজীর সেনাবাহিনীর বেতন প্রদানের জন্য ব্যয় করা হবে। তদুপরি আলিবর্দী খান প্রতিবছর নগদ বার লক্ষ টাকা রঘুজীকে প্রদান করবেন। বিনিময়ে রঘুজীর কোনো সৈন্য উড়িষ্যা ও বাঙলার সীমান্ত অতিক্রম করে বাঙলার মাটিতে পা ফেলবে না এবং সেই সীমান্ত হবে বালেশ্বরে সুবর্ণ রেখা নদী এবং সেই নদী থাকবে আলিবর্দীর অধিকারে। মোদ্দা কথায়, যে উড়িষ্যা রাজ্যের জন্য আলিবর্দী শুজা-উদ-দীনের শেষ বংশধরকে সেখান থেকে নির্মমভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই রাজ্য বেসরকারিভাবে কোনো দিন তাঁর হস্তগত হয়নি এবং এখন তা সরকারিভাবে চিরদিনের জন্য তাঁর হস্তচ্যুত হল।

এর পরে আলিবর্দী তাঁর যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও প্রজাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তাঁর সুশাসনে প্রজারা মোটামুটি শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

কিন্তু ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং এগুলির হোতা ছিলেন আলিবর্দীর নয়নমণি, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ও তাঁর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা (পরে নবাব)। ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারে আলিবর্দী ছিলেন আদর্শ মুসলমান ও মানুষ। তাঁর বীরত্ব ছিল অতুলনীয়। তাঁর শাসনক্ষমতা ছিল অপরিমেয় ও প্রজাদের জন্য তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম। কিন্তু তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন ও তা চরিতার্থ করার জন্য তিনি যে কোনো নীচতার আশ্রয় নিতে পিছপা হতেন না। প্রথম থেকেই তাঁর উচ্চাভিলাষ ছিল একটি বিরাট রাজ্যের পরাক্রমশালী অধিকারী হওয়া এবং সেই অধিকার যাতে চিরদিন টিকে থাকে সেদিকে তিনি কঠিনভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাঁর নিজের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি সিরাজের জন্মের পরেই তাঁকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং অন্ধ স্নেহের কারণে একটি সম্ভাবনাময় মানুষকে অমানুষে পরিণত করেন এবং সেই অমানুষের রাজত্ব নিষ্কন্টক করার জন্য তাঁকে দিয়ে নিরপরাধ হোসেনকুলী খান ও অন্যান্যদেরকে হত্যা করান।

তাঁর জীবিতকালেই তিনি তাঁর অবশিষ্ট জামাতাদেরকে হারান, হারান সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইকরাম-উদ-দৌলাকে। অবশেষে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে আলিবর্দী খান প্রায় ৮০ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রায় আটাশ বছর বয়সে (জন্ম ১৭২৭-২৮ খ্রিঃ) সিংহাসনে আরোহণ করার পর সিরাজ-উদ-দৌলা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। সেনাবাহিনীর প্রথম বখশি মীর মোহাম্মদ জাফর খান, দেশের প্রধান ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠসহ রাজ্যের প্রবীণ কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় সবাই সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এর জন্য তাঁদের প্রতি আগে থেকেই সিরাজের ব্যক্তিগত আচরণ যে অনেকাংশে দায়ী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তদুপরি সিরাজ মোহন লাল ও মীর মদনসহ তাঁর পছন্দ মতো কয়েকজন নতুন সেনাপতিকে সেনাবাহিনীর কয়েকটি উচ্চতর পদে নিযুক্তি প্রদান করেন। তাতে মীর জাফরসহ প্রবীণ সেনাপতিদের মধ্যে প্রায় সবাই সিরাজের উপর অত্যন্ত বিরূপ হন।

মীর মোহাম্মদ জাফর খান আলিবর্দীর সৎ বোন শাহ খানমকে বিবাহ করেন এবং প্রথম দিকে তাঁর অধীনে মাসিক এক শ' টাকা বেতনে চাকুরি করেন। আলিবর্দী তাঁর পদোন্নতি করে তাঁকে সেনাবাহিনীর বখশির পদে নিযুক্ত করেন কিন্তু এই কাপুরুষ ও অকৃতজ্ঞ লোকটি কোনোদিন যথাযথভাবে তাঁর কর্তব্য পালন করেননি এবং আলিবর্দীর জীবদ্দশাতেই তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আলিবর্দী কয়েকবার তাঁকে পদচ্যুত করেও শেষ পর্যন্ত তাঁর অপরাধ মার্জনা করে দেন। কিন্তু মীর জাফরের চারিত্রিক সংশোধন কোনোদিন হয়নি।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর কুচক্রী মীর জাফরের তৎপরতা আরও বেড়ে উঠে এবং সিংহাসন অধিকারের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। সিরাজ-উদ-দৌলার দুর্ব্যবহারের কারণে তাঁর প্রতি সভাসদগণের বিরূপ মনোভাবের সুযোগ নিয়ে মীর জাফরী রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি সেনাপতি, রাজ্যের প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রমুখদের নিজ দলে টেনে নিলেন নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে। কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রভাব তখন অপরিসীম। তিনি সেই কোম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভাব করে নিলেন তাঁদেরকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাবের আদেশ অমান্য করে কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করে এবং ঢাকা থেকে সরকারের বিপুল পরিমাণের অর্থ নিয়ে পলায়নকারী রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ বল্লভকে তাদের দুর্গে আশ্রয় দিল এবং নবাবের কাছে তাঁকে প্রত্যার্বতন করতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা এই কারণ দেখাল যে, তিনি তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। নবাব রাগান্বিত হয়ে কলকাতা অভিযান চালিয়ে কলকাতা অধিকার

করলেন এবং দুর্গ ধ্বংস করে দিলেন। ইংরেজ কোম্পানির কর্মকর্তারা জাহাজে চড়ে সপরিবারে পলায়ন করলেন এবং মীর জাফর আলী খান গোপনে তাদের পলায়নে সাহায্য করলেন।

মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খান ও সিরাজের আপন খালা ঘষেটি বিবির প্ররোচনায় সিরাজ-উদ-দৌলার আপন খালাত ভাই ও পুর্ণিয়ার ফৌজদার শওকত জঙ বিদ্রোহী হলে সিরাজ বাধ্য হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে পুর্ণিয়া অধিকার করলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে পালিয়ে যাওয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাগণ কর্নেল ক্লাইভের নেতৃত্বে উপযুক্ত সৈন্য ও বন্দুক-কামান ইত্যাদি নিয়ে কলকাতা ফিরে এসে নবাব কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা কাপুরুষ মানিকচাঁদকে যুদ্ধে হারিয়ে কলকাতা অধিকার করে নিলেন। নবাব রাগান্বিত হয়ে সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোসের প্রস্তাব চলাকালে ইংরেজরা এক রাতে অতর্কিতে নবাবের শিবির আক্রমণ করে তাঁর অবস্থা নাজেহাল করে দিল। নবাবের দরবারে তখন ষড়যন্ত্রকারীদের প্রভাবই বেশি। তাদের প্ররোচনায় নবাব বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সন্ধি করলেন।

ইতোমধ্যে মীর মোহাম্মদ জাফর খান, জগৎশেঠ, দুলর্ভ রায় প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা কর্নেল ক্লাইভের সঙ্গে এই মর্মে লিখিত চুক্তি সম্পাদনা করেছেন যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে গদিচ্যুত করলে তারা নগদ কয়েক কোটি টাকা ও বিনা শুল্কে এদেশে বাণিজ্য করতে পারবে এবং বিনিময়ে তারা মীরজাফরকে বাঙলার মসনদে বসাবে।

সিরাজ-উদ-দৌলা এই সংবাদ জানতে পেরে মীর জাফরকে পদচ্যুত করেন এবং অন্যদের বিরুদ্ধেও কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল হল না। ষড়যন্ত্রকারীদের উস্কানিতে কর্নেল ক্লাইভ সসৈন্যে নবাবের রাজধানি অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তখন আর কোনো উপায় না দেখে সিরাজ তাঁর মাতামহী পরলোকগত নবাব আলিবর্দীর মহিষীকে মীরজাফরের নিকট পাঠিয়ে তাঁর কাছে অতীত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মীর জাফর পবিত্র কোরান স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি নবাবের বিরুদ্ধে যাবেন না।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা মীর জাফর ও অন্যান্য সেনাপতি নিয়ে পলাশীর মাঠে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে মাত্র হাজার দুই সৈন্য ও সামান্য কয়েকটি কামান। সেই তুলনায় নবাবের সৈন্য ও কামানের সংখ্যা অনেক গুণ বেশি। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলল। সেনাপতি মীর জাফর ও রায় দুর্লভের অধীনে নবাবের বেশির ভাগ সৈন্য ও কামান। তাঁদের আদেশে তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নবাবের অনুগত সেনাপতি রাজা মোহন লাল এবং গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক মীর মদন প্রাণপণে যুদ্ধ চালাতে

লাগলেন এবং মীর মদনের আক্রমণের ফলে নবাবের বাহিনী যুদ্ধে অনেকটা সুবিধা পেয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই গোলার আঘাতে মীর মদন নিহত হলেন।

সেই সংবাদ পেয়ে নবাব অসহায় অবস্থায় পড়ে মীর জাফরকে ডেকে পাঠালেন কিন্তু কয়েকবার সংবাদ প্রেরণের পরও তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নবাবের কাছে আসলেন। নবাব তাঁকে আক্রমণ চালাতে অনুরোধ করলে তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে নবাব নিজের মাথার তাজ তাঁর পায়ের উপর রেখে তাঁকে নবাব ও দেশের ইজ্জত রক্ষার জন্য অতি বিনীত অনুরোধ জানালেন। মীর জাফর নবাবকে বললেন, সেদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ করতে। অসহায় নবাব সেই আদেশ দেওয়া মাত্র ইংরেজরা বিপুল উৎসাহে আক্রমণ চালাল এবং নবাব সেই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রাণ নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসলেন। পরদিন রাজকোষ খুলে দিয়ে সৈন্যদেরকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিলেন তাঁর পক্ষে আবার নতুন করে অস্ত্র ধারণ করতে। কিন্তু কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না।

আর কোনো উপায় না দেখে সেদিন রাতে সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর বেগম লুৎফুন্নেসা, একমাত্র শিশুকন্যা ও অতি বিশ্বাসী কযেকজন অনুচর নিয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে ভগবানগোলা হয়ে পাটনার দিকে পলায়ন করলেন। ইতোমধ্যে মীর জাফর আলী খান ক্লাইভের সাহায্যে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেছেন এবং চুক্তিমতো তাঁর হাতে অতুল ঐশ্বর্য তুলে দিয়েছেন। হতভাগ্য সিরাজ পলায়ন করতে গিয়ে মীর জাফরের ভ্রাতা মীর দাউদের হাতে ধরা পড়লেন রাজমহলে। মীর জাফরের জামাতা মীর কাসেম আলী খান সেখানে গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে আসেন মুর্শিদাবাদে। তাঁকে পেয়ে মীরজাফরের সুযোগ্য পুত্র মীরন সিরাজ-উদ-দৌলার পিতার এককালের গৃহভৃত্য মোহাম্মদ আলী বেগকে দিয়ে সিরাজকে হত্যা করান এবং তাঁর মৃতদেহ হাতির পিঠে করে সারা মুর্শিদাবাদ নগরে অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

মীর জাফর মসনদে বসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশমতো রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তাঁর ও তাঁর পুত্র মীরনের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে এবং সিরাজের কথা স্মরণ করতে থাকে। কিছুদিন পরে মীরন বজ্রাঘাতে মারা গেলে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অপদার্থ মীর জাফরকে সরিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর জামাতা মীর কাসেম আলী খানকে নবাবের মসনদে বসান ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু এই স্বাধীনচেতা নবাবের সঙ্গে অচিরেই ইংরেজদের বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। একের পর এক প্রতিটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নবাব মীর কাসেম খান ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদে পালিয়ে যান। ইংরেজরা মীর জাফরকে পুনরায় গদিতে বসান। এরপরে কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাঙলার দিওয়ানির সনদ লাভ করেন এবং তারা বঙলাসহ সারা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করে এবং তা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে থাকে।

বাঙলায় নবাবি আমলে ফরাসি ভাষায় রচিত ইতিহাসসমূহ

বাংলায় নবাবী আমলে ফারসী ভাষায় বেশ কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল এবং এগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে (১) আজাদ আল হোসায়নি রচিত 'নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি' রচনা (খুব সম্ভব ১৭২৯ খ্রিঃ), (২) মুন্‌শি সলিম উল্লাহ রচিত 'তারিখ-ই-বঙ্গালাহ', (১৭৬৩ খ্রিঃ), (৩) সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবতবায়ি রচিত 'সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন' (১৭৮০ খ্রিঃ), (৪) গোলাম হোসেন সলিম রচিত 'রিয়াজ-উস্‌-সালাতিন' (১৭৮৭-৮৮ খ্রিঃ), (৫) করম আলী খান রচিত 'মোজাফফর নামা' (১৭৭২-৭৩ খ্রিঃ) ও (৬) ইউসুফ আলী খান রচিত 'তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবতজঙী' (১৭৬৪ খ্রিঃ)। নিম্নে এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

(১) নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি ঃ বাংলার নবাব শুজা-উদ-দীন খানের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খান রুস্তম জঙ ১৭২৮ থেকে ১৭৩৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ঢাকার নায়েব-নাজিম ছিলেন। সেই সময় আজাদ-আল হোসায়নি নামক ইরান থেকে আগত জনৈক পণ্ডিত খুব সম্ভব ঢাকায় অবস্থানরত ছিলেন। তিনি খুব সম্ভব ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে (মীর হাবিবের ত্রিপুরা রাজ্যে অভিযানের পর) এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত এই গ্রন্থ মাত্র ৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে (য. না. ২-৯ পৃঃ)।

এই পুস্তিকায় বাঙলার সুবাদার মীর জুমলা (১৭৬০-৬৩ খ্রিঃ), বাঙলার সুবাদার আজম শাহ (১৬৭৮-৭৯ খ্রিঃ) ও ঢাকার নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ (১৭২৮-৩৪ খ্রিঃ) সম্পর্কে একটি করে ক্ষুদ্র কাহিনী আছে। সেই সঙ্গে আছে ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে নায়েব নাজিমের সেনাপতি মীর হাবিব ও আগা সাদেক কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যে অভিযান, সেই রাজ্য অধিকার ও এর 'রওশনাবাদ' নামকরণের ইতিহাস। শেষোক্ত ঘটনার জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত বেশি। কারণ, অন্য কোনো গ্রন্থে এই ঘটনার এত বিস্তারিত বর্ণনা নেই এবং এই ঘটনার সর্বপ্রথম বর্ণনা এই গ্রন্থেই আছে।

(২) তারিখ-ই-বঙ্গালাহ ঃ এই গ্রন্থের রচনা কাল খুব সম্ভব ১৭৬৩ খ্রিঃ। গ্রন্থকার মুন্‌শি সলিমউল্লাহ সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে, তিনি প্রথমবারে ১৭৫৭ থেকে ৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বারে ১৭৬৩ থেকে '৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাব মীর মোহাম্মদ জাফর খানের একান্ত সচিব ছিলেন। ১৭৬০ সালে মীর জাফর খান গদিচ্যুত হলে গ্রন্থকার ১৭৬০ থেকে ৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের ইংরেজ গভর্নর ও সুপণ্ডিত হেনরি ভ্যান্সিটার্ট (Henry Vansittart)-এর একান্ত সচিব ছিলেন এবং হেনরি ভ্যাসিটার্ট-এর অনুরোধে তিনি ফারসি ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন।

এই গ্রন্থে বাংলার সুবাদার ইবরাহিম খানের সময় (১৬৮৯-৯৮ খ্রিঃ) থেকে নবাব আলিবর্দী খানের (১৭৪০-৫৬ খ্রিঃ) সময় পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আছে। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডুইন (Francis Gladwin) নামক একজন ইংরেজ পণ্ডিত এই গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ ইমাম-উদ-দীন কর্তৃক গ্রন্থটি মূল ফারসি ভাষায় সম্পাদিত হয়ে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার ইংরেজী ভাষায় মূল বিষয়ের কোনো সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দেননি। ফলে ফারসি ভাষা যাঁরা জানেন না তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থ থেকে কিছু আহরণ করা অসম্ভব ব্যাপার। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্ল্যাডুইনের অনুবাদও প্রমাদপূর্ণ এবং মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।

(৩) সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরিন ঃ সিয়ার-উল মুতাখ্খিরিন অর্থাৎ 'আধুনিক কালের প্রতি দৃষ্টিপাত' গ্রন্থটি বিরাট এক সাহিত্য কর্ম। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সাতজন মোঘল সম্রাট তদানীন্তন ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের ও বিশেষ করে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। চার খণ্ডে লিপিবদ্ধ ও কয়েক হাজার পৃষ্ঠার এই পুস্তক একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ। নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খান, তাঁর জামাতা নবাব শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান, তাঁর পুত্র নবাব সরফরাজ খান, নবাব আলিবর্দী খান, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়, ইংরেজদের ক্রীড়নক হিসাবে মীর মোহাম্মদ জাফর খানের নবাবি লাভ, তাঁর জামাতা মীর কাসেমের সিংহাসন লাভ ও যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া, ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে ইংরেজদের বাঙলার দিওয়ানি লাভ ও সেই সঙ্গে সারাদেশে রাজত্ব কায়েম ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা এই পরিধিবহুল গ্রন্থে আছে।

এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ এবং এর রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবতবায়ি ছিলেন সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয়। এবং তাঁর পিতা সৈয়দ হেদায়েত আলী খান ছিলেন এক সময়ে শাহজাদা আলী গওহর-এর উজির। হেদায়েত আলী খান নবাব আলিবর্দী খানের এক ভগিনীর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রন্থকার গোলাম হোসেন খানের জন্ম হয় দিল্লীতে ১৭২৭-২৮ খ্রিষ্টাব্দে। একই বছরে আলিবর্দী খানের দৌহিত্র ও পালিত পুত্র (পরে নবাব) সিরাজ-উদ-দৌলারও জন্ম হয় এবং তাঁরা দু'জন ছিলেন খালাত ভাই (ইংরেজি মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর 'কাজিন')।

দিল্লীতে জন্ম হলেও গ্রন্থকারের জীবন অতিবাহিত হয় বাঙলা ও বিহারেই। তাঁর পিতা ছিলেন তখন দিল্লীতে কার্যরত এবং গ্রন্থকার তাঁর জননী ও তিন ভাই এবং এক বোনের সঙ্গে বিহার ও বাঙলায়ই থাকেন। আলিবর্দীর রাজত্বের শেষ সাত বছর তিনি পূর্ণিয়ার দরবারে নবাব সৈয়দ আহমদ সওলত জঙের অধীনে কর্মরত ছিলেন। এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পুত্র নবাব শওকত জঙের অধীনে কর্মরত ছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে তাঁর খুব সদ্ভাব ছিল না। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে শওকত জঙের নিহত হওয়ার পরে তিনি সাময়িকভাবে একটু অসুবিধায় পড়েন কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তাঁর অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। এবং তখন তিনি ইংরেজদের সান্নিধ্যে এসে প্রচুর সম্পদ ও সম্মানের অধিকারী হন এবং তখন তাঁর কর্মতৎপরতা খুব গৌরবজনক ছিল না বলে কেউ কেউ বলে থাকেন।

তিনি ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং তখনই বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শুভদৃষ্টি এই গ্রন্থের উপর পড়ে এবং এর ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে পড়েন। ফারসি ভাষায় অভিজ্ঞ কোনো ইংরেজ পণ্ডিতের অভাবে এম রেমন্ড (M. Ramond) নামক একজন ফরাসি পণ্ডিত হাজী মোস্তফা (Haji Mustapha) এই ইসলামী ছদ্মনাম ধারণ করে এই গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর এই অসাধারণ শ্রমের ফল তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। তিনি 'নোটা মিনাস' (Nota Menus) এই ছন্দ নামে তা গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নামে উৎসর্গ করেন। কিন্তু যে জাহাজে করে গ্রন্থখানা বিলাতে প্রেরণ করা হয়েছিল তা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ফলে গ্রন্থখানাও হারিয়ে যায়। তবে কলকাতায় গ্রন্থের যে অনুলিপি ছিল তা থেকে গ্রন্থের নতুন সংস্করণ করা হয় এবং তাই এখন প্রচলিত আছে। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার জনাব হাকিম আবদুল মজিদ কর্তৃক মূল ফারসি গ্রন্থটি নতুন করে সম্পাদিত হয় এবং সেই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য।

(৪) রিয়াজ-উস্-সালাতিন ঃ ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে দিওয়ানি লাভের সময় কোম্পানির মালদহ কুঠির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন জর্জ উডনি (George Udny)। তিনি পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর ডাক মুনশি ছিলেন গোলাম হোসেন সলিম জইদপুরী নামক এক মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি খুব সম্ভব অযোধ্যা প্রদেশের জইদপুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং পরে মালদহতে এসে চাকুরি গ্রহণ ও বসবাস করেন। ১২৩৩ হিজরি (১৮১৭ খ্রিঃ) সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং মালদহ শহরের কাক কোবরান আলী মহল্লায় শিলালিপিসহ তাঁর পাকা সমাধি আছে। গোলাম হোসেন সলিম এই গ্রন্থ ১৭৮৭-৮৮ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন।

তাঁর প্রভুর নির্দেশে বা অনুরোধে গোলাম হোসেন সলিম বাংলার ইতিহাস রচনা করেন এবং এর নাম দেন 'রিয়াজ-উস-সালাতিন'। আরবি 'রওজাহ' (روضه) অর্থাৎ উদ্যান শব্দ বহুবচনে 'রিয়াজ' (رياض) অর্থাৎ উদ্যানসমূহ। অতএব গ্রন্থের অর্থ সুলতানদের উদ্যানসমূহ। গ্রন্থকার এই পুস্তকে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়

থেকে আরম্ভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রথম দিকের ইতিহাস পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তদুপরি বঙ্গ রাজ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে হজরত নূহ নবীর পুত্র হামের বংশধরদের কল্পিত কাহিনীর অবতারণা করেছেন।

গ্রন্থকার কোন সূত্রের সাহায্যে তাঁর পুস্তক রচনা করেছিলেন সেই কথা বলেননি। তাঁর রচিত ইতিহাস পড়ে মনে হয় যে, তিনি কোনো লিখিত পুস্তকের সাহায্যে এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাস সংক্ষেপে রচনা করেছিলেন। সেই ইতিহাস খুব নির্ভরযোগ্য নয় এবং তাতে শুধু অতিরঞ্জন নয়, অনেক ভুল তথ্যও আছে।

তবে বাঙলার নবাবি আমলের বিশেষ করে শুজা-উদ-দীন খান, সরফরাজ খান, আলিবর্দী খান, সিরাজ-উদ-দৌলা ও মীর জাফরের সময়ের ইতিহাস যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলে দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই পর্বের ইতিহাস ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত মুন্‌শি সলিমউল্লাহ রচিত তারিখ-ই-বঙ্গালাহ গ্রন্থের ইতিহাসের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। তাতে ধারণা হয় যে, অনেক পরবর্তীকালে (১৭৮৭-৮৮ খ্রিঃ রচিত এই গ্রন্থের বর্ণনা খুব সম্ভব তারিখ-ই-বঙ্গালাহ গ্রন্থভিত্তিক।

(৫) মোজাফফরনামা ঃ এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন করম আলী খান এবং তিনি এই গ্রন্থ ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও 'মোজাফফর জঙ' উপাধিধারী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত বাঙলার নায়েব নাজিম ও দিওয়ান সৈয়দ রেজা খানের নামে নামকরণ করেছিলেন।

করম আলী খান সম্পর্কে কোনো স্বতন্ত্র রচনা না পাওয়া গেলেও তাঁর রচিত মোজাফফরনামা' গ্রন্থ থেকেই তাঁর ও তাঁর পিতা (তাঁর পিতার কথা গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত থাকলেও কোথাও তাঁর নামের উল্লেখ দেখা যায় না) সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেই সব তথ্য থেকে তাঁর জীবনী তুলে ধরা হল।

"মোজাফফরনামার বর্ণনায় (য.না. ১৫ পৃঃ) দেখা যায় যে, আলিবর্দী যখন আজিমবাদের (পাটনার) নায়েব নাজিম তখন ১৭৩৪-৩৫ খিষ্টাব্দে আলিবর্দীর আমন্ত্রণে গ্রন্থকারের পিতা (নামের উল্লেখ নেই) ও মাতা পাটনাতে আলিবর্দীর কাছে আসেন এবং তাঁদেরকে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাজী আহমদের সুপারিশে নবাব শুজা খান গ্রন্থকারের পিতাকে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে বর্ধমান অঞ্চলে 'সংবাদ লেখক' (News writer)-এর পদে নিযুক্ত করেন এবং সেই পদে তিনি ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি কর্তৃক সৈয়দ রেজা খান পদচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত ৩৪ বছর পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। এই একই গ্রন্থের বর্ণনা (য. না. ১৯ পৃঃ) থেকে দেখা যায় যে, গ্রন্থকার বলদাহ্-ই-বঙ্গালাহ (অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ নগরে) আলিবর্দীর গৃহে ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বয়ং নবাব শুজা খান তাঁর নাম রাখেন করম আলী খান।

এই গ্রন্থের আর এক বর্ণনা (য, না ২৪ পৃঃ) থেকে জানা যায় যে, উড়িষ্যা অভিযানের পূর্বে নবাব আলিবর্দী খান গ্রন্থকারের পিতাকে (নামের উল্লেখ নেই) নবাবের অশ্বারোহী বাহিনীর অশ্বগুলিকে চিহ্নিত করার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। গ্রন্থের

পরবর্তী বর্ণনায় (য. না. ২৬ পৃঃ) দেখা যায় যে, সেই বছরে (১৭৪২ খ্রিঃ) আলিবর্দী খান কর্তৃক তাঁর মাতার দিকে যত আত্মীয় ছিলেন তাঁদের সবাইকে (কাছের ও দূরের) মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। করম আলী খানের বয়স ছিল তখন পাঁচ বছর মাত্র। তখন থেকেই তাঁকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয় এবং তিনি তা ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভোগ করেন। প্রমাণের অভাবে যদিও নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না তবে যতটুকু মনে হয় যে, করম আলী খানের মাতা খুব সম্ভব আলিবর্দীর জননীর আপন ভগিনী বা আপন ভগিনীর কন্যা ছিলেন এবং সেই কারণেই বোধ হয় তাঁদেরকে এত সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়েছিল। তবে এটি শুধু অনুমান মাত্র এবং এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না।

স্যার যদুনাথের (য. না.) গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠার বর্ণনায় দেখা যায় যে, গ্রন্থকার ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল বার বছর মাত্র এবং এত অল্প বয়সে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তিকে খুব তাজ্জবের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। এর পরবর্তী বর্ণনা (য. না. ৬০ পৃঃ) আরও আশ্চর্যজনক। আলিবর্দীর জীবনের খুব সম্ভব শেষ দিকের (খুব সম্ভব ১৭৫৫ খ্রিঃ) কথা (সনের উল্লেখ নেই)। তখনও গ্রন্থকার ছিলেন ঘোড়াঘাটের ফৌজদার। নবাবের অনুমতি না নিয়ে তিনি ঘোড়াঘাট ছেড়ে পুর্ণিয়া চলে যান এবং সেখানে সৈয়দ আহমদ খান সওলত জঙ তাঁকে রাঙ্গামাটি নামক স্থানের ফৌজদার পদে নিযুক্তি দেন। এই নিয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলে আলিবর্দী উত্তর দেন, "আমি জানি সওলত জঙের সঙ্গে তার বনিবনা হবে না এবং তিনি আমার নিকট শীঘ্রই ফিরে আসবেন। আমি তাঁর ভরণপোষণের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারি না। অতএব তাঁকে কিছুদিনের জন্য চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা সঙ্গত হবে না। কারণ তিনি আমার চরিত্রের ন্যায়পরায়ণতার উপর নির্ভর করে আছেন।"

তাঁর সম্পর্কে গ্রন্থের শেষ বর্ণনায় (য. না. ৭০ পৃঃ) দেখা যায় যে, পুর্ণিয়ার যুদ্ধে শওকত জঙ নিহত হলে গ্রন্থকার (তখনও তিনি পুর্ণিয়াতে) অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে ১৯ দিন ধরে কয়েদখানায় ছিলেন এবং 'নবাব সাহেবের মাতা ও কন্যার' সুপারিশে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁকে সসম্মানে মুর্শিদাবাদে যেতে দেওয়া হলেও ঘোড়াঘাটের ফৌজদারের পদ আর দেওয়া হয়নি। এখানে 'নবাব সাহেবের মাতা ও কন্যার' ('at the intercession of the mother and daughter of the Nawab Sahib') কথাগুলি খুবই বিভ্রান্তিকর। কারণ আলিবর্দীর মাতা তিনি হতে পারেন না (তিনি বহু পূর্বে গত হয়েছেন)। তিনি সিরাজের মাতা হতে পারেন কিন্তু তাঁর কন্যা হতে পারেন না। কারণ তখন সিরাজের কন্যা মাত্র দুই-তিন বছরের শিশু মাত্র। খুব সম্ভব নবাব আলিবর্দীর বেগম ও তাঁর কন্যার কথা এখানে বলা হলেও ভুলক্রমে উপরের বিভ্রান্তিকর পাঠ এসে পড়েছে।

গ্রন্থকারের জীবনের বাকি অংশের কোনো উল্লেখ নেই। তবে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যে জীবিত ছিলেন এবং রেজা খাঁর সহানুভূতি লাভ করেছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। তাঁর বংশধরগণ এখনও পাটনায় আছেন বলে স্যার যদুনাথ উল্লেখ করেছেন (য. না. ১০ পৃঃ)।

১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এই মোজাফফরনামা গ্রন্থে আলিবর্দী খানের প্রথম জীবন ও তাঁর ভাই হাজী আহমদসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, তাঁদের উড়িষ্যায় নবাব শুজা-উদ-দীন খানের নিকট আগমন ও তাঁর অধীনে চাকুরি গ্রহণ, শুজা খানের বাংলার মসনদ লাভ, আলিবর্দী খানের আজিমাবাদের নায়েব নাজিমের পদলাভ এবং শুজা খানের মৃত্যুর পর আলিবর্দী কর্তৃক শুজা খানের পুত্র নবাব সরফরাজ খানকে হত্যা করে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসন লাভের বর্ণনা আছে। এরপরে ১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আলিবর্দীর ১৬ বছরের রাজত্বের ঘটনাবলীর মোটামুটি বর্ণনা আছে। এই ঘটনাবলির মধ্যে আছে আলিবর্দী কর্তৃক শুজা খানের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত করে সেই রাজ্য অধিকার, মারাঠাদের সঙ্গে প্রায় দশ বছর ধরে আলিবর্দীর বিরোধ, উড়িষ্যার অধিকার ছেড়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন, আফগান সেনাপতিদের বিদ্রোহ এবং আলিবর্দী কর্তৃক তাঁদের ধ্বংস সাধন, এক এক করে আলিবর্দীর তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতার মৃত্যু ও অবশেষে আলিবর্দীর মৃত্যুর বর্ণনা। এর পরে আছে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র জয়ন-উদ-দীন খানের পুত্র সিরাজ-উদ-দৌলার নবাবি লাভ, মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায় দুর্লভ প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তের ফলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় এবং মীরজাফর কর্তৃক তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার।

(৬) তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গী ঃ ইউসুফ আলী খান কর্তৃক ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থ মোটামুটি ৩২টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থকার পরিচ্ছেদের সংখ্যা না দিলেও মাত্র একটি ছাড়া (২০ পরিচ্ছেদ) ছাড়া অবশিষ্ট সব পরিচ্ছেদেরই শিরোনামা দিয়েছেন। সুবিধার্থে পরিচ্ছেদগুলির সংখ্যা বন্ধনীতে প্রদত্ত হয়েছে। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

এই গ্রন্থে আছে ঃ আলিবর্দী খানের প্রথম জীবন এবং অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দিল্লী থেকে তাঁর পিতাসহ পরিবারের আর সব সদস্যের কটকে নবাব শুজা খানের নিকট আগমন ও চাকুরি গ্রহণ (প-১); ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাঙলার নবাব মুর্শিদ কুলী জাফর খানের মৃত্যু ও বাঙলার সিংহাসনে প্রথমে তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খানের ও পরে তাঁর পিতা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম শুজা-উদ-দীন খানের উপবেশন (প-২); নবাব শুজা-উদ-দীনের বিহারের সুবাদারি লাভ ও সেখানে আলিবর্দী খানকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে নায়েব নাজিম পদে নিযুক্তি (প-৩); ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নবাব শুজা খানের

মৃত্যু ও তাঁর পুত্র আলা-উদ-দৌলা নবাব সরফরাজ খানের বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারি লাভ (প-৪); আলিবর্দী কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা করে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও গিরিয়ার যুদ্ধে নবাবকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার (প-৫ও৬); আলিবর্দী কর্তৃক নবাব শুজা খানের জামাতা নবাব দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ ও তাঁর জামাতা মীর্জা বাকেরকে উড়িষ্যা থেকে বিতাড়ন, নিজ জামাতা সওলত জঙকে কটকের মসনদ দান কিন্তু সৈন্যদের বিদ্রোহের ফলে সওলত জঙ বন্দী ও মীর্জা বাকেরের সিংহাসন লাভ (প-৭); আলিবর্দী কর্তৃক পুনরায় মীর্জা বাকেরকে বিতাড়ন এবং উড়িষ্যা জয় করে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা, পথে বর্ধমানে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর কর্তৃক আলিবর্দীকে আক্রমণ ও বহু সৈন্য, কামান-বন্দুক, হস্তী ইত্যাদি ইত্যাদি হারিয়ে আলিবর্দীর মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন (প-৮ ও ৯); মারাঠাদের বার বার বাংলা আক্রমণ ও আলিবর্দীর অনুরোধে দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহর নির্দেশে অযোধ্যার নবাব সফদর জঙের আজিমাবাদে আগমন ও সেখানে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা (প-১০); ভাস্কর পণ্ডিতকে নিয়ে মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলার বাংলা অধিকারে আগমন এবং সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত মারাঠারাজ বাজী রাও-এর ভয়ে রঘুজীর পলায়ন (প-১১-১২); ভাস্করের পুনরায় বাঙলায় আগমন এবং আলিবর্দী কর্তৃক প্রতারণার মাধ্যমে ২২ জন মারাঠা সেনাপতিসহ ভাস্করকে হত্যা (প-১৩); আলিবর্দীর প্রধান সেনাপতি আফগান মোস্তফা খানের বিদ্রোহ ও আজিমাবাদ অধিকারের চেষ্টা এবং সেখানকার যুদ্ধে আলিবর্দীর কনিষ্ঠ জামাতা ও সিরাজ-উদ-দৌলার পিতা জয়ন-উদ-দীন খান কর্তৃক মোস্তফা খান পরাজিত ও পরবর্তী যুদ্ধে নিহত (প-১৪ ও ১৫); উড়িষ্যায় অবস্থানরত মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবাব কর্তৃক মীর মোহাম্মদ জাফর খানকে প্রেরণ ও জাফর খানের পলায়ন (প ১৮); শামশির খান, সরদার খান প্রমুখ আফগান সেনাপতিদের বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা করে আজিমাবাদের নায়েব নাজিম জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান ও তাঁর পিতা (আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) হাজী আহমদকে হত্যা; নবাব আলিবর্দী খানের তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান ও বিদ্রোহীদের পরাজিত ও হত্যা করা; পুর্ণিয়ার অতি দীর্ঘদিনের ফৌজদার সাইফ খানের মৃত্যু (প-১৯); মারাঠাদের বার বার বাংলায় আগমন ও প্রজাদের উৎপীড়ন এবং আলিবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রতিবারই পরাজিত হয়ে পলায়ন (প-২০); আলিবর্দীর উড়িষ্যা অভিযান ও কটকের বারবাটি দুর্গ অধিকার কিন্তু সেই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না করেই বাংলায় প্রত্যাবর্তন; সিরাজ-উদ-দৌলাকে সঙ্গে নিয়ে আলিবর্দীর আবার ও উড়িষ্যা অভিযান (প-২২ ও ২৩); মেহদী নিসার খানের প্ররোচনায় সিরাজ-উদ-দৌলার আজিমাবাদ গমন, সেখানকার নায়েব নাজিম জানকীরামের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে মেহদী নিসার খান নিহত, পাগলের মতো আলিবর্দীর আজিমাবাদে গমন ও সিরাজকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন (প-২৪ ও ২৫); আলিবর্দী ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধি, সন্ধির শর্ত অনুসারে কটকের শাসন কর্তা বাঙলার নবাব কর্তৃক সরকারিভাবে নিযুক্ত হলেও প্রকৃত

পক্ষে উড়িষ্যা রাজ্যে মারাঠাদের অধিকারের স্বীকৃতি এবং বাৎসরিক বার লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাঙলায় মারাঠাদের না আসার প্রতিশ্রুতি (প-২৬); আজিমাবাদের নায়েব নাজিম রাজা জানকীরামসহ আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মৃত্যু (প-২৭-২৮); সিরাজ-উদ-দৌলা ও দরবারের উল্লেখযোগ্য আমির হোসেন কুলী খানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি (প-২৯); ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রায় আশি বছর বয়সে নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুহলে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সিংহাসন লাভ, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের অভিযান ও কলকাতা অধিকার; পুর্ণিয়ার বিদ্রোহী ফৌজদার ও তার খালাত ভাই শওকত জঙের বিরুদ্ধে সিরাজের অভিযান ও যুদ্ধে শওকত জঙ নিহত; ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক কলকাতা পুনরাধিকার ও তাদের সঙ্গে সিরাজের অবমাননাকর সন্ধি; মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারী কর্তৃক ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি; ইংরেজদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত। ইংরেজদের ক্রীড়নক হিসাবে মীরজাফরের সিংহাসন লাভ ও বহু কোটি টাকা তাদেরকে প্রদান। সিরাজ-উদ-দৌলার পলায়ন ও তাঁকে বন্দী করে এনে মীরজাফর ও তাঁর পুত্র মীরনের আদেশে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা (প-৩১ ও ৩২)।

৪. ইতিহাস-গ্রন্থ হিসাবে তারিখ-এর মূল্যায়ন

উপরে যে ছয়টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিতে বাংলার নবাবী আমলের মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে সিয়ার-এর বর্ণনা যে যথেষ্ট বিস্তারিত ও তুলনামূলকভাবে অধিক নির্ভরযোগ্য, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আলিবর্দীর প্রথম জীবন, তাঁর পরিবারের বিভিন্ন সদস্য ও তাঁর ব্যাক্তিগত অনুচরদের সম্পর্কে বিশেষ কোনো বর্ণনা সিয়ারে নেই এবং যা আছে তাও খুবই অকিঞ্চিৎকর। এই সব বর্ণনা মোটামুটি বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে এবং উপরে উল্লিখিত করম আলী খান রচিত মোজাফফরনামা নামক গ্রন্থে এবং এই দুই গ্রন্থ থেকে আলিবর্দী খান ও তাঁর পরিবারের আর সব সদস্য ও অন্যান্যের ব্যক্তিগত জীবনের বহু তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খান ছিলেন নবাব সরফরাজ খানের এক কন্যার স্বামী এবং সেই বিবাহ খুব সম্ভব সরফরাজ খানের জীবিতকালেই হয়েছিল। কারণ, গ্রন্থকার একস্থানে (য. না.-৮৪ পৃঃ) বলেছেন যে, সরফরাজ খানের রাজত্বকালে গ্রন্থকার দিন ও রাত [সারাক্ষণ] তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ফলে, সেই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী যে তিনি ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। পরবর্তীকালে গ্রন্থকার দরবারে ও বাইরে নবাব আলিবর্দী খানেরও প্রায় নিত্যসঙ্গী ছিলেন বলে আলোচ্য গ্রন্থের বহু বর্ণনা থেকে জানা যায়। নবাব আলিবর্দী খানের সময়ে ঘটিত ঘটনাবলিরও প্রত্যক্ষদর্শী যে গ্রন্থকার

ছিলেন তা অতি সঙ্গত কারণেই ধরে নেওয়া যায় এবং আলিবর্দীর উত্তরসূরিদের সময়ে ঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। সুতরাং সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থে যে সব বর্ণনা আছে সেগুলির প্রায় সবই যে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত তা প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায় এবং এ কারণেই এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যে অপরিসীম তাও বলা যায়।

নবাব আলিবর্দী খানের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন গ্রন্থকারের পিতা সেনাপতি গোলাম আলী খান। গ্রন্থকারকে আলিবর্দীর সঙ্গে সর্বপ্রথমে দেখা যায় ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে উড়িষ্যাতে দ্বিতীয়বারের অভিযান শেষে বর্ধমান অঞ্চলে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে আলিবর্দীর প্রথম যুদ্ধের সময়। গ্রন্থকার সেই যুদ্ধের যে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়েছেন প্রধানত তার উপর ভিত্তি করেই সিয়ার রচয়িতা তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তিনি সেই ঋণ স্বীকারও করেছেন। তিনি বলেছেন (সিয়ার-ই, ১ম খণ্ড, ৩৮৯ পৃঃ) ঃ

"....particulars incredible, but which have been carefully recorded by that same yoossof-aaly .. qhan, who has left us memoirs of his campaign and in particular of that hazardous retreat. He mentions that in three days' march to reach katwa, all he could do was only to procure once about three quarter of a seer of *khitehery* and these were shared by ..... saven noblemen accustomed to all the delicacies of a plentiful table."

১৭৪১ খিষ্টাব্দের এই ঘটনার সময় সিয়ার রচয়িতা ছিলেন তের কি চৌদ্দ বছরের কিশোর এবং মোজাফফরনামা রচয়িতা করম আলীর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। উভয়ের রচিত গ্রন্থে বর্ণিত এই ঘটনা এবং মারাঠা ও আলিবর্দীর মধ্যে সংঘটিত পরবর্তীকালের বেশির ভাগ সংঘাতের বর্ণনা তাঁরা উভয়েই তারিখ অবলম্বনে রচনা করেছিলেন। সেই কথা অনেক ক্ষেত্রে সিয়ার রচয়িতা স্বীকার করেছেন এবং করম আলী তা স্বীকার না করলেও তাঁর রচনায় তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আর ইঁউসুফ আলী যে আলিবর্দীর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে এই সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তাঁর রচিত ইতিহাস যে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূত সেই কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থের সর্বত্রই ইউসুফ আলী খান আলিবর্দীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং তাঁর বিশেষ কোনো চারিত্রিক দুর্বলতার উল্লেখ বিশেষ কোথাও নেই। তেমন জঘন্য কোনো ক্রটি প্রকট হয়ে পড়লে গ্রন্থকার সে জন্য আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদকে দায়ী করেছেন এবং আলিবর্দীর চরিত্রকে ধোয়া তুলসি পাতার মতো পবিত্র বলে প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ইউসুফ আলীর এইসব বর্ণনা কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ এবং গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে কতখানি নির্ভরযোগ্য তা বিচার্য বিষয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, আলিবর্দী

কতগুলি অসাধারণ মানবিক গুণের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধৈর্য, সাহসিকতা, বাগ্মিতা, রণনৈপুণ্য, বীরত্ব, সহনশীলতা ইত্যাদি অসংখ্য সদগুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। সর্বোপরি ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নীতিবান এবং তাঁর পূর্বসূরি নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খানের মতো এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং অন্য কোন নারীর স্থান তাঁদের জীবনে ছিল না। তখনকার দিনের প্রশাসকদের মধ্যে এ ধরনের নিষ্ঠাকে অসাধারণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শুধু আলোচ্য গ্রন্থকার নন, সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিকও আলিবর্দীর এইসব গুণের প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু গ্রন্থকার আলিবর্দীর চরিত্রের কোনো ত্রুটি বা দুর্বলতাকেই তুলে ধরেন নি। অজস্র সদগুণের অধিকারী হলেও তাঁর বদগুণের পাল্লাটিও কম ভারি ছিল না। তিনি ছিলেন বিশ্বাসঘাতক, অসম্ভব রকমের উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লোভী, শঠ, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। অথচ গ্রন্থকার এইসব ত্রুটির সরাসরি উল্লেখ তো করেনই নি বরং সর্বত্রই সেগুলিকে ঢাকতে চেষ্টা করেছেন সর্বতোভাবে।

বাঙলার সিংহাসনের প্রতি তাঁর লোভ যে বহুদিন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরিকল্পিতভাবে পাটনাতে তাঁর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নবাব শুজা খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হাজী আহমদের সাহায্যে পরিকল্পিতভাবে নবাব সরফরাজ খানের সৈন্য সংখ্যাকে মারাত্মকভাবে কমিয়ে আনার দৃষ্টান্তগুলি থেকে। তারপর গোপনে গোপনে বাংলার সিংহাসন অধিকার করার জন্য কত প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে যে আলিবর্দী তাঁর প্রভু পুত্রকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন সেই প্রবঞ্চনার ঘটনার কথা সমসাময়িক সব ঐতিহাসিকই বলে গেছেন একমাত্র ইউসুফ আলী খান ছাড়া। তিনি আলিবর্দীকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য সমুদয় অপরাধের বোঝা চাপিয়ে গিয়েছেন দুর্বৃত্ত হাজী আহমদের ঘাড়ে। হাজী আহমদের অপরাধের অবশ্য-সীমা নেই। আলিবর্দীর এই বিদ্রোহের জন্য আলোচ্য গ্রন্থকার নবাব সরফরাজ খানকেও দায়ী করেছেন নেকড়ে বাঘ ও মেষ শাবকের কাহিনীর মতো।

মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকারের ব্যাপারে আলিবর্দীর প্রতিটি পদক্ষেপ যে প্রতারণাপূর্ণ ছিল-তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলিবর্দী ছিলেন বাহ্যত একজন ধর্মভীরু মুসলিম এবং তিনি রীতিমতো কোরান পাঠ ও এই সম্বন্ধে আলোচনা করতেন আলেমদের সঙ্গে। কিন্তু মুসলমানের কাছে সবচেয়ে পবিত্র বস্তু কোরান নিয়েও আলিবর্দী প্রতারণার আশ্রয় নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি বাঙলার সিংহাসন অধিকারের লোভে। বিভিন্ন প্রামাণ্য ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, একখানি ইষ্টককে ভাল করে আচ্ছাদিত করে কোরান বলে পরিচয় দিয়ে তিনি সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে যাবেন না বলে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের গ্রন্থকার এইসব ব্যাপারে একটি কথাও বলেননি।

সিংহাসন অধিকারের ব্যাপারে সব প্রতারণার সমাপ্তির পর সাফল্য লাভ করে আলিবর্দী যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন তা বড়ই চমকপ্রদ। এখানে তাঁর

অভিনয়পটুতারও নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং সবাইকে তাক লাগিয়ে নবাব সরফরাজ খানের জ্যেষ্ঠা ভগিনী নাফিসা বেগমের প্রাসাদের দ্বারে বিচলিত কণ্ঠে তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করেছিলেন[১] যে, এরপর থেকে তিনি তাঁর প্রভু নবাব শুজা খানের নিকৃষ্টতম ভৃত্যের সঙ্গেও ক্রীতদাসের মতো আচরণ করবেন। এটি যে নিছক অভিনয় ও ভণ্ডামি ছিল এবং প্রভু হত্যার দোষ স্খলন ও মুর্শিদাবাদের লোকদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য তিনি এই শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মাত্র কয়েক মাস পরে (মুর্শিদাবাদে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করে) আলিবর্দী শুজা খানের কন্যা দুর্দানা বেগমের স্বামী ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান ও তাঁর জামাতা মীর্জা বাকেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে উড়িষ্যা থেকে বিতাড়ন করার দৃষ্টান্ত থেকে। অবশ্য দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে তাঁর (আলিবর্দী) আচরণে মহানুভবতার সীমা ছিল না। আলিবর্দী তাঁর কাছে এই মর্মে শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ তাঁর নিজস্ব ধন-দৌলত ও পরিবার পরিজন নিয়ে উড়িষ্যা রাজ্য চিরতরে ছেড়ে গেলে আলিবর্দী তাঁকে বাধা দিবেন না। তিনি সেই শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ না করে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য রাজ্যের সীমান্তবর্তী স্থান বালেশ্বরে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য সমাবেশ করলে আমাদের গ্রন্থকার সেটিকে নবাব দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের বাঙলা অধিকারের উচ্চাভিলাষ বলে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রন্থকারের বর্ণনা দেখে মনে হয় যে, আলিবর্দীর শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ না করাটা তাঁর পক্ষে মহা অন্যায়ের কাজ ছিল।

প্রবঞ্চনা যে আলিবর্দীর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সে কথা আমাদের গ্রন্থকার ভুলেও কোথাও স্বীকার করেন নি। অথচ সিংহাসন অধিকারের ব্যাপারে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আলিবর্দী প্রবঞ্চনা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁর একুশ জন সেনাপতিকে প্রতারণা করে নিজের দরবারে ডেকে এনে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন। হাজী আহমদের মত দুর্বৃত্তও আলিবর্দীর এই বিশ্বাসঘাতকতাকে নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকার এই সম্বন্ধে নিন্দাসূচক একটি কথাও বলেননি।

কার্যসিদ্ধির পর আলিবর্দী এই ব্যাপারে তাঁর প্রধান সেনাপতি গোলাম মোস্তফা খানকেও প্রতারিত করেছিলেন। মোস্তফা খানকে নবাব কথা দিয়েছিলেন, ভাস্কর ও তাঁর সেনাপতিদের হত্যা করতে পারলে তিনি মোস্তফা খানকে আজিমাবাদের (পাটনার) নায়েব নাজিমের পদে নিয়োগ করবেন। আলিবর্দী সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি এবং এর ফলে মোস্তফা খান বিদ্রোহী হয়ে আজিমাবাদ আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে তিনি নিহত হলেও আলিবর্দীর প্রতারণার ইতিহাস মুছে যায় নি।

১। য. না ৪৯ পৃঃ সেখানে আছে ঃ ".........But from this time of the end of my life, I shall not behave to the humblest of your servents except as your slave. I cherish the hope that you will honour this slave's submission by quickly accepting it."

উমদাত-উল-মূলক আমির খান ছিলেন কাবুলের সুবাদার। তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁর পুত্র সাইফ খান পুর্ণিয়ার ফৌজদার পদে নিযুক্ত করা হয় দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক এবং তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে এবং নবাব মুর্শিদ কুলী খানের সময় থেকেই। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফখর-উদ-দীন হোসায়ন খান পুর্ণিয়ার মসনদে বসেন। এদিকে স্বার্থপর আলিবর্দী তাঁর দ্বিতীয় জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহমদ খানের বেকারত্ব দূরীভূত করার জন্য তাঁকে পুর্ণিয়ার ফৌজদার পদে নিযুক্তি দান করে তাঁকে সেখানে প্রেরণ করেন এবং ফখর উদ-দীন হোসায়ন খানকে নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র লিখে মুর্শিদাবাদে ডেকে এনে গৃহবন্দী করে রাখেন। আলিবর্দী তাঁর প্রতি এমন অত্যাচার ও নিপীড়নের ব্যবস্থা করেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি পলায়ন করতে বাধ্য হন এবং অবর্ণনীয় পথ কষ্ট সহ্য করে দিল্লীতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আলিবর্দী আরও একটি নিরীহ লোক ও তাঁর পরিবারকে নির্দ্বিধায় ধ্বংস করেন। আমাদের গ্রন্থকার এই অমানুষিক কাজের জন্য আলিবর্দীর নিন্দা করা তো দূরের কথা, উল্টা ফখর-উদ-দীনের দোষই দেখেছেন।

লোভী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী আলিবর্দীর প্রবল ইচ্ছা ছিল একটি স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জয়ন-উদ-দীন আহমদ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিরাজকে তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসাবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন। জয়ন-উদ-দীনের মৃত্যুর পর তিনি সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সিরাজের মানবিক গুণের অভাব হয়তো ছিল না। কিন্তু সেগুলির বিকাশের কোনো চেষ্টাই আলিবর্দী করেন নি। অন্ধ স্নেহের বশে তিনি সিরাজের চরিত্রের কোনো দোষই দেখেন নি এবং সর্ব প্রকার প্রশ্রয়দানের মাধ্যমে তাঁকে অমানুষ করে তুলেন। ফলে আলিবর্দীর প্রত্যেকটি সভাসদই শুধু নন, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এই অমানুষটি এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেন যে, প্রায় আশি বছরের এই বৃদ্ধ লোকটিকে বিনা কারণে হত্যা করার চেষ্টা থেকেও বিরত থাকেন নি (য. না. ৫০ পৃ) এবং আলিবর্দী তা জানতেও পারেন। অথচ সেই অমানুষটির সিংহাসন নিষ্কন্টক করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টার মাধ্যমে তাঁকে দিয়েই নিরপরাধ হোসেন কুলী খানকে হত্যা করান। কারণ, তাঁর মতে, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র হোসেন কুলী খানই সিরাজকে ভবিষ্যতে সিংহাসনচ্যুত করতে পারতেন। আলিবর্দীর চরিত্রের এত বড় ত্রুটিকে আমাদের গ্রন্থকার আদৌ নিন্দার চোখে দেখেন নি।

আলিবর্দীর চরিত্রে আরও বহু ত্রুটির দৃষ্টান্ত দেখা যায় এবং গ্রন্থকার সেই সব ত্রুটিকে মোটেই ত্রুটি বলে চিহ্নিত করেন নি। মোট কথা, আলিবর্দী সম্পর্কে বলতে গিয়ে গ্রন্থকার তাঁর গুণকে যথেষ্ট বড় করে এবং তাঁর দোষকে যতটা সম্ভব ঢেকে রাখতে অথবা অত্যন্ত খাট করে দেখতে চেয়েছেন। ফলে আলিবর্দী সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনা হয়েছে সম্পূর্ণরূপে একদেশদর্শী।

আলিবর্দীর প্রশংসার ব্যাপারে গ্রন্থকার পঞ্চমুখ হলেও তাঁর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র সিরাজের চরিত্রের ত্রুটি অনুসন্ধান ও বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর উদ্যমের সীমা ছিল না। সিরাজের চরিত্রের দোষের অভাব ছিল না সত্য কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় যে, তাঁর চরিত্রে খুব বেশি না হলেও কিছু মানবিক গুণাবলিও ছিল। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি নিজেকে সংশোধনের যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রশাসনে স্থিতিশীলতা আনতেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন বলে দেখা যায়। শওকত জঙের মতো আর এক অমানুষের নিকট তিনি সৌহার্দপূর্ণ ভাষায় পত্র লিখে তাঁর দাবি-দাওয়া মেনে নিতেও চেয়েছিলেন বলে দেখা যায়। তিনি মীরজাফরের সঙ্গেও যতটা সম্ভব হাত মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কুচক্রী ও মানুষ নামের কলঙ্ক মীরজাফর ও তাঁর কুচক্রী ও স্বার্থান্বেষী সাঙ্গপাঙ্গদের হীন ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ার ফলে তাঁর পক্ষে সুষ্ঠুরূপে কোনো কাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মোটেই সহজ ছিল না। সিয়ারের নিরপেক্ষ বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, গোড়া থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফরের যোগাযোগ ও ষড়যন্ত্র ছিল এবং ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের প্রথম যুদ্ধে মীরজাফরের নির্দেশেই তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা আমির বেগ বহু ইংরেজ রমণীকে (বিবি) নিরাপদে অপেক্ষারত ইংরেজদের জাহাজে তুলে দিয়ে তাদের পলায়নে সাহায্য করেছিলেন (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড ১৯৯ পৃঃ) মীরজাফরের নির্দেশে ও সক্রিয় সহায়তায়।

কিন্তু আমাদের গ্রন্থকার মীরজাফরের বিশেষ কোনো দোষের কথা না বলে সব দোষ একতরফাভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন হতভাগা সিরাজের কাঁধে। মীরজাফর অপদার্থ শওকত জঙকে বাঙলার মসনদের লোভ দেখিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে প্ররোচিত করেছেন পত্র মারফত। সেই বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হলে গ্রন্থকার সিরাজের উপর সব দোষ চাপিয়েছেন পুর্ণিয়া অভিযানের জন্য। পলাশীর যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, তাঁর তথাকথিত ভাগিনা সেনাপতি খাদেম হোসেন এবং আর এক কুচক্রী সেনাপতি দুর্লভ রাম অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেই চললেন আর নবাবের অনুগত সৈন্যরা যুদ্ধ করে প্রাণ দিল। শেষ পর্যন্ত মীরজাফরই নবাবকে বাধ্য করলেন তাঁর অনুগত সৈন্যদেরকে রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসারণ করার আদেশ দিতে। ফলে নবাবের শোচনীয় পরাজয় হল এবং সমগ্র উপমহাদেশ প্রায় দু'শ বছরের জন্য ইংরেজদের অধীন হয়ে রইল। অথচ মীরজাফরের এই বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে কোনো কথা না বলে গ্রন্থকার সিরাজের দোষই বেশি করে দেখেছেন। সিরাজ যে তাঁর শিরস্ত্রাণ খুলে মীরজাফরের পদতলে রেখে নবাবের সম্মান ও প্রাণ রক্ষার জন্য আকুল আবেদন করেছিলেন সেই কথা গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করেছেন সত্য কিন্তু মীরজাফরের সম্বন্ধে একটি সত্য কথাও তিনি বলেন নি। মীরজাফরের পরামর্শেই যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় নবাব বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর অনুগত সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনতে, সেই কথাও গ্রন্থকার বলেননি। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য গ্রন্থকার সিরাজকেই একতরফাভাবে দায়ী করছেন বলে দেখা যাচ্ছে। মীরজাফরের সঙ্গে

গ্রন্থকারের কোনো বন্ধুত্ব থাকা দূরে থাক, শত্রুতাই বরং ছিল। কিন্তু যেহেতু সিরাজের প্রতি গ্রন্থকার, কি কারণে জানা যায় নি, অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন বলে শুধু তাঁর দোষই তিনি দেখেছেন এবং তাঁর শত্রু মীরজাফরকে অব্যাহতি দিয়েছেন বিনা বিচারে।

সিরাজের প্রতি যে গ্রন্থকার অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন তার একটি অতি দৃষ্টিকটু দৃষ্টান্ত দেখা যায় গ্রন্থের ষোড়শ পরিচ্ছেদে। সেখানে সিরাজ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইকরাম-উদ-দৌলাহ বিবাহের কিছু বর্ণনা আছে। সিরাজ শুধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন, তিনি বাংলার ভাবী নবাবও বটে। কিন্তু গ্রন্থকারের বর্ণনায় ইকরাম-উদ-দৌলার বিবাহের কিছু কিছু বর্ণনা থাকলেও সিরাজের বিবাহ সম্পর্কে কোনো বর্ণনাই নেই। সেখানে শিরোনামাতে আছে, 'ইকরাম-উদ-দৌলা ও অন্যান্যের বিবাহের বর্ণনা।'

এসব কারণে মনে হচ্ছে যে, গ্রন্থকার সিরাজের প্রতি এত বিরূপ ছিলেন যে, তিনি তাঁর সম্পর্কে কোনো ভাল কথা বলতে চান নি এবং যতটা সম্ভব তাঁর সম্পর্কে আলোচনা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে গেলে তাঁর দোষটাই শুধু তুলে ধরেছেন তাঁর কোনো গুণকেই নয়। অনুরূপ পক্ষপাতিত্বের আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় হাজী আহমদ সম্বন্ধে বর্ণনার ক্ষেত্রে। মানুষ হিসাবে এই লোকটির কিছু গুণ হয়তো ছিল এবং ছিল যে তার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় আলিবর্দী কর্তৃক ভাস্কর পণ্ডিত ও তার সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করার ঘটনার নিন্দা করার দৃষ্টান্ত থেকে। এই দৃষ্টান্তটি ছাড়া গ্রন্থকার সর্বত্রই তাঁর দোষই দেখিয়েছেন এবং তাঁর কাঁধে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে আলিবর্দীকে ধোয়া তুলসিপাতার মতো নির্মল দেখাতে চেষ্টা করেছেন।

তবে আলিবর্দী ও সিরাজ-উদ-দৌলার ব্যাপারে গ্রন্থকারের পক্ষপাতিত্ব এবং মারাঠাদের সঙ্গে আলিবর্দীর বিজয় সম্বন্ধে অতিরঞ্জনের কথা বাদ দিলে ইউসুফ আলী খানের বর্ণনা মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য বলা যায় এবং তাঁর গ্রন্থে সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে এমন সব বর্ণনা আছে যা অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ফারসি ভাষায় রচিত সমসাময়িক অন্য কোনো ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনার বর্ণনা নেই এবং একমাত্র আলোচ্য গ্রন্থেই এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার বর্ণনা আছে।[১] গ্রন্থকারের নিরপেক্ষতাকে এখানে সত্যিই প্রশংসনীয় বলা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি এবং সেই সব ঘটনার মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা শুধু তাঁর রচিত ইতিহাসেই পাওয়া যায়। সিয়ার, মোজাফফরনামা প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতাগণ যে অনেক

১। এই সম্পর্কে তারিখে যে বর্ণনা আছে (তা-ই, ১০০-২১ পৃ) তা নিম্নরূপ ঃ
"He Confined nearly a hundred Farangis who fell victim to the claws of fate on that day, in a small room and en-trusted the managment of the factory to some of the officers. Sirajud-Dawlah came out of the factory and began to stay in one of the houses of the Farangis. As luck would have it, in the room where the Farangis were kept confined , all of them got suffocated and died."

ঘটনার বিবরণে আলোচ্য গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন, সেই কথাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এইদিক থেকে বিচার করতে গেলেও প্রামাণ্য ইতিহাস হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য যে অপরিসীম তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

৫. গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও নামকরণ

খুব সম্ভব ১১৭৭ হিজরি (১৭৬৩-৬৪ খ্রিঃ) সনে রচিত এই গ্রন্থের সঠিক নাম গ্রন্থকার কি রেখেছিলেন অথবা রাখতে চেয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি এবং এই গ্রন্থের যে ছয়টি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, সেগুলিতেও গ্রন্থটির বিভিন্ন নাম দেখা যায়। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলি হচ্ছে- (১) ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি, (২) এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, (৩) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, (৪) রেজা লাইব্রেরী পাণ্ডুলিপি, (৫) সালার জঙ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি ও (৬) কলকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি পাণ্ডুলিপি। আলোচ্য গ্রন্থের ফারসি পাঠ প্রস্তুত করতে গিয়ে ডক্টর আবদুস সোবহান এই সব ক'টি পাণ্ডুলিপিরই সাহায্য নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।[১] পাণ্ডুলিপিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হল।

(১) ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি ঃ খুব সম্ভব খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে লিপিবদ্ধ এই পাণ্ডুলিপিতে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির মতো গ্রন্থকারের নাম নেই কিন্তু এতে গ্রন্থের নাম আছে এবং তা হচ্ছে, 'তারিখ-ই-বঙ্গালা [ই] মহাবতজঙী'। তুলনামূলকভাবে এই পাণ্ডুলিপিটি অন্যান্য পাণ্ডুলিপির চেয়ে অধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ডক্টর আব্দুস সোবহান জানিয়েছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আলোচ্য গ্রন্থের আরও দু'টি পাণ্ডুলিপি আছে বলে ডক্টর আবদুস সোবহান বলেছেন।

(২) এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি ঃ তারিখবিহীন এই পাণ্ডুলিপির পাঠ নির্ভুল ও খুব নির্ভরযোগ্য নয় বলে ডক্টর আবদুস সোবহান বলেছেন। পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থের কোনো নাম নেই। তবে গ্রন্থের শুরুতে ফারসি ভাষায় তারিখ-ই আলিবর্দী খান মহাবত জঙ (لغايت) লঘায়িত ১১৬৪ ইয়েক হাজার ওয়া সদ ওয়া শস্‌ত্‌ ওয়া চাহার হিজরী তা হকিকত-ই-ইখরাজ-ই-মরহাট্টা আয বলাসোরওয়া কটক' কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে।

(৩) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি ঃ খুব সম্ভব খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের (১১৯৯ হিজরি=১৭৮৬-৮৭ খ্রিঃ) এই পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থের নাম ঃ তারিখ-ই-ইলাহাবর্দী খান মহাবত জঙ' ছিল বলে ডক্টর আবদুস সোবহান বলেছেন। তবে পাণ্ডুলিপির 'কলোফানে' (Colophon) গ্রন্থের নাম 'কিতাব-ই-তোয়ারিখ নামা' ছিল বলেও তিনি বলেছেন।

(৪) রামপুর রেজা পাঠাগার পাণ্ডুলিপি ঃ হিজরী ১১৮৫ (১৭৭২ খ্রিঃ) সনের এই পাণ্ডুলিপিটিকে আলোচ্য গ্রন্থের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পাণ্ডু লিপিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলা যেতে পারে। এতে গ্রন্থের নাম আছে,. 'তাওয়ারিখ-ই-মহাবত জঙী'। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় আবার গ্রন্থের নাম দেওয়া হচ্ছে, 'তারিখ-ই-মহাবতজঙ'।

১। এ. এস. (ফা) -৯ পৃঃ।

(৫) হায়দরাবাদ সালার জঙ্গ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি ঃ প্রায় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপিটির অনুরূপ এই পাণ্ডুলিপিটিতে কোনো সন-তারিখ নেই। তবে এটি হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর (খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিনের) বলে অনুমিত। পাণ্ডুলিপির শুরুতে গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে, 'তারিখ-ই-মহাবত জঙ'।

(৬) কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি পাণ্ডুলিপি ঃ তারিখহীন এই পাণ্ডুলিপিটি হিজরী ত্রয়োদশ (খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ) শতাব্দীর বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এতে গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে, 'আহওয়াল-ই-আলিবর্দী খান'। প্রধানত এই পাণ্ডুলিপির নাম অনুসরণ করেই স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর অনূদিত 'বেঙ্গল নওয়াবস' গ্রন্থে আলোচ্য পুস্তকের নাম দিয়েছেন, 'আহওয়াল-ই-মহাবত জঙ'।

গ্রন্থের নামকরণ ঃ 'আহওয়াল-ই-আলিবর্দী খান', 'তারিখ-ই-আলিবর্দী খান মহাবত জঙ', 'তারিখ-ই-ইলাহবর্দী খান মহাবতজঙ' 'আহওয়াল-ই-মহাবত জঙ' ও 'তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গী' এই পাঁচটি নাম গ্রন্থের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত গ্রন্থটির বিভিন্ন নাম পর্যালোচনা করে ডক্টর আবদুস সোবহান তাঁর সম্পাদিত ফার্সি এবং ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থে পুস্তকের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে 'তারিখ-ই-বঙ্গালাহ-ই মহাবত জঙ্গী' (تاریخ بنگاله مهابت جنگی) এবং 'দি তারিখ-ই-বঙ্গালাহ-ই-মহাবতজঙ্গী' (The Tarikh-i -Bangala i-Mahabatijangi) এবং এই নাম করণ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য বলে আমরা তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছি।

১২জুন, ১৯৯৭

আ. কা. মো. যাকারিয়া

সংকেত তালিকা

সংকেত	মূল গ্রন্থের নাম ও রচনা	সম্পাদনা, অনুবাদ
এ. এস. বা তা-ই বা তারিখ-ই	ইউসুফ আলী খান কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাবত জঙ্গী গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ	ডক্টর আবদুস সোবহান কর্তৃক ইংরেজিতে অনুবাদ ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত
এ.এস. বা তা-ফা বা তারিখ-ফা	ঐ ফারসি পাঠ	ডক্টর আবদুস সোবহান কর্তৃক সম্পাদিত ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত
অ. বা.	মুনশি সলিম উল্লাহ কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত তারিখ-ই-বঙ্গালা গ্রন্থ	ডক্টর সৈয়দ ইমাম-উদ-দীন কর্তৃক সম্পাদিত ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মূল ফারসি পাঠ
মোজাফফর	করম আলী খান কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত মোজাফফর নামা গ্রন্থ	স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত ও কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল নওয়াব্‌স্' গ্রন্থ
য. না.	ফারসি ভাষায় ইউসুফ আলী খান রচিত আহ্‌ওয়াল-ই-মহাবত জঙ্গী, করম আলী খান রচিত মোজাফফর-নামা ও আজাদ আল-হোসায়নি রচিত নওবহার-ই-মুর্শিদ কুলিখানি গ্রন্থত্রয়	স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত এবং কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত
রিয়াজ-ই	ফারসি ভাষায় গোলাম হোসেন সলিম কর্তৃক রচিত রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ	জনাব আবদুস সালাম কর্তৃক রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ
রিয়াজ-বা	ঐ, বাংলা অনুবাদ	ঐ, জনাব আকবর হোসেন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত
সিয়ার-ফা	ফারসি ভাষায় ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ গোলাম হোসেন তবতবায়ি কর্তৃক রচিত সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরিন গ্রন্থ	১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে হাকিম আবদুল মজিদ কর্তৃক সম্পাদিত মূল ফারসি পাঠ

সিয়ার-ই		১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে হাজী মোস্তফা কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ
সিয়ার-বা		ডক্টর আবদুল কাদির কর্তৃক উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাংলায় অনূদিত ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত
এইচ-বি ২	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' ২য় খণ্ড	

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	মহাবত জঙের প্রথম জীবন	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	[নবাব] জাফর খানের মৃত্যু ও তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত	৭
তৃতীয় অধ্যায়	ফখর-উদ্-দৌলার পদচ্যুতি, আমিরুল ওমারার বিহারের সুবাদার ও শুজা খানের নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্তি	১১
চতুর্থ অধ্যায়	নবাব শুজা-উদ-দৌলার প্রয়াণ	১৪
পঞ্চম অধ্যায়	অন্যান্য ঘটনা [গিরিয়ার যুদ্ধ ও সরফরাজ খানের মৃত্যু]	১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাঙলায় আলিবর্দী খানের শাসনক্ষমতা লাভ	২৭
সপ্তম অধ্যায়	অন্যান্য ঘটনা [উড়িষ্যায় আলিবর্দীর সঙ্গে রুস্তম জঙের বিরোধিতা ও তাঁর পরাজয়]	৩২
অষ্টম অধ্যায়	মীর্জা বাকের খান কর্তৃক সওলত জঙকে বন্দীকরণ	৩৭
নবম অধ্যায়	বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাঙলা অধিকারে ভাস্কর পণ্ডিতের বর্ধমানে আগমন	৪২
দশম অধ্যায়	ভাস্করকে বহিষ্কারের জন্য আলিবর্দীর অভিযান ও তাঁর সমর্থনে সফদর জঙের আগমন	৫৪
একাদশ অধ্যায়	ঘটনার সন-তারিখ প্রদানে অক্ষমতার জন্য গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ	৫৯
দ্বাদশ অধ্যায়	বাঙলা অধিকারে ভাস্করকে নিয়ে রঘুজী ভোঁসলা ও সম্রাটের আদেশে নবাবের সাহায্যে বালারাও-এর বাঙলায় আগমন	৬১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ভাস্করের দ্বিতীয়বার কাটোয়ায় আগমন ও ১৯ জন সেনাপতিসহ তাঁকে হত্যা	৬৬

চতুর্দশ অধ্যায়	নবাবের চাকুরি থেকে মোস্তফা খানের ইস্তফাদান ও জয়ন-উদ-দীনের সঙ্গে যুদ্ধ	৭২
পঞ্চদশ অধ্যায়	মুর্শিদাবাদের কাছে রঘুর পুনরাগমন, বীরভূমের কাছে শিবির স্থাপন, আজিমাবাদের দিকে আগমন ও অবরুদ্ধ গোলাম মর্তুজাকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা	৭৮
ষোড়ষ অধ্যায়	ইকরাম-উদ-দৌলা ও অন্যান্যের বিবাহের বর্ণনা	৮৪
সপ্তদশ অধ্যায়	আতাউল্লাহ খান ও ইরাজ খানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৮৬
অষ্টাদশ অধ্যায়	কটক ও বালেশ্বরে মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবাবের অভিযান, রঘুজীর পুত্র জানুজীর কটকে আগমন ও মীর মোহাম্মদ জাফর খানের পলায়ন	৮৯
ঊনবিংশ অধ্যায়	শমশির খান ও অন্যান্য আফগানের বিদ্রোহ, জয়ন-উদ-দীন খানকে হত্যা ও আজিমাবাদ অধিকার এবং নবাবের আজিমাবাদে অভিযান ও বিদ্রোহীদের পতন	৯৫
বিংশ অধ্যায়	পুর্ণিয়ার ফৌজদার সাইফ খানের মৃত্যু ও পরবর্তী ঘটনা	১১৮
একবিংশ অধ্যায়	রঘুর পুত্র জানুজীর অবস্থা ও রায়রায়ান চিন রায়ের মৃত্যু	১২১
দ্বাবিংশ অধ্যায়	নবাবের মেদিনীপুর অভিযান, মারাঠাদের বহিষ্কার, কটক অধিকার ও অন্যান্য ঘটনা	১২২
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	বারবাটি দুর্গ ও কটক নগরের বর্ণনা	১২৭
চতুর্বিংশ অধ্যায়	অন্যান্য ঘটনা, শেখ আবদুস সোবহান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১৩০
পঞ্চবিংশ অধ্যায়	আলিবর্দীর পুনরায় মেদিনীপুর গমন ও শিবির স্থাপন, মেহদী নিসার খানের প্ররোচনায় সিরাজের মুর্শিদাবাদ ও আজিমাবাদ গমন ও আজিমাবাদ অধিকারের প্রচেষ্টা	১৩২

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়	জানকী রামের সঙ্গে সিরাজ-উদ-দৌলার যুদ্ধ, মেহদী নিসাব খানের মৃত্যু, নবাবের আজিমাবাদে আগমন ও সিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নবাবের অসুস্থতা ও মুর্শিদাবাদে প্রস্থানের বর্ণনা	১৪১
সপ্তবিংশ অধ্যায়	নবাব ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধি, অযোধ্যায় আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে আতাউল্লাহ খানের মৃত্যুবরণ এবং সেই সঙ্গে নউল রারের মৃত্যু বর্ণনা	১৪৭
অষ্টবিংশ অধ্যায়	রাম রায়ান বীরু দত্তের প্রয়াণ, কীরাত চাঁদ বাঙলার দিওয়ান নিযুক্ত, তাঁর মৃত্যুর পরে উমিদ রামের নিযুক্তি এবং জানকী রামের মৃত্যুর পর রামনারায়ণ আজিমাবাদের নায়েব নাজিম নিযুক্ত	১৫৫
নবমবিংশ অধ্যায়	শুকুর উল্লাহ্ খানের বিবাহ ও ইকরাম-উদ-দৌলার মৃত্যু	১৫৬
ত্রিংশ অধ্যায়	এই বছরে সিরাজ-উদ-দৌলা ও হোসেন কুলী খানের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি	১৫৯
একত্রিংশ অধ্যায়	১১৬৮ সনের অন্যান্য ঘটনা —খাজা আবদুল হাদি অবমানিত- ফয়াজ আলী খান খোরাসানীর বখশি পদ লাভ	১৬৩
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়	বাঙলার সিংহাসনে সিরাজ-উদ-দৌলার আরোহণ–তাঁর রাজত্বকালের ঘটনাবলী	১৬৪
	নির্ঘণ্ট	১৯৩

প্রথম অধ্যায়

মহাবত[১] জঙের প্রথম জীবন[২]

এই মহান উপাধিধারী ব্যক্তির[৩] (আলিবর্দী খান) পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতামহ[৪] সম্রাট আলমগীরের সঙ্গে তাঁর দুধভাই হিসাবে সুসম্পৃক্ত ও মনসবদারদের[৫] শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। আলিবর্দীর পিতা মীর্জা মোহাম্মদ একসময়ে শাহজাদা আজমের[৬] শিলাঞ্চী[৭] ছিলেন। সম্রাট আলমগীরের রাজত্বের প্রথম দিকে মীর্জা

---

১. আরবি এবং ফারসিতেও 'মহব্বত' (محبت) শব্দের অর্থ প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি ইত্যাদি। আর আরবি 'মহাবত' مهابة শব্দের অর্থ ঃ `Fearing; being in awe of reverence, fear, dread, majesty etc.

সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত আলিবর্দীর উপাধিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 'মহাবত জঙ অর্থাৎ সংগ্রামে পরাক্রমশালী' (majestic in battle) উপাধি। কিন্তু প্রায়ই ভুল করে তাঁকে অর্থহীন 'মহবত জঙ' উপাধি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

২. মূল ফারসি পাঠ, 'আওয়াবিল যিনদিগি-ই-মহাবত জঙ'। (اوایل زندگی مهابت جنگ)

৩. গ্রন্থকার প্রায় সর্বত্রই আলিবর্দী খানের নামের পরিবর্তে তাঁকে 'ম'লি-আলকাব' (معلی القاب) অর্থাৎ মহান উপাধিধারী ব্যক্তি অথবা অনুরূপ অর্থ বহনকারী গুণবাচক শব্দ দ্বারা পরিচিত করেছেন।

৪. আলিবর্দীর পিতামহের ('জদ্দ- جد)নাম আলোচ্য বা অন্যকোনো সমসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। করম আলীর 'মোজাফফরনামার' মতে (য. না. ১১ পৃঃ) আলিবর্দীর পিতার নাম শাহকুলি খান এবং তিনি ছিলেন শাহজাদা আজমের স্বর্ণালঙ্কার বিভাগের অধ্যক্ষ ('Supt of the Prince's goldware deptt.')। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর পিতার নাম মীর্জা মোহাম্মদ। সলিমউল্লাহ রচিত 'তারিখ-ই-বঙ্গালা' (তা, বা, ১০৬ পৃঃ) গ্রন্থে একই মীর্জা মোহাম্মদ নাম দেখা যায় এবং সেই গ্রন্থ মতে তিনি ছিলেন শাহজাদার 'বকাউল' (بکاول) অর্থাৎ প্রধান বাবুর্চি এবং সেখানে আলিবর্দীর নাম দেখা যায় মীর্জা বনদী(میرزا بندی)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে (H. B. II, P 436) ডক্টর কালী কিঙ্কর দত্ত বলেছেন যে, আলিবর্দীর পিতামহ ছিলেন একজন আরব ('His grand father was Arab in descent')। কিন্তু সমসাময়িক কোনো গ্রন্থে তাঁর এই পরিচয়ের তথ্য পাওয়া যায় না।

৫. চাকুরি বা মর্যাদা অর্থ বহনকারী আরবি 'মনসব' (منصب) শব্দের সঙ্গে ফারসি প্রত্যয়-বিভক্তি 'দার' (دار) যোগ করে মনসবদার শব্দের উদ্ভব। মোঘল আমলে এই শব্দ দ্বারা সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বোঝাত। সাধারণত দশ থেকে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অধিকার তাঁদেরকে প্রদান করা হতো এবং সেই জন্য তাঁদেরকে নগদ অর্থ বা প্রয়োজনীয় জাগির ভূমি বরাদ্দ করা হত। যুদ্ধকালে তাঁরা প্রভুর নির্দেশ মতো তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করতেন। তবে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রকৃত অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বরাদ্দকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম থাকত।

মোহাম্মদ এক পুত্র লাভ করেন এবং তাঁর নাম রাখা হয় মীর্জা আহমদ।[৮] এর প্রায় দশ বছর পরে দাক্ষিণাত্যের এক স্থানে[৯] এই 'রাজকীয় মণিমুক্তার চিহ্ন বহনকারী'[১০] (আলিবর্দী খান) ধরণীতে অস্তিত্ববান ও মীর্জা মোহাম্মদ আলী[১১] নামে পরিচিত হন।

---

৬. শাহজাদা আজম ছিলেন সম্রাট অওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র। তিনি ১০৬৩ হিজরী (১৬৫২-৫৩ খ্রিঃ) সনে শাহনওয়াজ খান সাফাভির কন্যা দিলরাস বানুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগরে তিনি তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী পিতার কাছেই ছিলেন। পাছে তাঁর অবস্থা তাঁর পিতা সম্রাট শাহজাহানের মতো হয়ে পড়ে এই আশংকায় তিনি তাঁর উচ্চাভিলাষী পুত্রকে মালবের সুবাদার নিযুক্ত করে সেখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি ফিরে আসেন এবং নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা মোয়াজ্জেম ছিলেন কাবুলের সুবাদার। তিনিও নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। সিংহাসন নিয়ে অওরঙ্গজেবের পুত্রদের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধে তাতে শাহজাদা আজম তাঁর দুই পুত্রসহ মারা যান। নিম্নে সম্রাট অওরঙ্গজেবের বংশতালিকা প্রদত্ত হল ঃ

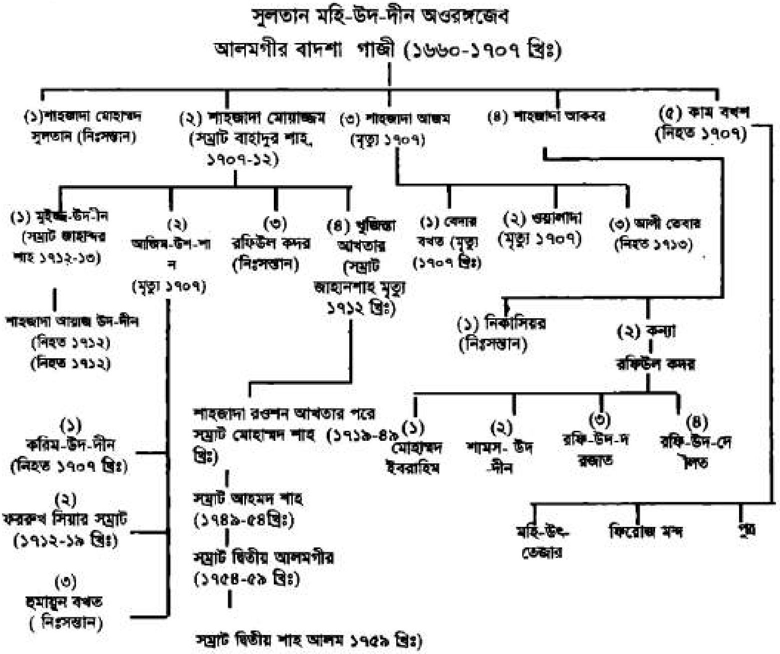

৭. ফারসি 'শিলা' (شلا) শব্দের অর্থ রাজকীয় ভোজের টেবিল। এর সঙ্গে তুর্কী প্রত্যয়-বিভক্তি 'চি' (چی) যোগে শিলাঞ্চী (شلانچی)শব্দের অর্থ সেই টেবিলের পরিবেশক বা 'খানসামান'।(خان سامان) রিয়াজের মতে তিনি ছিলেন শাহজাদার মদ্য পাত্র বাহক।

শাহী পরিবারের সঙ্গে] তাঁর পিতা-মাতার নৈকট্য হেতু বাল্যকাল থেকেই শাহী পরিবারে তাঁর যাতায়াত ছিল। বিচার-বিবেচনার বয়স হওয়ার (অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তির) পর মীর্জা আহমদকে শাহজাদা আজমের সরকারের পানীয়জল সরবরাহ বিভাগে আবদার খানার[১২] তত্ত্বাবধানে এবং এই মহান ব্যক্তিকে [প্রথমে] সূচি শিল্পখানার [ও পরে] হস্তীশালার তত্ত্বাবধানের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। সেই সময়ে প্রায়ই শাহজাদাদের সঙ্গে তাঁদের বাক্যালাপের সুযোগ ঘটত।

৮। তিনিই পরবর্তীকালে হাজী আহমদ নামে পরিচিতি ও কুখ্যাতি লাভ করেন। নিম্নে হাজী আহমদ ও আলিবর্দী খানদের বংশ তালিকা তুলে ধরা হল ঃ

(ক) আলিবর্দীর পিতামহ (নাম জানা যায়নি, তবে তিনি অওরঙ্গজেবের দুধভাই ছিলেন)

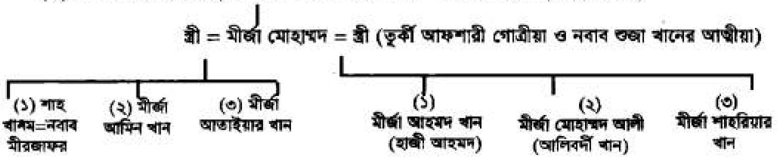

(খ) হাজী আহমদ ও আলিবর্দী খানের বংশ তালিকা

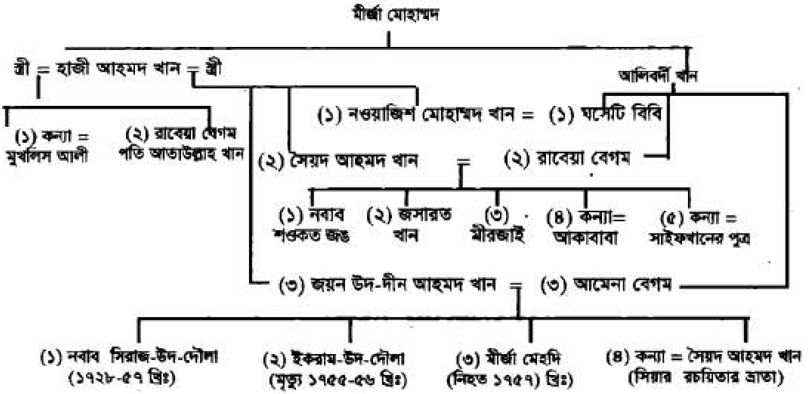

৯। মূল ফা. পাঠ ঃ 'ইয়েকে আয্ বেলাদ-ই-দকন' (یکی از بلاد دکن)। আরবি বেলাদ শব্দ দেশ ও শহর উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এখানে খুব সম্ভব শহর বা স্থান অর্থে।

১০। মূল ফা. পাঠ ঃ 'আন গওহর-ই-শাহওয়ার ইমারত' (آن گوهر شاهوار امارت)= off spring of royal signs'.

১১। রিয়াজ (রিয়াজ-ই, ২৯৩ পৃঃ), তা. বা, (১০৬ পৃঃ) ও মাসির-উল-ওমারা' (Calcutta, Vol. II, P. 543) ইত্যাদি গ্রন্থ মতে আলিবর্দীর নাম ছিল মীর্জা বন্দে (Bande) বা মীর্জা বনদী (میرزا بندی)।

১২। 'আবদার খানাহ' (ابدار خانه) শব্দের অর্থ পানীয় জলের আধার।

সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর [সিংহাসনের অধিকার নিয়ে] শাহজাদাদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে এই মহান উপাধিধারী ব্যক্তি শাহজাদা আজমের সঙ্গে [যুদ্ধ ক্ষেত্রে] অবস্থানকালে তীরের আঘাত পেলেও তা [নীরবে] সহ্য করেন। [সেই যুদ্ধে] শাহজাদা আজম নিহত হন এবং মীর্জা আহমদ ও এই উপাধিধারী ব্যক্তি তাঁদের [প্রাক্তন] প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে নিঃসঙ্গতার আশ্রয় নেন অর্থাৎ বেকার হয়ে পড়েন। 'প্রয়োজন আইনের ধার ধারে না'[১৩] এই বাক্যের মর্মানুসারে জীবিকা অন্বেষণ মানব জীবনে অপরিহার্য বিধায় কিছুদিন পরে এই উপাধিধারী ব্যক্তি 'ওয়ালিশাহী'[১৪] অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগদান করেন ও আমানত শাহ নকদী, শামস-উদ-দৌলা ও অন্যান্যের অধীনে কার্য করেন। কিন্তু তাঁর উন্নত মন-মানসিকতা এই ধরনের জীবিকা অর্জনের পথকে মেনে নিতে পারেনি। এই আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ জাগরিত হওয়ার ফলে ঝিনুকের অভ্যন্তরে মুক্তার আশ্রয় গ্রহণের মতো তিনি নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন।

এই সময়ে মীর্জা আহমদ হেজাজের পথে ভ্রমণে বের হন এবং কয়েক বছর পরে ফিরে আসেন। এই মহান ব্যক্তি সেই সময়ে অত্যধিক আর্থিক অনটনের মধ্যে পতিত হন।[১৫] কিন্তু যেহেতু তাঁর সৌভাগ্যের তারকা পূর্ব দেশে উদিত হবে বলে নির্দিষ্ট ছিল অদৃশ্য জগতের দেবদূতের [আহবানে][১৬] ও নিজ পিতা মীর্জা মোহাম্মদের আমন্ত্রণে[১৭]

১৩। মূল আরবি পাঠ ঃ 'আযযারুরাতু তুবিওল' ল্ মাহ্যুরাতে' (الضَّرُوْرَتُ تُبِيحُ المحظورات) = 'necessity knows no law'.

১৪। কোনো নৃপতি কর্তৃক নিজ ব্যয়ে এবং একান্তভাবে নিজের জন্য রক্ষিত সেনাদলকে 'ওয়ালি শাহী' (والى شاهى) বলা হত। প্রকৃত পক্ষে এরা ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দলের পর্যায়ভুক্ত।

১৫। আলিবর্দীর আর্থিক অবস্থা যে অত্যন্ত করুণ ছিল সেই বর্ণনা পাওয়া যায় করম আলী খান রচিত মোজাফফরনামায়। সেখানে (য. না.-১২ পৃঃ) আছে ঃ

"Alivardi sold the jewels of his wife for nine hundred rupees, and with the money hired a cart for his women and bought a horse for himself for Rs 300, took with himself Faqr-ullah Beg and Nurullah Beg, who were his old servants *(Khanahzad)* and arrived in Orissa in the year 1132 [1720 A.D.) to meet Shuja Khan".

১৬। মূল ফারসি 'সরোশ-ই-আলম-ই-খায়েব' (شروش عالم غايب) পাঠে 'সরোশ' (شروش) শব্দের অর্থ ফিরিশতাহ্ (angel)। এখানে আহবান বা ডাক অর্থে ব্যবহৃত।

১৭। এই সম্পর্কে সিয়ারের বর্ণনায় (সিয়ার-ই, ১ম খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ) আছে ঃ "This Mirza mahmed had been in the service of Aazam-shah the forgiven, and on his master's death he was reduced to the utmost poverty and distress ..... In this extremity Mirza mahmed aaly, son to Mirza mahmed, betook himself to the expedient of sending his mother and father to the court of Shudjah-qhan and this happend in the beginning of Mahammed Shah's reign...... He (Alivardi) at last arrived at the court of Orissa...."

সম্রাট মোহাম্মদ শাহর রাজত্বের প্রথম রাজ্যাঙ্কে[১৮] তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে অতিশয় অসহায় অবস্থায় বাঙলা হয়ে উড়িষ্যা রাজ্যের কটকের পথে যাত্রা করেন। তাঁর পিতা তখন কটকে শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খানের[১৯] নিকটে ছিলেন। মুর্শিদাবাদে আসলে [নবাব] জাফর খান[২০] তাঁর প্রতি কোনো সহানুভূতি প্রদর্শন করেননি। বরং একটি সুপরিচিত বর্ণনা মতে জানা যায় যে, তিনি তাঁর [মীর্জার] ক্ষতিসাধনের চেষ্টায়ই

১৮। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহর (১৭০৭-১২ খ্রিঃ) পৌত্র ও শাহজাদা খুজিস্তাহ আখতারের (সম্রাট জাহানশাহ, ১ম পৃঃ পাদটীকায় বংশ তালিকা দ্রঃ) পুত্র শাহজাদা রওশন আখতার দৈবক্রমে দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হন এবং সম্রাট মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে দীর্ঘকাল (১৭১৯-৪৯ খ্রিঃ) ধরে রাজত্ব করেন। ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে জাফর খান (নবাব মুর্শিদ কুলী খান নামে অধিক পরিচিত) ছিলেন বাঙলা ও উড়িষ্যার সুবাদার। তাঁর জামাতা শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান ছিলেন উড়িষ্যায় তাঁর নায়েব সুবাদার।

১৯। নবাব শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান ওরফে শুজা-উদ-দৌলা, সংক্ষেপে শুজা খান ছিলেন ইরানের তুর্কী সম্ভ্রান্ত আফশার গোত্রীয়। তাঁদের সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ১ম খণ্ড) বর্ণনা আছে। পরে তাঁর বংশ তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

২০. এই ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় না। তবে 'মাসির উল ওমারা' গ্রন্থে (৩য় খণ্ড ৭৫১ পৃঃ) থেকে জানা যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং হাজী শফি ইসপাহানী নামক বাঙলা ও দাক্ষিণাত্যের জনৈক উঁচু রাজস্ব কর্মকর্তা তাকে ক্রয় করেন এবং পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করেন এবং তাঁর নাম দেন মোহাম্মদ হাদি এবং খুব সম্ভব ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি জন্মভূমি ইরানে হাদিকে নিয়ে চলে যান। প্রভুর মৃত্যুর পর খুব সম্ভব ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মোহাম্মদ হাদি ভারতে ফিরে এসে বেরার প্রদেশে দিওয়ান হাজী আবদুল্লাহ খোরাসানীর অধীনে চাকুরি নেন।

এরপরে ক্রমশ তাঁর পদোন্নতি হতে থাকে এবং তিনি মনসবদার পদে উন্নীত হন এবং কারতলব খান উপাধি লাভ করেন এবং এসব উন্নতির মূলে ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, সততা ও তাঁর প্রাক্তন প্রভুর শিক্ষাদান। তিনি সম্রাট অওরঙ্গজেবের অধীনে বাঙলার দিওয়ান নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় আসেন এবং তার উপাধি হয় মুর্শিদকুলি খান এবং সম্রাট তাঁর কার্যে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁকে নিজের পুত্র-পৌত্রদের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করতেন। তিনি ১৭০৪ খিষ্টাব্দে বাংলার দিওয়ানি দফতর মুখসুসাবাদ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন এবং নিজের নামানুসারে সেই স্থানের নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। তিনি শেষ পর্যন্ত বাঙলা ও উড়িষ্যার সুবাদার ও দিওয়ান নিযুক্ত হন এবং একমাত্র কন্যা জেবুন্নেসা বা জিন্নতন্নেসাকে রেখে ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তিনি নবাব জাফর খান নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর কন্যাকে ইরানের সম্ভ্রান্ত আফশারী গোত্রের শুজা-উদ্-দীনের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু এই বিবাহের পরই জামাতার অমিতাচারি চরিত্রের কারণে তাঁর প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হন (উপক্রমণিকা দ্রঃ)।

ছিলেন। [তাঁদের মধ্যে] দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার কারণে[২১] জাফর খানের স্ত্রী মীর্জা মোহাম্মদ আলীর প্রতি তাঁর স্বামীর প্রতিকূল মনোভাবের বিষয়ে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে তাঁকে কটকে চলে যেতে বলেন। এই মহান পদবিধারী ব্যক্তি[২২] সৃষ্টিকর্তার সাহায্যের উপর নির্ভর করে তাঁর গন্তব্যস্থলের পথে যাত্রা করেন এবং [কটকে] শুজা-উদ-দীন খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শুজা-উদ-দীন ছিলেন জাফর খানের জামাতা ও কটকের শাসনকর্তা। এই উল্লিখিত খান মাননীয় অতিথির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে মাসিক একশ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করেন। সুন্দর বিচার বুদ্ধি ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গুণ তাঁর মধ্যে প্রশংসনীয়ভাবে বিদ্যমান দেখে শুজা-উদ-দীন খান তাঁকে কিছু খণ্ডকালীন কার্যে নিযুক্ত করেন। এইসব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হলে তিনি তাঁকে তাঁর রাজ্যের উৎকৃষ্ট অংশের ফৌজদার পদে নিযুক্তি প্রদান করেন।

---

২১. নবাব মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রীর নাম বা সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে ইউসুফ আলী খানের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এই মহিলা ইরানের তুর্কী আফশার গোষ্ঠীর লোক ছিলেন। কারণ, তা না হলে তিনি আলিবর্দী খানদের আত্মীয়া হতে পারেন না। আলিবর্দী খানরা যে আফশার গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন সেই কথা পূর্বেই বলা হয়েছে নবাব শুজা খানের বর্ণনা প্রসঙ্গে।

২২. ১ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার প্রায় সর্বত্রই আলিবর্দীর নাম উল্লেখ না করে তাঁকে আলী-ই-মোরাত্তবাত (عالی مرتبت) 'ওয়াল-ই-মোরাত্তবাত' (وال مرتبت) 'ওয়ালা-ই-নযাদ' (والانژاد) 'আলী কদর' (عالی قدر) প্রভৃতি উপাধি দ্বারা পরিচিত করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[নবাব] জাফর খানের[১] মৃত্যু ও তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত

আল্লাহ্‌র রহমতে জাফর খানের মৃত্যু হলে তাঁর দৌহিত্র ও শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খানের পুত্র সরফরাজ খান তাঁর (জাফর খান) উত্তরাধিকারী হিসাবে সিংহাসনে বসেন। শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান কটকে এই সংবাদ পান। বাঙলা [সুবা] শাসনের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেও এই রাজ্য লাভ করার বাসনা তাঁর ছিল। কিন্তু নিজের সন্তানের কাছ থেকে এই শাসনভার নিতে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় তা সম্ভব না হলে সংগ্রামের প্রয়োজন হলে তা হবে অবমাননাকর। এসব চিন্তা করে তিনি এ কাজ থেকে বিরত থাকতে চান।

কিন্তু অবশেষে এই সৌভাগ্যশালী প্রশাসকের (আলিবর্দী খান)[২] পরামর্শে তিনি বাঙলায় আগমনের সিদ্ধান্তে মনস্থির করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী এক স্থানে উপনীত হলে কয়েকজন দুর্বৃত্তের প্ররোচনায় সরফরাজ খান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান।[৩] কিন্তু মহত্ব তাঁর চরিত্রে নিহিত থাকার কারণে এই সংকল্প পরিত্যক্ত হয় এবং তিনি তাঁর মাননীয় পিতার অভ্যর্থনার জন্য দ্রুত এগিয়ে যান।[৪] [এরপরে] তাঁর পিতার সব আদেশ মেনে চলাকে তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন।

১। মৃত্যুকালে নবাব জাফর খান অপুত্রক ছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রিয়াজ (রিয়াজ বা, ২২৩ পৃঃ)-এর বর্ণনা মতে তিনি নিজ পুত্রের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। তাঁর কন্যার স্বামী ছিলেন ইরানের সম্ভ্রান্ত তুর্কী আফশারী গোত্রীয় শুজা-উদ্-দীন খান। শুজা খানের পিতামহ ছিলেন নবাব আকিল.খান। তিনি (আকিল খান) ও আলিবর্দী খানের আদি পুরুষ একই আদি পুরুষের ('জদ্দ') বংশজাত ছিলেন বলে মোজাফফরনামাতে (য. না. ১১ পৃঃ) বলা হয়েছে। শুজা খানের অশেষ চারিত্রিক গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও নারী দেহের প্রতি তাঁর সীমাহীন আসক্তির কারণে (তিনি একনাগাড়ে চার ঘন্টার অধিককাল স্ত্রী সহবাস ছাড়া থাকতে পারতেন না এবং জাফর খান একমাত্র বিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেন) শ্বশুর জামাতাকে সহ্য করতে পারতেন না এবং তিনি তাঁর একমাত্র দৌহিত্র সরফরাজ খানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু দিল্লীর দরবারে সম্ভ্রান্ত বংশীয় শুজা খানের অধিক প্রভাব থাকার কারণে তিনি সম্রাটের নিকট থেকে বাঙলার সুবাদারি লাভ করেন।

২। এই কথা যদি সত্য হয় তবে মেনে নিতে হয় যে, শুজা-উদ্-দীনের উপর আলিবর্দীর প্রভাব বেশ আগে থেকেই ছিল। তবে আলিবর্দীর স্তুতি গাইতে পারদর্শী গ্রন্থকারের এই বর্ণনা কতটুকু সত্য তা বলা কঠিন।

৩। মোজাফফরনামাতে (য. না. ১৩ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনাই আছে। কিন্তু সিয়ারের (সিয়ার-ই ১ম খণ্ড, ২৭৬-৭৮ পৃঃ) দীর্ঘ বর্ণনায় ভিন্ন বক্তব্য আছে।

৪। রিয়াজের মতে (রিয়াজ বা, ২২৭ পৃঃ) সরফরাজ খান তাঁর মাতামহীর পরামর্শে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেন এবং এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। তা. বা. মতে (৭৫ পৃঃ) তিনি তাঁর জননী ও নানীর উপদেশে পিতাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। সিয়ারের বিস্তারিত বিবরণীতে (সিয়ার-বা ৩০৭) সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বর্ণনা দেখা যায় এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, সরফরাজ খান এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না এবং পিতার সিংহাসন অধিকারের সংবাদ পেয়ে অমাত্যদের কথায় তিনি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক পিতার প্রতি অনুগত হন।

শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান [এভাবে] বাংলার শাসনকর্তার আসনে অধিষ্ঠিত হন। এই অতুলনীয় উপদেষ্টার (আলিবর্দী খান) অনুপম ব্যবস্থার কারণে তিনি বাহ্যত এই পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এই কথা স্মরণে রেখে তিনি (শুজা-উদ্-দীন) রাজ্যের পূর্ণ বা আংশিক কোন কাজই এই মহান ব্যক্তির (আলিবর্দী খান) উপদেশ ও পরামর্শ ছাড়া করতেন না।[৫] এই মহান ব্যক্তিকে আকবর নগরের ফৌজদার পদে নিযুক্তি দান করে তাঁকে উচ্চ পদে ও আলিবর্দী খান[৬] উপাধিতে ভূষিত করেন। হাজী আহমদ মুর্শিদাবাদের আবগারি শুল্ক বিভাগের [কর্মকর্তার] দায়িত্ব ও মীর্জা মোহাম্মদ রেজা (নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান) আবগারি শুল্ক বিভাগের সচিবের পদ লাভ করেন। মীর্জা মোহাম্মদ সাঈদকে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের বখশির পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে হাজী আহমদের[৭] বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ্ খানমের সঙ্গে সৈয়দ আহমদ নজফীর পুত্র মীর

৫। যে কোনো কারণেই হোক গ্রন্থকার প্রথম থেকেই আলিবর্দী খানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং অনেক সময় (বর্তমান দৃষ্টান্তসহ) তাঁর চাটুকারিতা যে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

৬। মীর্জা মোহাম্মদ আলীর আকবর নগর (অর্থাৎ রাজ মহলের ফৌজদারি পদ লাভ ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের সামান্য কিছুকাল পরের ঘটনা বলে মনে হয় এবং তখনই তিনি আলিবর্দী (علی وردی) (মহান উপাধিধারী) উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। তাঁর পিতা মীর্জা মোহাম্মদ (শাহ কুলী খান) খুব সম্ভব ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দের সামান্য কিছু পরে শুজা-উদ-দীন খানের নিকট উড়িষ্যাতে এসেছিলেন বলে মোজাফফরনামায় (য. না. ১২ পৃঃ) দেখা যায়। একই সূত্রে (য. না. ১২ পৃঃ) জানা যায় যে, ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দেই শুজা-উদ-দীন উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৭। মোজাফফরনামার বর্ণনা মতে (য. না., ১২ পৃঃ) হাজী আহমদ ১১৩৩ হিজরী (১৭২০-২১ খ্রিঃ) আমন্ত্রিত হয়ে তাঁর জননী ও সন্তানদের নিয়ে শুজা-উদ-দীন খানের নিকট উড়িষ্যাতে এসেছিলেন এবং সর্বক্ষণ নবাবকে সঙ্গদান ছাড়া নবাবের অধীনে অন্য কোনো চাকুরি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

হাজী আহমদ ও তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যের উড়িষ্যা আগমন সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ১ম খন্ড, ২৭৫-৭৬ পৃঃ) কিছু ভিন্ন ধরনের বর্ণনা আছে।

মোহাম্মদ জাফর খানের[৮] বিবাহ হয়। এই [মীর মোহাম্মদ জাফর] খান পরবর্তীকালে বাঙলার নবাব হয়েছিলেন এবং সেই বিস্তারিত ইতিহাস শীঘ্রই বর্ণনা করা হবে।[৯]

সংক্ষেপ, আকবর নগরের (রাজমহল) চাকুরির দায়িত্ব লাভ করার পর এই মহান খান (আলিবর্দী) এই স্থানের অভিমুখে যাত্রা করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে নবাব শুজা-উদ-দৌলা এই মহান ব্যক্তির (আলিবর্দী) সিদ্ধান্ত (রায়) ও মতামতের উপর নির্ভর করতেন বলে তিনি বছরে [অন্তত] একবার মুর্শিদাবাদে আসতেন।[১০] রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে তাঁর [আলিবর্দী খান] পূর্ণ জ্ঞান[১১] ছিল। যেসব বিষয়ে তাঁর [আলিবর্দী খান] অভিমত পাওয়া যেত সেগুলি সমাধা করার জন্য তিনি (নবাব শুজা খান) আদেশ দিতেন। তাঁর প্রগাঢ় বুদ্ধি ও বোধশক্তির ফলে তিনি নবাব

৮। ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে শুজা-উদ-দীন খানের বাঙলার সুবাদারি লাভের পর আলিবর্দী খান ও তাঁর পরিবারের আর সব সদস্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে দেখা যায়। এর পরপরই খুব সম্ভব মীর মোহাম্মদ জাফর খানের সঙ্গে শাহ খানমের বিবাহ হয়েছিল। সিয়ারের বর্ণনা মতে মীর জাফর খান ছিলেন হযরত আলীর বংশধর এবং মীর জাফরের পিতা সৈয়দ আহমদ নজফী ইরাকের নজফ শহর থেকে ভারতে এসেছিলেন। নিম্নে সিয়ারের বর্ণনা মতে তাঁদের বংশ তালিকা তুলে ধরা হল ঃ

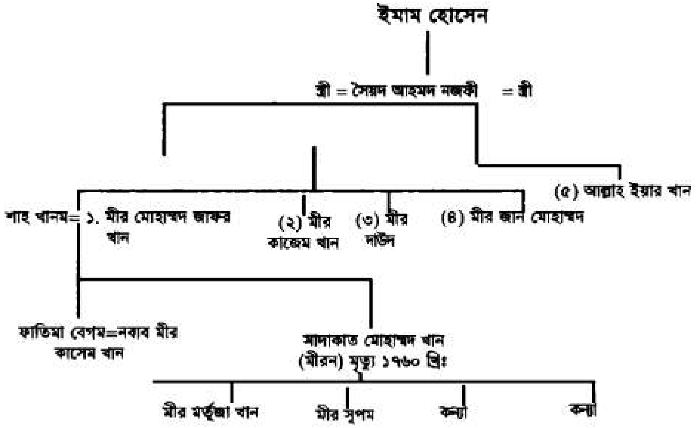

৯। সেই ইতিহাস গ্রন্থকার লিখে যেতে পারেন নি অথবা লিখে যাননি। তিনি এই গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে যান।

১০। আলিবর্দীর ব্যাপারে গ্রন্থকারের চাটুকারিতা প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টিকটু বলে দেখা যায়। বছরে মাত্র একবার নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলিবর্দী কি করে নবাব শুজা খানের প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান করতেন তা বুদ্ধির অগম্য।

১১। মূল ফাঃ পাঠে 'মদখিল' (مدخل) শব্দ আছে এবং এর বিভিন্ন অর্থের মধ্যে আছে, প্রবেশ, অধিকার, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এখানে এই শব্দ জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

শুজা-উদ-দৌলার[১২] মন-মানসিকতা এমনভাবে বুঝে নিয়েছিলেন যে, পূর্বাহ্নেই তিনি নবাবের মানসিক অবস্থা বুঝে নিতে পারতেন এবং তিনি (আলিবর্দী খান) অতি সুন্দর উপদেশ দিতে পারতেন বলে তাঁর সব মতামত নবাব শুজা-উদ-দৌলার নিকট গ্রহণযোগ্য হতো।

১২। নবাব শুজা-উদ-দৌলার বংশ পরিচয় ঃ

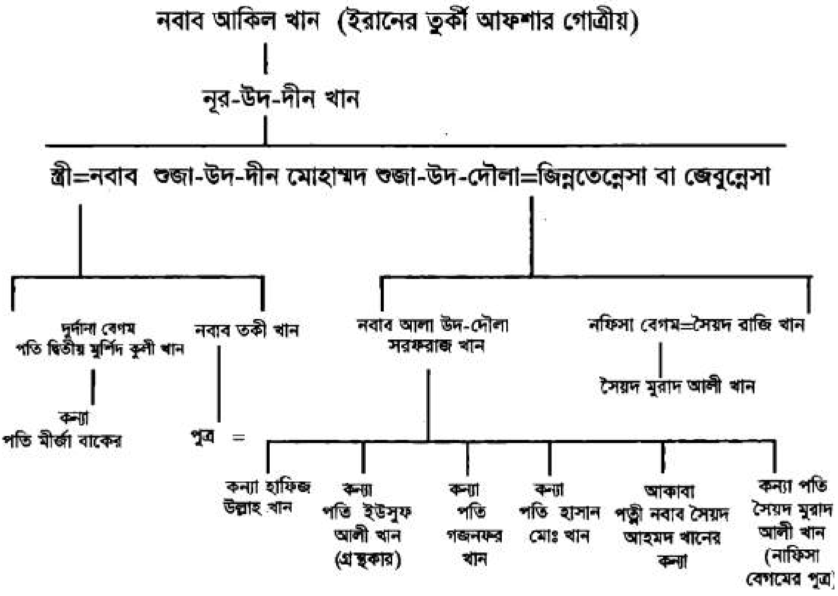

তৃতীয় অধ্যায়

ফখর-উদ্-দৌলার পদচ্যুতি -আমিরুল ওমারার বিহারের সুবাদার ও শুজা খানের নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্তি

ফেরদৌসবাসী[১] [সম্রাট] মোহাম্মদ শাহ পদচ্যুত ফখর-উদ-দৌলার স্থানে আমির-উল-ওমারা সমসাম্-উদ-দৗলাকে[২] বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে [এই] সমসাম-উদ-দৌলা ছিলেন [নবাব] শুজা-উদ-দৌলার শুভাকাঙ্ক্ষী ও সম্রাটের দরবারে তাঁর পক্ষে উকিল। তিনি নিজের পক্ষ থেকে শুজা-উদ-দৌলাকে আজিমাবাদ (বিহার) সুবার নায়েব-সুবাদার নিযুক্ত করেন। শুজা-উদ-দৌলার পক্ষে বাঙলা ছেড়ে যাওয়া অসুবিধাজনক বিবেচনা করে এবং সতীর্থ ও আত্মীয়দের মধ্যে কাউকে এ কাজের জন্য সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় তিনি তার পুত্রদের মধ্যে সরফরাজ বা তকী খানকে আজিমাবাদের নায়েব-নাজিম করে প্রেরণের কথা বিবেচনা করেন।

১। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্র (১৭১৯-৪৯ খ্রিঃ) মৃত্যু ঘটে ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে। আলোচ্য গ্রন্থ এই তারিখের অনেক পরে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল বলে গ্রন্থকার এখানে সম্রাটকে 'ফেরদৌসবাসী' (প্রয়াত) বলেছেন।

২। এ সম্পর্কে রিয়াজে (রিয়াজ বা, ২২৬ পৃঃ) বর্ণিত আছে ঃ "বাদশাহ মুহম্মদ শাহ জাফর খানের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর সৈন্য বাহিনীর প্রধান বখশী আমির-উল-ওমারা শামস-উদ-দৌলা খান-ই-দওরানকে বাংলার সুবাদারি পদে নিয়োগ করেছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন বাদশাহের অনুগত বন্ধু;........সর্বত্র তিনি ছিলেন বাদশাহের সঙ্গী। উপরোক্ত প্রতিনিধির পরামর্শে বিভ্রান্ত হয়ে আমির-উল-ওমারা বাংলার নিজামতের খেলা'ত শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খানের নিকট প্রেরণ করেন। এই সনদ পৌছানোর সময় শুজা-উদ-দীন মেদিনীপুরের প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। সনদ প্রাপ্তিকে সৌভাগ্যসূচক গণ্য করে তিনি এই স্থানের নাম দেন 'মুবারক মঞ্জিল' এবং একটি কাটরা ও একটি ইস্টক নির্মিত সরাইখানা তৈরির আদেশ দেন।"

সমসাম-উদ-দীনের প্রকৃত নাম ছিল খোয়াজা আসম। বদাখশান থেকে আগত তাঁর পূর্ব পুরুষগণ আগ্রাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। একজন ক্ষুদ্র মনসবদার হিসাবে তিনি আদিতে শাহজাদা আজিম-উশ্-শানের সঙ্গে ঢাকাতে অবস্থানরত ছিলেন। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তাঁর পিতা শাহজাদা মোয়াজ্জেমের (পরে সম্রাট বাহাদুর শাহ) নির্দেশে আজিম-উশ্-শান আগ্রা গমনকালে খোয়াজা আসমকে শাহজাদার পুত্র ফররুখ সিয়ারের নিকট ঢাকায় রেখে যান এবং তখন তিনি ফররুখ সিয়ারের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। ফররুখ সিয়ার প্রথমে তাঁকে 'আশরাফ খান' উপাধি প্রদান করেন এবং সম্রাট হওয়ার পর তাঁকে 'সমসাম-উদ-দীন' উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং সাত হাজার মনসবদারি প্রদান ও সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় বখশির পদে নিযুক্তিদান করেন। সম্রাট মোহাম্মদ শাহর রাজত্বকালে ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর সম্রাট তাঁকে 'আমির-উল-ওমারা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সাত হাজার মনসবদারি প্রদান ও সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় বখশির পদে নিযুক্তিদান করেন। সম্রাট মোহাম্মদ শাহর রাজত্বকালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর সম্রাট তাঁকে আমির-উল-ওমারা উপাধিতে ভূষিত ও প্রধান বখশির পদে নিযুক্ত করেন। নাদির শাহর ভারত আক্রমণকালে তিনি ১১৫১ হিজরী (১৭৩৮-৩৯ খ্রিঃ) সনে যুদ্ধে নিহত হন।

সরফরাজ খানের গর্ভধারিণী নিজপুত্রকে সেখানে প্রেরণ করতে সম্মত হন নি এবং সেই সঙ্গে তাঁর (শুজা খানের) অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তকী খানকেও সেখানে প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি। ঐশ্বরিক বিধানের কর্মকর্তাগণ এই সুমহান কর্ম পরিচালনার দায়িত্ব এই মহান ব্যক্তির (আলিবর্দী খান) উপর নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন বিধায় এই কাজের যোগ্য আর কাউকে পাওয়া যায় নি। অসংখ্য গুণের আধার একমাত্র এই ব্যক্তি (আলিবর্দী খান) এই বিহার সুবার অসুবিধাসমূহ দূর ও সমস্যাদির প্রতিকার করতে সমর্থ ছিলেন বলে শুজা-উদ-দৌলা তাঁকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে প্রেরণ করার আদেশ প্রদান করেন। অসাধারণ ধৈর্যের অধিকারী ছিলেন বলে এই মহান ব্যক্তি (আলিবর্দী) প্রথমে এই দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানান। কিন্তু বারবার অনুরোধ করার পর তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন।[৩]

শুজা-উদ-দৌলার স্ত্রী (জেবুন্নেসা)[৪] আলিবর্দী খানকে এই পদ প্রদানের ব্যাপারে তাঁর স্বামীকে সাহায্য করেছিলেন। এই পদে শপথ গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁকে (আলিবর্দী খান) তাঁর হেরেমের সম্মুখে আসতে আদেশ দেন এবং আলিবর্দী খান সেখানে উপস্থিত হলে তিনি এই সুবিচারক কর্মকর্তাকে আজিমাবাদের সুবাদারির সম্মানী পরিচ্ছদ (খিলা'ত)[৫] প্রদান করেন। এই পোশাক পরিধান করে আলিবর্দী খান নিজেকে শুজা-উদ্-দীনের নিকট হাজির করেন কৃতজ্ঞতা জানানোর অভিপ্রায়ে। শুজা-উদ্-দৌলা তাঁকে (আলিবর্দী খান) অন্যান্য উপঢৌকনের মধ্যে একটি তরবারি, রত্নখচিত একটি ছোরা, মাথার পাগড়ির জন্য মণি-মুক্তা ও উঁচু হাওদা বিশিষ্ট একটি হাতি উপহার দেন। দিন কয়েক পরে সম্রাট মোহাম্মদ শাহর রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে[৬] তিনি (শুজা খান) আলিবর্দী খানকে আজিমাবাদ গমনের অনুমতি প্রদান করেন। এই মহানুভব[৭]

৩। গ্রন্থকার চাটুকারিতার সব সীমা অতিক্রম করে গেছেন বলে মনে হয়।

৪। মূল ফারসি পাঠে শুজা-উদ-দৌলার স্ত্রীর উল্লেখ থাকলেও সেখানে তাঁর নাম নেই এবং স্যার যদুনাথের অনুবাদেও (য.না., ৮৫ পৃঃ) তাঁর নামের উল্লেখ নেই। মূল ফা. পাঠে আছে শুধু 'আহলিয়াহ্-ই-শুজা-উদ-দৌলা' (اهلیه شجاع الدوله)। ডক্টর আবদুস সোবহান কর্তৃক এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদে (তা-ই, ৮ পৃঃ) 'জেবুন্নেসা' নামের উল্লেখ দেখা যায় বন্ধনীতে। তাঁর এই নাম সম্পর্কে সমসাময়িক বিভিন্ন রচনায় মতপার্থক্য দেখা যায়। সিয়ার মতে (সিয়ার বা, ১ম খণ্ড ৩০৩ পৃঃ এবং আদি ইংরেজী অনুবাদেও ১ম খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ) তাঁর নাম ও পরিচয়ে আছে ঃ "শুজা খাঁর স্ত্রী, জাফর খাঁর কন্যা ও পরে সরফরাজ খাঁর মাতা যিন্নতুন্নেসা বেগম"। কিন্তু সিয়ারের মূল ফারসি পাঠে (সিয়ার-ফা, ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ) তাঁর নাম 'যেবুন্নেসা বেগম' । (زیب النسا بیگم)

৫। তাঁর শ্বশুর নবাব জা'ফর খানের সর্ব প্রকারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শুজা-উদ-দৌলা সম্রাটের দরবারে তাঁর নিজের প্রভাবের কারণেই বাঙলা ও উড়িষ্যার সুবাদারি লাভ করেন। জাফর খানের তেজস্বিনী কন্যা জেবুন্নেসা বোধ হয় মনে মনে এই সুবাদারিকে তাঁর পিতৃসম্পত্তি বলেই মনে করতেন এবং পিতার উত্তরাধিকারিণীর মত তিনি নিজেই আলিবর্দী খানকে খিলাত প্রদান করেন। এই এবং অনুরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয় যে, প্রশাসনিক ব্যাপারে এই মহিলা যথেষ্ট প্রভাব খাটাতেন।

আরবি খিলআত শব্দের অর্থ ঃ 'A robe of honour; a honorific dress with which princes confer dignity upon subjects, consisting at least of turban, robe and girdle.'

৬। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্র রাজত্ব শুরু হয় ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে। সেই হিসাবে এই ঘটনার তারিখ হবে ১৭৩৪ খ্রিঃ।

শাসনকর্তার সাহায্যপুষ্ট হয়ে আলিবর্দী খান তাঁর গন্তব্যস্থল অভিমুখে যাত্রা করেন। বিভিন্ন মনজিল[৮] অতিক্রম করে এবং (রাজ্যের) ছোট-বড় বিভিন্ন অধিবাসীর উপর তাঁর বদান্যতার ছায়া প্রদান করে তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই রাজ্যের কঠিন সমস্যাবলী অতিশয় সহজ ও অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমাধান করা হলে তিনি শুজা-উদ-দৌলার আহবানে দ্বিতীয় বর্ষে সেই মহান শাসনকর্তার সান্নিধ্যে উপস্থিত হন। যে সব বিষয়ের জন্য তাঁকে আহবান করে আনা হয়েছিল সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দ্বিতীয়বারেও তাঁর প্রতি অনেক আনুকূল্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের পর [নবাব শুজা-উদ-দৌলা] তাঁকে হৃষ্টচিত্তে বিদায় দেন। এই সময়ে শুজা-উদ-দৌলার প্রস্তাব মতে 'মহাবত জঙ'[৯] উঁচু উপাধি [সম্রাট কর্তৃক] আলিবর্দী খানকে প্রদান করা হয় এবং সেই সঙ্গে ঝালর দেওয়া একটি পালকিও উপহার দেওয়া হয়। ফলে আলিবর্দী খান তাঁর সমসাময়িক ও সমমর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্যে উঁচু মর্যাদা বিশিষ্ট হন।

৭। মূল ফা. পাঠের 'সমুয়াল মকান' (سموالمكان) শব্দের অর্থ ডক্টর আবদুস সোবহান দিয়েছেন Whose abode is elevated'। এখানে মহানুভব পাঠ অধিক সঙ্গত বলে মনে হয়।

৮। আরবি 'মনযিল' (منزل) শব্দ সরাইখানা, গৃহ, হোটেল, গন্তব্যস্থল, একদিনের ভ্রমণ ইত্যাদি অনেক অর্থে ব্যবহৃত। মোঘলদের সময়ে সৈন্য সামন্ত ও মালপত্রসহ একদিনের অতিক্রম্য পথকে 'মঞ্জিল' বলা হত।

৯। 'মহাবত জঙ' (مهابت جنگ) শব্দের টীকা ১ পৃষ্ঠার ১ পাদটীকায় দ্রঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

নবাব শুজা-উদ-দৌলার প্রয়াণ

সম্রাট মোহাম্মদ শাহর রাজত্বের একবিংশতিবর্ষে[১] বাঙলায় বার বছর[২] শাসনকার্য পরিচালনার পর দীর্ঘকাল ধরে জটিল ব্যাধি ও শক্তিহীনতার কারণে শুজা-উদ-দৌলা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর পুত্র আলা-উদ-দৌলা ওয়ারিস সূত্রে ও যোগ্যতার কারণে বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। প্রকৃত পক্ষে এই মহামহিম ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণতা ও স্পষ্টবাদিতায় ছিলেন অদ্বিতীয়। তরুণ বয়স ও সেই সঙ্গে ভোগ বিলাসের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি সেদিকে পা বাড়াননি।[৩] নফল নামাজ[৪]সহ [দিনে] পাঁচবার মসজিদে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তিনি (বছরে) তিন মাস অর্থাৎ রজব, শাবান ও রমজান এই তিন মাস রোজা রাখতেন এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক মাসের 'বাইজ'[৫]-এর দিন, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও হাদিস শরীফ[৬] মতে [আরও] যে সব দিনে রোজা রাখলে বিশেষ পুণ্য লাভ হয় সে সব দিনেও রোজা রাখার ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এক বছরের রাজত্বকালে গ্রন্থকার সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করত।[৭] সেই সব সময়ে অন্যায়ভাবে তো দূরের কথা, সঙ্গত কারণেও গ্রন্থকার তাঁকে ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখেনি। তাঁর রাজ্যের সকল অধিবাসী নির্যাতন ও সময়ের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভ করে সুখের শয্যায় শান্তি লাভ করত এবং বিনা আয়াসে জীবিকা অর্জন করত।

১। ৩০শে জুন, ১৭৩৯ খ্রিঃ। মোজাফফরনামা মতে (য. না. ১৯ পৃঃ) ১৩ জুন, ১৭৩৯ খ্রিঃ শুজা খান মারা যান।

২। য. না. (২৯ পৃঃ) মতে ১২ বছরের কথা নেই। কিন্তু মূল ফা. পাঠে 'পাস আজদোওয়াযদাহ্ সাল' অর্থাৎ 'বার বছর পরে' কথা আছে।

৩। অসংখ্য সদগুণের অধিকারী হলেও নবাব শুজা খানের নারী দেহের প্রতি আসক্তি ছিল অস্বাভাবিক। পিতার তুলনায় সরফরাজ খান ছিলেন গ্রন্থকারের বর্ণনামতে, ফেরেশতা তুল্য। তবে ডক্টর কে. কে. দত্ত কর্তৃক রচিত 'আলিবর্দী এন্ড হিজ টাইমস' (Alivardi and his Time's) গ্রন্থে (১৭ পৃঃ) বলা হয়েছে যে, বাহ্যিক ধার্মিকতার মুখোশ ধারণ করলেও সরফরাজ খান অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন এবং তাঁর হেরেমে ১৫০০ নারী ছিল। এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। তবে সিয়ারের বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁর বেশ কয়েকজন উপপত্নী থাকলেও বিবাহিতা পত্নী ছিলেন মাত্র একজন।

৪। মুসলমানের নামাজের মধ্যে 'ফরজ' ও 'সুন্নত'সহ বাধ্যতামূলক নামাজ পড়ার বিধান আছে। বাধ্যতামূলক নয় এ ধরনের নামাজকে 'নফল' (বহুবচনে نوافل নোয়াফিল) বলা হয়।

৫। 'আইয়াম-উল-বইয' (ايام البيض) নতুন চন্দ্র থেকে গণনা করে আরবি মাসের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ কারো কারো মতে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ) দিবসকে 'বইয' (بيض) বলা হয় এবং সেই সব দিনে রোজা রাখা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

৬। হাদীস শরীফ ঃ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী। কোরানের পরই এগুলির স্থান।

৭। গ্রন্থকার ছিলেন সরফরাজ খানের জামাতা। তবে তাঁর বিয়ে কবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ ধরনের গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র, সরকার পরিচালনা এবং গোয়েন্দাগিরির কলাকৌশলে তিনি ছিলেন অজ্ঞ এবং পার্থিব জীবনে এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।[৮] এ কারণে পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করতে পারেননি এবং শত্রুদের বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন। বর্তমান যুগের বিচারক ও প্রশাসকদের মতো পূর্ব পুরুষের আত্মীয় ও বন্ধুদের আঘাত দিতে, ক্ষতি ও অসম্মান করতে তিনি পারেন নি এবং যাঁরা তাঁর ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই পদ ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন তাঁর পিতার সেইসব বন্ধু ও আত্মীয়দের প্রতি ব্যবহারে সরফরাজ খান কোনো পরিবর্তন আনয়ন করেন নি এবং প্রত্যেককে তিনি তাঁর আদি পদে বহাল রাখেন। খালিসা[৯] [সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক] রায় রায়ান মুৎসুদ্দি [আলমচাঁদ], জগৎশেঠ ও হাজী আহমদকে নিয়ে গঠিত শুজা-উদ-দৌলার রাজ্যের স্তম্ভ ও অবলম্বনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে তিনি কোনো ভুল করেন নি যদিও তিনি ভাল করেই জানতেন যে, এই তিনজন বিশেষ করে হাজী আহমদ তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত ছিলেন।[১০]

কিন্তু এ সময়ে মীর মর্তুজা, হাজী লুৎফে আলী খান, মরদান আলী খান ও সরফরাজ খানের অন্যান্য আমির ও সভাসদ হাজী আহমদের প্রতি যাঁদের অনেক দিনের ও গভীর শত্রুতা ছিল তাঁরা তাঁর (হাজী আহমদ) প্রতি বিদ্রুপ ও গালিবর্ষণ করতেন এবং বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়তই তাঁর (হাজী আহমদ) কুমতলবপূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বলতেন। এসব কুমতলবমূলক উদ্দেশ্যের কথা তিনি (হাজী আহমদ) কোনো কোনো সময় সরফরাজ খানের সামনেই বলে ফেলতেন।'[১১] ফলে শুজা-উদ-দৌলার সময় থেকে দিওয়ানির যে 'সীল'[১২] অর্থাৎ মোহর-ই-দিওয়ানি হাজী আহমদের অধিকারে ছিল তা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মীর মর্তুজাকে প্রদান করা হয়। তিনি আরও আদেশ দেন যে, হাজী আহমদের জামাতা ও রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাহ খানকে[১৩] পদচ্যুত করে সেই চাকুরিতে তাঁর (সরফরাজ খান) জামাতা হাসান মোহাম্মদ খানকে[১৪] নিযুক্ত

৮। সিয়ার (সিয়ার-ই ঃ ৪০৪ পৃঃ) মতে তাঁর কোনো শাসন ক্ষমতা ও কর্তব্য কার্য সম্পাদনের কোনো ক্ষমতা ছিল না। তবে তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন বলে আলিবর্দী ও হাজী আহমদের চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন।

৯। 'খালিসা' ছিল মোঘল আমলে সরকারের অর্থাৎ শাসনকর্তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

১০। এই তিন কুচক্রীর চক্রান্তের ফলেই তিনি নিহত হন।

১১। সিয়ারের ইংরেজি অনুবাদের ২৬ টীকায় (সিয়ার-বাঃ ৪১১ পৃঃ) বলা হয়েছে, "শুজা খাঁ প্রকৃত পক্ষে চারি ঘন্টাও কোনো না কোনো নারী ভিন্ন থাকিতে পারিতেন না; তাঁহার জন্য অবিরত নতুন সুন্দরীর সন্ধানে নিরত থাকিতে গিয়া হাজী আহমদ এই সকল আমীরের পরিবারে হানা দেন; তজ্জন্য তাঁহারা বরাবরই তাঁহার সম্পর্কে অবজ্ঞার সহিত কথা বলিতেন। সরফরাজ খাঁ নিজেও তাঁহাকে কদাচিৎ কোটনি, বওদ অর্থাৎ নারী সংগ্রহকারিণী ভিন্ন অন্য নামে অভিহিত করিতেন।"

১২। 'মোহর-ই-দিওয়ানি' (مهر دیوانی) অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের কর্তৃত্বের সীলমোহর।

১৩। হাজী আহমদের এক স্ত্রীর গর্ভজাত এক কন্যার (কনিষ্ঠ কন্যা) নাম ছিল রাবিয়া বেগম (আলিবর্দী খানের এক কন্যার নামও ছিল রাবিয়া বেগম) (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড ১০৬ পৃঃ)। তাঁর সঙ্গে আতাউল্লাহ খানের বিয়ে হয় এবং তিনি হাজী আহমদ ও আলিবর্দী খানের প্রভাবে নবাব শুজা খান কর্তৃক রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে এই বিবেকবর্জিত শাসনকর্তা অপরিসীম সম্পদের অধিকারী হন এবং আলিবর্দী বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিলে অযোধ্যাতে তিনি নিহত হন। প্রকৃতপক্ষে আতাউল্লাহ খান ছিলেন আফশারী গোত্রীয় ও নবাব শুজা খানের আত্মীয়।

করা হোক। এভাবে উৎপীড়িত এবং [তাঁর বিরুদ্ধে] শক্রদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সন্ধিহান হয়ে হাজী আহমদ সরফরাজ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনায় লেগে যান এবং বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে শক্রতার আশ্রয় নেন। ব্যয় সংকোচের নামে তিনি সরাফরাজ খানকে সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার পরামর্শ দেন। ফলে তিন-চার হাজারের বেশি অশ্বারোহী সৈন্য তাঁর [সরফরাজ খান,থাকেনি।[১৫]

ইতোমধ্যে রংপুর থেকে[১৬] সৈয়দ আহমদ খান ও আজিমাবাদ থেকে জয়ন-উদ-দীন খান, হাজী আহমদের এই দুই পুত্র সরফরাজ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। মিনু চিহির খান ও হাজী আহমদের প্রতি যাঁদের শক্রতা ছিল তাঁরা হাজী আহমদ খান ও তাঁর দুই পুত্রকে গ্রেফতার ও কয়েদ করার জন্য নবাব সরফরাজ খানের নিকট প্রস্তাব দেন যাতে [নবাবের বিরুদ্ধে] বিদ্রোহী হওয়া ও যুদ্ধ করার কোনো অভিপ্রায় থাকলেও তাঁদের এই বন্দীত্বের কারণে তাঁরা তাঁদের শক্তি ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন। নবাব সরফরাজ খান [এই প্রস্তাব] গ্রহণ করেননি বরং অতিশয় সরলতার কারণে এই গোপন তথ্য হাজী আহমদের কাছে প্রকাশ করে দেন। কিন্তু হাজী আহমদ কোনোমতেই [নবাবের এই সরলতাকে] মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন নি (অর্থাৎ বিশ্বাস করেন নি)। তিনি এ ব্যাপারে আলিবর্দীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং সেই সঙ্গে সরফরাজ খান সম্বন্ধে কতগুলি ভিত্তিহীন অপবাদের কথাও জানান এবং [এর ফলে] নবাবের প্রতি আলিবর্দী খানকে বিরূপ করে ফেলেন।[১৭]

আলিবর্দী খান মানবিক ও তাঁর মর্যাদাবোধের কারণে[১৮] সন্দিগ্ধ ও ভীত হয়ে পড়েন এবং তাঁর উপর পতিত কোনো ক্ষতি বা উৎপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে বাদশাহী দরবারে তাঁর ও নবাব সরফরাজ খানের জন্য নিয়োজিত উকিল যুগল কিশোরের নিকট [হাজী আহমদ কর্তৃক প্রেরিত] বর্ণনা উল্লেখ করে এই মর্মে সম্রাটের দরবারে আবেদন করেন যে, আজিমাবাদের সুবাদারির পদ যদি আলিবর্দী খানকে প্রদান করা হয় তবে তিনি এসব উদ্বেগের হাত থেকে রেহাই পান এবং [সেই সঙ্গে] তিনি

১৪। গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খান ছাড়া হাসান মোহাম্মদ খান নামক সরফরাজ খানের আরও এক জামাতার নাম এখানে পাওয়া যাচ্ছে। রিয়াজের মতে (রিয়াজ বাঃ ২৪২ পৃঃ) তাঁর নাম সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন খান এবং তিনি তাঁকে পাটনার নায়েব সুবাদার ও মীর শরফ-উদ-দীনকে রাজমহলের ফৌজদার করতে চেয়েছিলেন। সরফরাজ খানের আরও তিন জামাতা ছিল (বংশ তালিকা দ্রঃ)।

১৫। হাজী আহমদ ও আলিবর্দী গোড়া থেকেই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ও সুযোগের সন্ধানে ছিলেন।

১৬। হাজী আহমদের দ্বিতীয় পুত্র সওলত জঙ্গ উপাধিধারী সৈয়দ আহমদ (আদি নাম মোহাম্মদ সাইদ) রংপুর ও ঘোড়াঘাট অঞ্চলের ফৌজদার ছিলেন এবং প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করে অশেষ সম্পদের অধিকারী হন। হাজী আহমদের কনিষ্ঠ পুত্র জয়ন-উদ-দীন (নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পিতা) আজিমাবাদে ছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে।

১৭। নবাব সরফরাজ খানের জামাতা হয়েও গ্রন্থকার ইউসুফ আলীর পক্ষে নবাব আলিবর্দী খানের সাফাই গাওয়া ও তাঁর মাত্রারিক্ত প্রশংসা করার প্রয়োজন হয়তো ছিল ব্যক্তিগত কারণে এবং তিনি তা করেছেনও। কিন্তু আলিবর্দী যে গোড়া থেকেই সিংহাসন অধিকার করার জন্য সুযোগের সন্ধানে ছিলেন ঘটনাবলীই তা প্রমাণ করে।

১৮। মূল ফারসি, 'ব-মুকতযা-ই-ব-শরিয়ত ওয়া ব-পাস-ই-হোরমত' (بقتضای شریت و بپاس هرمت) পাঠের আক্ষরিক অর্থ 'in conformity with human nature and in consideration of his honour' ডক্টর আবদুস সোবহান পাদটীকায় (তা-ই, ১১ পৃঃ) দিয়েছেন যদিও মূল অনুবাদে তিনি শুধু 'naturally' শব্দই ব্যবহার করেছেন। পাদটীকার পাঠই সঠিক।

বাঙলার সুবাদারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করবেন [বলেও জানান]।[১৯] যুগল কিশোর আলিবর্দী খানের উপর প্রসন্ন ছিলেন না বলে মূল পত্রখানা নবাব সরফরাজ খানের নিকট প্রেরণ করেন এবং তার ফলে সরফরাজ খান হাজী আহমদের শত্রুগণ কর্তৃক [পূর্বে] বর্ণিত সব কথা বিশ্বাস করেন।[২০] বিরক্ত হয়ে তিনি আজিমবাদের হিসাব তলব করেন এবং নবাব শুজা-উদ-দৌলার সময় থেকে যে সেনাদল আজিমাবাদে ছিল তা ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন।[২১] যেসব সৈনিক নবাবের এই আদেশ পালনে অবহেলা করে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলায় তাদের নিকট ভীতি ও আতঙ্ক প্রদর্শনকারী সংবাদ প্রেরণ করা হয় এবং নবাব শুজা খান কর্তৃক নিযুক্তি সময় থেকে যেসব অনুদান দেওয়া হতো সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বাতিল করে দেওয়া হয়।

হাজী আহমদ ছিলেন এই সব আলোড়ন ও অশান্তির মূলে। এই অবস্থায় তার মনকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে [তাঁর জামাতা] আতাউল্লাহ খানের কন্যার সঙ্গে সরফরাজ খানের এক পুত্রের[২২] বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় যাতে আমির-ওমারাদের মধ্যে হাজী আহমদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং যে কপটতা ও অসন্তুষ্টির কথা জনসমাজে বলাবলি হতো তা ঐক্য ও বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

হাজী আহমদ [এই ব্যাপারে] বিকৃত বর্ণনা[২৩] দিয়ে আলিবর্দীর নিকট পত্র লিখেন এবং তা ছিল নিম্নরূপঃ

১৯। নবাব সরফরাজ খান আলিবর্দীর সঙ্গে তখন পর্যন্ত এমন কোনো ব্যবহার করেন নি যাতে তিনি দিল্লীর শাহী দরবারে এই প্রস্তাব দিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে গোড়া থেকেই আলিবর্দীর আকাশচুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভ তাঁকে শুধু অকৃতজ্ঞ নয়, বিশ্বাসঘাতক হতে প্ররোচিত করে। অমানুষ হাজী আহমদের দোষের শেষ নেই। কিন্তু আলিবর্দীর সীমাহীন লোভই যে সব অঘটনের মূলে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সিয়ারের বর্ণনা মতে (সিয়ার-ই, ১ম খণ্ড ৩২৮ পৃঃ) আলিবর্দী শুধু বিহার নয়, তিন প্রদেশের সুবাদারিই চেয়েছিলেন। সেখানে আছে ঃ ".... and he (Alivardi) wrote him a secret letter in which he requested to have the patents of the three provinces transferred to himself, under promise of sending to court a present of a crore of rupees, over and above the confiscation of Serefraz qhan's wealth and estate and over and above the yearly usual tribute of a croror."

২০। এই পত্র পাওয়ার পরও সরফরাজ খান কেন আলিবর্দীকে বরখাস্ত করেননি তা ই আশ্চর্যের ব্যাপার। হয়তো প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো ক্ষমতাই ছিল না অথবা তিনি অতি সরল, সহজ ও নির্ঝনঝাট প্রকৃতির লোক ছিলেন বলে তেমন কিছু করতেও চাননি।

২১। এই হিসাব তলব করার অধিকার নবাবের ছিল। এই সম্পর্কে আলিবর্দীর আর এক চাটুকার করম আলী বলেন (য. না., ১৯-২০ পৃঃ) "Nawab Sarfaraz Khan, at the instigation of evil minded men and caluminators became unreasoably displeasd with Alivardi Khan. Allthough some of his well-wishers told him that Alivardi was a man exalted by divine aid and a warrior blesed with God given victories, so that it was unwise to quarrel with him, Sarfaraz would not listen to them and sent him hard messages and improper letters and began to treat Haji Sahib and his relatives with redicules." এই বর্ণনা যে, পক্ষপাতদুষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২২। তখন পর্যন্ত সরফরাজ খানের একজন মাত্র পুত্র সন্তান ছিল বলে জানা যায় এবং তাঁর নাম ছিল হাফিজ উল্লাহ খান (রিয়াজ বা, ২৫২ পৃঃ)। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আকাবাবার তখনও জন্ম হয়নি। আলোচ্য প্রস্তাব অত্যন্ত সরলভাবে করা হয়েছিল বলে ইউসুফ আলীর বর্ণনায় দেখা যায়। কিন্তু সিয়ারে এ সম্পর্কে যে মোটামুটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে (সিয়ার বা, ১ম খণ্ডে, ৩৮০ পৃঃ) তা পক্ষপাতদুষ্ট।

২৩। মূল ফা. পাঠঃ 'বা ফহশ ইবারত' (با فحش عبارت) with twisted language.'।

অপমান ও আসম্মান সীমার বাইরে চলে গেছে এবং এখন তা প্রকাশ্য অবমাননা ও প্রচন্ড দৌরাত্ম্যের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জয়ন-উদ-দীনের পুত্র মীর্জা মোহাম্মদের সঙ্গে আতাউল্লাহ্ খানের যে কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে আছে তাঁকে তিনি (নবাব) নিজের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান। সাঈদ আহম্মদ নিজেও তাঁর পিতার বক্তব্য সমর্থন করে তাঁর চাচার নিকট পত্র লিখেন। কিন্তু হাজী আহমদের অপর পুত্র জয়ন-উদ-দীন খান তাঁর পিতৃব্যকে প্রতারিত করে অপরাধী হতে চাননি। প্রকৃতপক্ষে আলিবর্দী [সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে] যুদ্ধ করতে চান নি। গ্রন্থকার নিজে তাঁকে বলতে শুনেছেঃ

"আমি আজিমাবাদে পূর্ণ মানসিক শান্তি ও আরামদায়ক জীবনে সব বস্তুর অধিকারী ছিলাম। একমাত্র হাজী আহমদ ও সৈয়দ আহমদের প্রত্যয় উৎপাদনেরই প্রচেষ্টা ও প্ররোচনার ফলে আমি বিপদসঙ্কুল ঘূর্ণিবাত্যায় নিজেকে নিক্ষেপ করেছি এবং [এর ফলে] মানুষের নিকট নিন্দার্হ ও সৃষ্টিকর্তার কাছে অপরাধী হয়েছি"[২৪]

আলিবর্দী খানের এইসব উক্তির যথার্থতা এই যে, [তাঁর] এই সতের বছরের রাজত্বকালে জনগণ জয়ন-উদ্-দীন খানের পুত্রদের নিকট থেকে যে অন্যায় পেয়েছে ও তাঁদের কারণে যে ক্ষতিভোগ করেছে তা স্পষ্টতই তাঁদের দুর্নীতিপরায়ণতা ও অসৎ অভিপ্রায়ের কথা প্রমাণ করে।[২৫]

২৪। এই বাক্যের শেষাংশের ফা. পাঠঃ 'মলুম-ই-খলাইক ওয়া মোয়া'তব-ই-খালিক' (ملوم خلایق و معاتب خالق) 'stand reprehended and censured before both the people and God.' গ্রন্থকারের পক্ষে আলিবর্দীর জন্য এ ধরনের সাফাই গাইবার পিছনে হয়ত ব্যক্তিগত কারণ ছিল। গ্রন্থের এই অংশ রচনাকালে আলিবর্দী ছিলেন ক্ষমতার অধিকারী এবং গ্রন্থকার ছিলেন তাঁর আশ্রিত। এই পরিবারের আর সব সদস্যের চেয়ে আলিবর্দী তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল মানুষ ছিলেন সন্দেহ নেই। তবে গ্রন্থকার তাঁকে যতটা ভাল মানুষ বলে নানাভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ঠিক ততটা ভাল মানুষ তিনি ছিলেন বলে নিরপেক্ষ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

২৫। গ্রন্থকার এই অনুচ্ছেদে কিছুটা সত্য কথাই বলেছেন। তবে শুধু জয়ন-উদ্-দীনের পুত্রগণ নয়, সাঈদ আহমদের পুত্ররাও এই ব্যাপারে কম দায়ী নন এবং আলিবর্দীর নিজের ভূমিকাও প্রশংসনীয় ছিল না। সিংহাসনে তাঁর বংশের অধিকারকে নিরঙ্কুশ করার জন্য তিনি একের পর এক অন্যায় করে গেছেন। অন্ধ স্নেহের কারণে তিনি সিরাজ-উদ-দৌলা ও তাঁর অন্যান্য দৌহিত্রকে কোনো সুশিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন নি এবং তাঁদেরকে বিশেষ করে সিরাজকে এমনভাবে প্রশ্রয় দেন যে, তাঁদের ন্যায়-অন্যায় বোধ বলে কোনো বস্তু ছিল বলে দেখা যায় না। তিনি বহুক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ করে সিরাজের গর্হিত আচরণকে শুধু প্রশ্রয়ই দেননি, সমর্থনও করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিরাজ কর্তৃক হোসেন কুলী খানের নৃশংস হত্যার কথা বলা যেতে পারে। ডক্টর আঃ সোবহান আলিবর্দীর গিরিয়ার যুদ্ধের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে গিয়ে বলেছেন (তা-ই ১২পৃ. ২ পাদটীকা)ঃ

"These last few sentences of Yusuf Ali are, historically speaking, very significant as they throw new light on the character of 'Alivardi in respectof his much-maligned treatment of Sarfaraz Khan. They clearly indicate that the responsibility for the battle of Giria rests mostly on Sarfaraz's bellicose advisors and Haji Ahmad's deceitful conduct."

কিন্তু এ অভিমত আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। ইউসুফ আলী সত্য কথা বলেননি, বলতে পারেন নি হয়ত সঙ্গত কারণেই। করম আলীর জন্ম আলিবর্দীর গৃহে এবং আত্মীয় হিসাবে বরাবরই তিনি ছিলেন আলিবর্দীর গৃহে আশ্রিত। সিয়ার রচয়িতা গোলাম হোসেন খানও ছিলেন আলিবর্দীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনিও যে পূর্ণ সত্য প্রকাশ করেননি তাঁর রচিত ইতিহাসই তা প্রমাণ করে। রিয়াজ রচয়িতা গোলাম হোসেন সলিমকে মোটামুটি নিরপেক্ষ বলা যায়। তাঁর বর্ণনা থেকে আলিবর্দীর শঠতা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমানের সবচেয়ে পবিত্র বস্তু কোরান নিয়েও যে তিনি প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই প্রমাণ রিয়াজে (রিয়াজ-বা ২৪৫পৃঃ) আছে। সেখানে আছে, "হাজীর মুক্তিকে বিজয়ের শুভ চিহ্ন মনে করে আলিবর্দী একটি ক্ষুদ্র বাক্সে একটি ইট রেখে বলেন যে, এরমধ্যে কুরআন আছে এবং সেটি হাতে নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন পরদিন সকালে তিনি জোড়হস্তে নওয়াব সরফরাজ খানের সামনে উপস্থিত হয়ে অপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।"

কোরানের উল্লেখ সিয়ারেও আছে। কিন্তু গ্রন্থকার সেখানে ইটের কথা বলেননি হয়ত ইচ্ছা করেই। কিন্তু ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সিয়ারের ইংরেজি অনুবাদক হাজী মোস্তফা নামধারক জনৈক ফরাসি পণ্ডিত বলেছেন "এই পবিত্র গ্রন্থ ছিল আসলে যথাযথরূপে কাটছাট করা সোনালি কাঁপড়ে মোড়া একখানা ইটমাত্র" (সিয়ার-বা ১ম খন্ড, ১২২পৃঃ)। সলিমুল্লাহ্ রচিত 'তারিখ-ই-বঙ্গালাহ্' গ্রন্থেও তো. বা., ১২৯-৩০পৃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনাই আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্যান্য ঘটনা [গিরিয়ার যুদ্ধ ও সরফরাজ খানের মৃত্যু]

এই প্রবঞ্চনাকারী ব্যক্তিদের প্রতারণামূলক সংবাদ সব সীমার বাইরে চলে গেল।[১] একজন সম্মানী লোকের নিজের পরিবারের ইজ্জত রক্ষা করা অত্যাবশ্যক বিধায় আলিবর্দী খান আজিমাবাদ শহরের ওয়ারিস খানের জলাশয়ের পাড় থেকে এই অতি সঙ্কটময় অভিযানে অগ্রসর হতে বাধ্য হন।[২] বিহার রাজ্যের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তিনি সেখানে অবস্থান রত ছিলেন। এই গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে সাত-আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এই শহরের পুবদিকে অবস্থিত জাফর খানের বাগান[৩] হয়ে তিনি বাঙলার দিকে অগ্রসর হন। কয়েক মঞ্জিল পার হয়ে তিনি সিক্রিগলির গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। সরফরাজ খানের পক্ষে [ফৌজদার] আতাউল্লাহ্ খান এই স্থান রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৪] কিন্তু আলীবর্দী খানের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তিনি তাঁর (আলিবর্দী) পক্ষভুক্ত হয়ে পড়েন। রাজমহল অতিক্রম করার পর তিনি (আলিবর্দী খান) নবাব সরফরাজ খানের নিকট যে পত্র লিখেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১। মূল ফা. পাঠ ঃ 'বাদ আজ আনকেহ্ মুরাসলাত মযূর-ই-আরবাব তযভির বহদ্দ-ই-এফরাত রাসিদ'(بعد از انکه مراسلات مرور ارباب تزویر بحد افراط رسید)-এর ভাবানুবাদ স্যার যদুনাথ (য. না.-৮৬ পৃঃ) করেছেন ঃ "When these deceptive letters reached the limit of excess" এই অনুবাদ সঠিক নয়। এ. এস. এর অনুবাদ (তা-১৩ পৃঃ) "When the false messages of the fraudulent persons reached the verge of excess." মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

২। এই বাক্য দ্বারা গ্রন্থকার স্পষ্টতই আলিবর্দীর সাফাই গেয়েছেন এবং তা পক্ষপাতদুষ্ট।

৩। জাফর খানের বাগান পাটনা নগরীর কিছু দূরে পূর্ব দিকে গঙ্গার ডান (দক্ষিণ) তীরে অবস্থিত। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬৪-৮১ খ্রিঃ) তা দেখানো আছে। নবাব আলিবর্দী খানের রাজত্বকালে এখানে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। পরে সেগুলির বর্ণনা আছে।

৪। হাজী আহমদের কন্যা রাবিয়া বেগমের স্বামী আতাউল্লাহ্ খানকে রাজমহলের ফৌজদারি পদ থেকে অপসারিত করতে গিয়েও নবাব সরফরাজ খান হাজী আহমদ এবং অন্যান্যে সুপারিশে তা করতে পারেন নি। আলিবর্দীর অভিযানের সময় আতাউল্লাহ্ তাঁর সাহায্যে আসবেন বলে হাজী আহমদ নবাবের নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি করে আতাউল্লাহকে কিছুদিনের জন্য সেখানে রাখার ব্যবস্থা করেন।

"হাজী আহমদের প্রতি অপমান ও অবমাননার সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং তা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, এখন তা প্রকাশ্যে মুখোমুখি হওয়ার অবস্থায় এসে পড়েছে। আপনার অনুগত ভৃত্য তার পরিবারের সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে এ স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং মহামহিম [প্রভুর] প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ছাড়া ভৃত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি আশা করি যে, প্রভুর আনুগত্য ও বদান্যতার ফলে হাজী আহমদকে আমার নিকট প্রেরণ করা হবে।"[৫]

নবাব সরফরাজ খান এ পর্যন্ত আলিবর্দী খানের এই অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলে ঘটনার কথা জেনে [বিস্ময়ে] হতবাক হয়ে গেলেন এবং হাজী আহমদকে আলিবর্দীর নিকট পাঠানোর ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে [আলিবর্দী খানের] প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি হাজী আহমদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের [আলিবর্দীর নিকট] যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এ সময়ে হাজী আহমদ মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে নবাব সরফরাজ খানের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন ঃ[৬]

"মোহাম্মদ আলিবর্দী খান মনে-প্রাণে [নবাবের প্রতি] অনুগত ও বিশ্বস্ত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহামহিম [প্রভুর] পক্ষে ঐ ভৃত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করা অনুচিত। প্রকৃতপক্ষে সেই ভৃত্যের পক্ষ থেকে শত্রুতার কোনো আশংকাই নেই এবং ঐ ভৃত্য মহামহিম প্রভুর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবে। যদি কোনো কারণে আমার এই অনুরোধ সত্ত্বেও আপনার সরকারের শত্রুদের প্ররোচনায় আপনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন তবে আশঙ্কা হচ্ছে যে, তাঁকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যা এ জগতে ও পরবর্তী জগতে কলঙ্ক বলে পরিচিত হবে।"

শুধু হাজী আহমদকে [আলিবর্দীর নিকট] প্রেরণই আলিবর্দীর বিরোধিতার নিশ্চিত জামিন হবে কিনা [এবং যদি না হয় তবে] সেক্ষেত্রে সরফরাজ খানের নিজ প্রাসাদে অবস্থান করা অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া [সঙ্গত হবে কিনা], এই নিয়ে [তাঁর অমাত্যদের মধ্যে] মতভেদ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত হাজী আহমদ ও তাঁর অনুগতদের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষভাবাপন্ন মরদান আলী খানের প্ররোচনায় ও উস্কানিতে[৭] ১১৫২

৫। মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য কত নীচ ও নির্লজ্জ হলে যে, এমন প্রতারণামূলক আচরণ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত এখানে দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনা ঘটেছিল ১১৫৩ হিজরী (মার্চ, ১৭৪০ খ্রিঃ) সনে, মোজাফফরনামায়ও প্রায় অনুরূপ বর্ণনাই আছে। (য. না. ২১ পৃঃ দ্রঃ), প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে তারিখ-ই-বঙ্গালাতেও।

৬। প্রতারণার আরও একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেখা যাচ্ছে তবে কুচক্রী হাজী আহমদের নিকট থেকে এ ধরনের আচরণ মোটেই অপ্রত্যাশিত নয় এবং আলিবর্দী খানও যে এই প্রতারণামূলক বার্তা প্রেরণের ব্যাপারে অংশীদার ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের গ্রন্থকার তাঁর পক্ষে যত সাফাই গাইতে চেষ্টা করুন না কেন, আলিবর্দীর সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট।

৭। মূল ফা. পাঠ ঃ 'ব-তরঘিব ওয়া তহ্‌রিয্' (بترغیب و تحریض) 'at the temptation and inclination of'।

হিজরী সনের ২২শে মহররম তারিখে বুধবার দিন[৮] নবাব সরফরাজ খান চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে [আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে] রাজপ্রাসাদ থেকে যুদ্ধে অগ্রসর হন। তিন কি চার মঞ্জিল[৯] অতিক্রম করার পর খোমরা[১০] খালের তীরে অবতরণ করে সেখানে তিন আস্তানা গাড়েন। এর আগে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্য বসন্ত খোজা ও হুগলীর ফৌজদার শুজা আলী খানকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আলিবর্দী খানের আস্তানায় প্রেরণ করেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি আলিবর্দীর দূত হাকিম আলীকে নিয়ে সেখানে আসেন। তাঁরা সরফরাজ খানের নিকট এসে এই নিবেদন করেন[১১] ঃ

"মহাবত জঙ বরাবরের মতো অনুগত ও আজ্ঞাবহ আছেন এবং তিনি নিবেদন করেছেন, 'কোনো মহান ব্যক্তি যখন কোন মানুষকে হীন বা অখ্যাত অবস্থা থেকে উন্নীত করে বৈশিষ্ট্য প্রদানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁর সভাসদ ও অমাত্যদের পর্যায়ভুক্ত করে সম্মান দান করেন তখন সাধারণত তার আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা বজায় রাখা ও তাঁর মান-সম্মান রক্ষা করাকেও তাঁর দায়িত্ব বলে মনে করেন। মানুষের মধ্যে এই নিকৃষ্টতম ব্যক্তি[১২] এই রাজপরিবার কর্তৃক প্রতিপালিত ও সম্মানিত এবং সেই কারণে মহামহিমদের অনুগ্রহের জন্য এই পরিবারের প্রতি অনুগত থাকা সঠিক বলে মনে করে। খেদমতের জগতে মহামহিমের প্রতি গভীর অনুরুক্তি ও বিশ্বস্ততা ব্যতীত প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রভুর এই অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ পর্যন্ত কোন অপরাধ করেনি। আমি মনে করি যে, আমি মহামহিমের আর সব ভৃত্য ও কর্মকর্তার প্রত্যেকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা করি যে, মহামহিম আমার দু'টি অনুরোধ রক্ষা করবেন। প্রথমত, আমি পরলোকগত নবাবের (শুজা খান) আদেশে এই রাজ্যের প্রশাসনিক সুব্যবস্থার জন্য একটি সেনাবাহিনী গঠন করেছিলাম। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এই রাজ্যের (বিহার) রাজস্ব থেকে এই সেনাবাহিনীর বেতন দেওয়া সম্ভব হয় নি। সে কারণে সৈনিকেরা তাদের বেতন পাওয়ার জন্য আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে যাতে তারা মহামহিমের নিকট

৮। স্যার যদুনাথের মতে (য.না. ৮৭ পৃঃ), "On wednesday, 22nd Muharram Year 1152 (should be 1153, Tuesday 8th April 1740)"। স্যার যদুনাথের বক্তব্যই সঠিক।

৯। 'মনযিল' (منزل) সসৈন্যে অভিযানে অগ্রসর হওয়ার কালে দিনান্তে কোনো সুবিধাজনক ভ্রমণ বিরতির স্থানকে মঞ্জিল বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য অর্থের মধ্যে এই শব্দ গন্তব্য স্থানকেও বোঝায়।

১০। খোমরা খাল মুর্শিদাবাদ নগরী থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ছিল।

১১। 'মোজাফফরনামা' মতে (য.না-২১ পৃঃ), এই দুই ব্যক্তির নাম শুজাতবেগ (Shujat Beg) ও খোজা বসন্ত (Basant, the eunuch)। কিন্তু সেখানে আলিবর্দীর দূত হাকিম আলীর উল্লেখ নেই। সরফরাজ খানের দূত দু'জন তাঁদের প্রভুর মতই বুদ্ধিমান ছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে। তা.বা-র মতে (১২৯ পৃঃ) এই দুই ব্যক্তির নাম শুজা কুলী খান ও খোয়াজা বসন্ত (شجاع قلی خان و خواجه بسنت)।

১২। মুল ফা. পাঠ ঃ 'কমতরীন' = নিকৃষ্টতম। আলিবর্দীর কপট বিনয়ের অভাব ছিল না। তবে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে তিনি যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

থেকে তাদের [ন্যায্য] বেতন পেতে পারে। আমি আশা করি যে, মোট সাত লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে যাতে তাদের দাবি মিটান যেতে পারে।[১৩] দ্বিতীয়ত মরদান আলী খান, মীর মর্তুজা, হাজী লুৎফে আলী খান ও মোহাম্মদ ঘউস খান প্রমুখ নেতা নিয়ে গঠিত যে দলটি হুজুরের মনে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং মহামহিমের দীন ভৃত্যের প্রতি তাঁর মনকে বিষিয়ে তুলে তাঁদেরকে দরবার থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে[১৪] যাতে মহামহিমের এই নিকৃষ্ট [ভৃত্যের] আবেদন অনুগ্রহপূর্বক গৃহীত হলে সে মহানুভবের সম্মুখে বীরোচিত ধৈর্য, বিশ্বস্ততা ও নিরাপত্তার সঙ্গে উপস্থিত হতে পারে।[১৫] কোনোও কারণে এই প্রস্তাব যদি হুজুরের মনঃপূত না হয় তবে তিনি যেন নিজেকে এদল থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁদেরকে এই ভৃত্যকে পরাজিত করার জন্য প্রেরণ করেন। যদি তাঁরা বিজয়ী হন তবে [তাঁদের] আশা পূর্ণ হবে কিন্তু তাঁরা যদি পরাজিত হন তবে এই গোলামের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সঙ্গে নিজেকে মহামহিমের সমীপে খেদমতের জন্য উপস্থিত করবে।"

যে পাক 'কালাম-ই-মজিদ' (কোরান শরীফ)-এর উপর এই শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল তা উপরে উল্লিখিত হাকিম-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল।[১৬] কিন্তু মরদান আলী খান প্রমুখের উপর নবাব সরফরাজ খানের পূর্ণ আস্থা ছিল এবং তাঁর (নবাব) উপর তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল বিধায় এবং হাজী আহমদ ও আলিবর্দীর সঙ্গে তাঁদের পূর্ব শত্রুতা থাকার কারণে তাঁরা এই বিবাদের মীমাংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন না। সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে প্রতারণামূলক বাক্য দ্বারা তাঁরা সরফরাজ খানের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেন[১৭] এবং যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দেশ্যে ঘউস খান ও

১৩। কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা কাকে বলে সেই দৃষ্টান্ত আলিবর্দী খুব ভালভাবেই দেখিয়েছেন। একজন জঘন্য অপরাধীর চেয়েও জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কাজ আলিবর্দী করেছেন।

১৪। নবাব শুজা-উদ-দৌলার সময়ের এসব আমির ছিলেন সরফরাজ খানের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং ষড়যন্ত্রকারী ও হীন প্রকৃতির হাজী আহমদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। রাজ্যলোভী এবং শঠতা ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণকারী আলিবর্দী খান তাঁদেরকে দরবার থেকে বহিষ্কৃত করতে চেয়েছিলেন যাতে বিনা বাধায় তিনি রাজ্য অধিকার করতে পারেন।

১৫। মূল ফারসি 'ব-রসুখ ওয়া ফিদুয়িত ওয়া তমানিয়ত বাসায়াদাতে মোলাযিমত বরেসাদ (برسوخ و فدویت و طمانیت بسعادت ملازمت برسد) 'তমানিয়ত' (طمانیت) শব্দ অভিধানে নেই। পরিবর্তে আছে 'তমানিনত' (طما نینت) শব্দ এবং এর অর্থ হচ্ছে 'rest, repose, tranquility quiet etc.' খুব সম্ভব প্রকৃত শব্দ 'তমা'নিনত'-ই ভুলক্রমে 'তমনিয়ত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬। গোলাম হোসেন সলীমের বর্ণনায় (রিয়াজ-বাঃ ২৪৫ পৃঃ) দেখা যায় যে, তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ".... আলিবর্দী একটি ক্ষুদ্র বাক্সে একটি ইষ্টক রেখে বলেন যে, এর মধ্যে কুরআন আছে এবং সেটি হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, পরদিন সকালে তিনি জোড় হস্তে নওয়াব সরফরাজ খানের সামনে উপস্থিত হয়ে অপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।"

এই ইটের কথা সিয়ারের ইংরেজি অনুবাদকারী টীকায়ও বলেছেন (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড ৪১২ পৃঃ) এবং তা-বা-তে (১২৯-৩০ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

১৭। মূল ফা. পাঠ ঃ 'ওয়া বহ মহয্-ই-নফসানিয়ত বহ্ আফাবিল বাতেলাহ্ মওসুস খোদাওয়ান্দ নিয়ামত খোশ শুদান্দ '(وبه محض نفسانیت به افاویل باطله موسوس خداوند نعمت خوش شدند)-এর অনুবাদ স্যার যদুনাথ (৮৮ পৃঃ) দিয়েছেন, "They with evil intentions fed suspicion of their master with false words." এই অনুবাদ সঠিক নয়। গ্রন্থকারের বর্ণনা যে এখানে পক্ষপাতদুষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যরা আলিবর্দীর সেনাপতিদের প্রলোভনমূলক পত্র প্রেরণ করেন এবং সেই সঙ্গে হুন্ডিও। এই সংবাদ অবগত হয়ে পরে আলিবর্দী খানের প্রধান সেনাপতি তাঁকে বলেন, "আমাদের সব সৈন্য অচিরেই শত্রু পক্ষের সঙ্গে যোগদান করবে। সেই সঙ্গে আমরা নিহত, না হয় বন্দী হব। অতএব বিপদ ঘটার পূর্বেই তার প্রতিকারের বিধান করতে হবে।"[১৮]

প্রতিকার ও শান্তির সব পথ চারদিক থেকেই অবরুদ্ধ দেখে আলিবর্দী বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দাবি পূরণ হওয়ার কোনো আশাই নেই। বিধিলিপি খণ্ডনের সাধ্য [মানুষের] নেই বলে অন্ধকার ভুবন থেকে এমন এক ঘটনা ঘটল যা মানুষ কোনোদিন চিন্তা করেনি।[১৯]

১৮। এই প্রসঙ্গে ইউসুফ আলীর সমুদয় বর্ণনা যে একদেশদর্শী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে সিয়ারের ইংরেজি অনুবাদের টীকাতে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৪১২ পৃঃ) আছে, "আমরা সঠিক রূপে জানি এবং ইহাই সার্বজনীন বিবরণ যে, তাঁহার বন্ধু জগৎশেঠের সাহায্যে আলিবর্দী খাঁ নিজেই সরফরাজ খাঁয়ের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই কৌশল প্রয়োগ করেন। তাঁহাদের একজন এখনও জীবিত আছেন। তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়তা দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি নিজেই ৪০০ টাকার এরূপ একটি টিপ প্রাপ্ত হন। বিনিময়ে তাঁহাকে শুধু মাটি ও আবর্জনা দ্বারা কামান ভর্তি করতে বলা হয়। মুর্শিদাবাদে সার্বজনীন জনরব এই যে, কয়েকটি কামান এরূপে পূর্ণ করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, গ্রন্থকার সরফরাজ খানের কামান সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই।"

এ সম্বন্ধে রিয়াজের বর্ণনায় (রিয়াজ-বা ঃ ২৪৪ পৃঃ) আছে, "শুজা খানের আমলের কর্মচারীদের সঙ্গে হাজী আহমদের যোগসাজশ থাকায় গোলার পরিবর্তে ইষ্টক ও কামানের মধ্যে আবর্জনা দেখতে পান।"

তা-বা-তেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে। অথচ আমাদের গ্রন্থকার নিশ্চিন্তে সরফরাজ খানের বিপক্ষে ও আলিবর্দীর পক্ষে বলে গেছেন।

১৯। ইউসুফ আলী খানের বর্ণনা যে ভয়ংকর রকমে পক্ষপাতদুষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে আক্রমণকারী ছিলেন আলিবর্দী খান, সরফরাজ খান নন। অথচ গ্রন্থকার কল্পিত অপরাধ সৃষ্টি করে সরফরাজ খানকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং সত্যের প্রতি তাঁর কোনো নিষ্ঠাই নেই বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। স্মর্তব্য, সরফরাজ খান ছিলেন গ্রন্থকারের শ্বশুর। তা সত্ত্বেও মিথ্যা বিবরণ দিতে গ্রন্থকারের একটুও বাধে নি।

সংক্ষেপে তা এই যে, ১১৫২ হিজরী সনের[২০] এক বুধবার প্রভাতে একটি কাল মত্ত হস্তী আরোহণ করে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে আলিবর্দী সুতী নদীর তীরে অবস্থিত একস্থান থেকে শত্রুশিবিরের দিকে অগ্রসর হন। এই সংবাদ নিশ্চিতভাবে জানা গেলে সরফরাজ খান সেদিন রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও [আল্লাহর] ইচ্ছার উপর নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর সেনাবাহিনীর শিবির থেকে নির্গত হতে না হতেই[২১] বন্দুকের একটি মারাত্মক গুলির আঘাত লাগলে তিনি আল্লাহর রহমতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২২] এই ক্ষমাপ্রাপ্ত ও পবিত্র জনের মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকজন সঙ্গী অনেক বীরত্ব প্রদর্শন করেন [এবং তাঁদের আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে] নিমক হালালি দেখানোর জন্য যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে আসেন। মীর দিলির আলী ছিলেন সেই দলের মধ্যে প্রধান। তাঁর সহজাত সাহসের কারণে তিনি পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তিনি তাতে যথেষ্ট কৃতকার্য হন। তাঁর ধনুক থেকে যে দু'টি তীর নিক্ষিপ্ত হয় তার একটি আলিবর্দীর বক্ষে আঘাত করে। কিন্তু দিলির খানের লক্ষ্য আল্লাহর ইচ্ছামতো ছিল না বলে সেই তীর [এর আঘাত] কার্যকরী হয়নি। অন্য তীরটি আলিবর্দী খানের ধনুকের হাতলে এমনভাবে আঘাত করে যে, তা হাতলের পিছন দিক ভেদ করে। অবশেষে আরও চার পাঁচ জনের সঙ্গে এই অসম সাহসী সৈয়দ তরবারির প্রাণঘাতী আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোহাম্মদ গউস খান, তাঁর দুই পুত্র ও কয়েকজন সৈনিকের সঙ্গে আলিবর্দী খানের হাতি যেখানে ছিল সেখানে উপস্থিত হন কিন্তু তীর, বন্দুকের গুলি ও তরবারির আঘাতে তাঁরা সবাই নিহত হন। মীর সিরাজ-উদ-দীন, হাজী লুৎফে আলী খান, মীর গদাই, মীর কামিল,[২৩] কোরবান আলী খান ও অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত সেনাপতিদের একদল তাঁদের কর্তব্য পালন করা ও পলায়নের লজ্জা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁদের প্রভুর মৃত্যুর পরে [যুদ্ধ করে] নিজেদের প্রিয় জীবন বিসর্জন দেন। যুদ্ধে মোহাম্মদ ইরাজ খান

২০। প্রকৃতপক্ষে ঘটনার তারিখ ১১৫৩ হিজরী সন=৯ই এপ্রিল ১৭৪০ খ্রিঃ।

২১। মূল ফা. পাঠ 'বর মরকব-ই-রেযা ওয়া তসলিম সওয়ারি ফরমুদাহ' (بر مرکب رضا و تسلیم سواری فرموده) অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (৮৮ পৃঃ) 'ordered his mount to be brought' এই অনুবাদ ভুল। শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে 'resigning to the will of God' এবং বাহন আনার জন্য আদেশ দেওয়া নয়। এখানে এ. এস.-এর পাঠ (তা-ই ঃ ১৫), 'mounted the carriage of resignation and submission' সঠিক।

২২। সরফরাজ খানের যুদ্ধের বর্ণনা গ্রন্থকার অর্ধেক বাক্যেই শেষ করেছেন। সিয়ারেও প্রায় অনুরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই আছে (সিয়ার বা ঃ ১ম খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ)। কিন্তু রিয়াজে (রিয়াজ বাঃ ২৪৭-৫০) নবাবের যুদ্ধের মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব প্রদর্শনের কথাও আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, নবাবের শিবিরের জনৈক বিশ্বাসঘাতকের বন্দুকের গুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হাতির হাওদার উপরে তিনি পড়ে যান এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তা. বা.-তেও (১৩১-৩৩ পৃঃ) সরফরাজ খানের বীরের মতো যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করার বর্ণনা আছে।

২৩। স্যার যদুনাথ (৮৮ পৃঃ) ভুল করে 'মীর কাবুলী' Mir Kabuli পাঠ দিয়েছেন। কিন্তু সব ফারসি পাণ্ডুলিপিতে মীর কামিল পাঠ আছে বলে ডক্টর আবদুস সোবহান বলেছেন (তা-ই, ১৭ পৃঃ)।

মাথায় আঘাত পান এবং আর একটি আঘাতে তাঁর হাত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। সেদিন [যুদ্ধে] তাঁর পুত্র নিহত হন। দীর্ঘকাল পরে তিনি এসব আঘাত থেকে আরোগ্য ও আরাম লাভ করেন।[২৪]

সৈয়দ হোসেন খান, শাহামত আলী খান, নসর উল্লাহ্ খান ও খালিসা [ভূমির] মুৎসুদ্দি রায়রায়ান[২৫] এবং অন্যান্যরা তীর ও গুলির আঘাতে জর্জরিত হন। তাঁরা সরফরাজ খানের মৃতদেহ মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁর দিওয়ান খানার একটি সুন্দর ইমারতে সেই দেহ সমাহিত করেন। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন।[২৬] নবাব সরফরাজ খানের রাজত্বকাল এক বছর ও দুই মাসের কিছু বেশি ছিল এবং তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর। চির স্থায়িত্ব শুধু সত্য মহাপ্রভুর জন্য।[২৭]

মহাবত জঙের মতো মানুষের কাছ থেকে এ ধরনের ঘটনা আশা করা যায় না।[২৮] তাঁর প্রশংসনীয় আত্মা সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, কোমলতা, ভদ্র ব্যবহার ইত্যাদি গুণাবলি

২৪। মূল ফা. পাঠ 'বা'দে মদ্দতে আয্ যহমত জেরাহত-ই-সহত ওয়া নাযাত ইয়াফ্ত' (بعد مدتی از زحمت جراحت صحت و نجات یافت)-এর ইংরেজি অনুবাদ স্যার যদুনাথ (৮৮ পৃঃ) দিয়েছেন "After a time he was cured of his wound and set free"। এখানে (نجات یافت) শব্দ দু'টির ভুল অর্থ দেওয়া হয়েছে। নাজাত শব্দের অর্থ মুক্তি, এখানে রোগ মুক্তি, 'set free' নয়।

২৫। রায়রায়ান আলম চাঁদ। হাজী আহমদ, রায়রায়ান আলম চাঁদ ও জগৎশেঠকে নিয়ে গঠিত যে উপদেষ্টা পরিষদের উপদেশে নবাব শুজা খান রাজ্য পরিচালনা করতেন সরফরাজ খানের বেলায়ও তার পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু রায়রায়ানসহ তাঁরা তিনজনই প্রভুর বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেন। রায়রায়ানের বিশ্বাসঘাতকতার বিশদ বর্ণনা রিয়াজে (বাঃ ২৪৪ পৃঃ) আছে।

২৬। সরফরাজ খানের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুর্শিদাবাদে আনা ও সেখানে সমাহিত করার বর্ণনা আলোচ্য গ্রন্থ, রিয়াজ ও তারিখ-ই-বঙ্গালা গ্রন্থে আছে। রিয়াজে বলা হয়েছে যে, "তাঁরা রাত্রি দ্বি-প্রহরে সরফরাজ খানের লাশ নকতাখালিতে দাফন করেন" (রিয়াজ-বাঃ ২৫২ পৃঃ)। তারিখ-ই-বঙ্গালার বর্ণনা (১৩৮-৩৯ পৃঃ) অধিক বিস্তারিত।

২৭। কোরানের বাণী ঃ (البقاء الملك المعبود الحق) 'Eternity is only for the Soueregn, the True Lord!'

২৮। কাজটা যে অন্যায় হয়েছে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থকার তা স্বীকার করেছেন দেখে মনে হয় যে, আলিবর্দীর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে অতি সামান্য হলেও কিছু বিবেকের তাড়না গ্রন্থকারের মধ্যে ছিল। আলিবর্দীর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার তুলনা নেই। ভদ্র ব্যবহার ও কোমলতাও তাঁর কিছু কিছু ছিল। কিন্তু লোভ, প্রবঞ্চনা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির কথা গ্রন্থকার ভুলেও কোথাও উল্লেখ করেননি। শাহজাদা আজমের মৃত্যুর পরে আলিবর্দীর সমগ্র পরিবার ছিল প্রায় পথের ভিখারীর মত দুর্দশাগ্রস্ত। নবাব শুজা খান তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের শুধু অপরিমিত অর্থ নয়, রাজসম্মানও দিয়েছিলেন। লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে সেই শুজা খানের সরলপ্রাণ পুত্রকে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নির্মমভাবে হত্যা করেন সুপরিকল্পিত উপায়ে। গ্রন্থকার দুর্বৃত্ত হাজী আহমদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আলিবর্দীকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করে গেছেন দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তিনি মোটেই নিরপেক্ষ ছিলেন না। হাজী আহমদের অপরাধের তুলনা নেই কিন্তু সেই সঙ্গে আলিবর্দীও কম অপরাধী ছিলেন না।

দ্বারা ভূষিত ছিল। প্রত্যেক কাজের পিছনেই [কোনো] প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য থাকে। এই ঘটনার পিছনেও ঐশ্বরিক বিধান ছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ তাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্ররোচনা ও প্রলোভন এই চরম দুর্ভাগ্যের কারণ ছিল। যেসব অনুগ্রহ ও দয়ার সঙ্গে পরলোকগত নবাবের [পরিবারের] জীবিত[২৯] সদস্যদের সঙ্গে তিনি (আলিবর্দী) ব্যবহার করেছিলেন তা আল্লাহ্র ইচ্ছায় পরে বর্ণিত হবে।

২৯। রিয়াজের বর্ণনায় দেখা যায় যে, নবাব সরফরাজের পুত্র হাফিজ উল্লাহ্ খান পিতার মৃতদেহ মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসেছিলেন (রিয়াজ-বাঃ ২৫২ পৃঃ)।

সলিম উল্লাহ্ রচিত 'তারিখ-ই-বঙ্গালাহ' গ্রন্থে (১৩৮-৩৯ পৃঃ) বলা হয়েছে যে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে সরফরাজ খান মুর্শিদাবাদ নগর রক্ষার দায়িত্ব ফৌজদার ইয়াসিন খান ও নবাবের পুত্র হাফিজ উল্লাহ্ খান ওরফে মীর্জা আমানীর নিকট দিয়ে যান। তাঁরা নবাবের মৃতদেহ রাত দুপুরে নকতাখালীতে দাফন করেন। হাফিজ উল্লাহ্ খান ও নবাবের জামাতা গজনফর হোসেন খান প্রতিরোধের চেষ্টা করেও সেনাপতিদের নিকট থেকে সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন। হাফিজ উল্লাহ্ খান সম্বন্ধে আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে এই গ্রন্থে (তারিখ) সরফরাজ খানের বংশধরদের ঢাকাতে (জাহাঙ্গীর নগরে) স্থানান্তরিত করা হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। খুব সম্ভব হাফিজ উল্লাহ্ খান সেখানেই অখ্যাত জীবন যাপন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাঙলায় আলিবর্দী খানের শাসনক্ষমতা লাভ

ভাগ্যনিয়ন্ত্রক (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা)[১] বাঙলার শাসনকর্তৃত্ব আলিবর্দী খানের[২] জন্য সুনির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন বলে তা প্রকৃতপক্ষে কেমন করে তাঁর কাছে এসেছিল তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ঐ রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করে ১১৫২ হিজরী সনের সফর মাসের মাঝামাঝি সময়ে[৩] তিনি বিজয়ীবেশে[৪] মুর্শিদাবাদ নগরীতে উপস্থিত হন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি [মরহুম] নবাব শুজা উদ-দৌলার কন্যা[৫] নফিসা বেগমের হেরেমের দ্বারে উপস্থিত হন এবং নিম্নলিখিত বাক্যাবলির মাধ্যমে তাঁর কাছে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি বলেন, "ভাগ্যলিপিতে যা লিখিত ছিল তা ঘটে গেছে। সময়ের পৃষ্ঠায় এই হতভাগার নামের সঙ্গে এই কলঙ্কের কথা চিরকালের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে গেল কিন্তু এখন থেকে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে হুজুরের নিকৃষ্টতম ভৃত্যের প্রতি[ও] বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকা ছাড়া আমি আর অন্য কোনো কাজ করব না। আমি আশা করি যে, এই বৃদ্ধ ভৃত্যের খেদমত করার এই আবেদন হুজুরের রাজকীয় অনুমতি লাভ করবে।[৬]

১। ফা. পাঠ ঃ 'কারকুনান-ই-তক্দীর' (کار کنان تقدیر) 'Arbiter of Destiny'.

২। ফা. পাঠ. 'আন মোহর-ই-সেপহার' ইয়্য্ ওয়া আ'লা' (آن مهر سپهر عز و علا) =(literally) 'that sun of the firmament of grandeur and glory' (A.S.)।

৩। সঠিক তারিখ ৩০শে এপ্রিল, ১৭৪০ খ্রিঃ (১১৫৩ হিজরী সন)। শাসনভার গ্রহণ করার ব্যাপারে রিয়াজের বর্ণনায় (রিয়াজ-বাঃ ২৫৪ পৃঃ) দেখা যায় "যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর আলিবর্দী খান মহবত জং-এর আফগান ও ভালিয়া সৈন্যরা তিনদিন যাবত মুর্শিদাবাদ নগরী ও সরফরাজ খানের সম্পদ লুটপাট করে।" এ সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থকার নীরব, নীরব সিয়ার ও মোজাফফর নামার রচয়িতাগণও। তবে 'তারিখ-ই-বঙ্গালায়' (১৩৯ পৃঃ) এর ইঙ্গিত আছে।

৪। ফা. পাঠ ঃ 'ফতেহ্ ওয়া যাফর' (فتح و ظفر)।

৫। নাফিসা বেগম (نفیسه بیگم) এর পরিচয় নিয়ে সিয়ার গ্রন্থে বিভ্রান্তিকর বর্ণনা আছে। সেখানে (সিয়ার-বাঃ ৪০২ ও ৪২১ পৃঃ) তাঁকে নবাব জাফর খাঁর কন্যা ও সরফরাজ খানের মাতা হিসাবে দেখান হয়েছে। আবার একই গ্রন্থের ৪২৯ পৃষ্ঠায় তাঁকে সরফরাজ খানের পত্নী হিসাবেও দেখান হয়েছে। সেখানে আছেঃ "সরফরাজ খাঁর নাফিসা বেগম ছাড়া তৎসম মর্যাদা সম্পন্না কোনো বিবাহিতা পত্নী ছিল না, ছিল শুধু উপপত্নী।" এ ব্যাপারে ইউসুফ আলীর বর্ণনাই সঠিক। কারণ তিনি ছিলেন সরফরাজ খানের জামাতা। নাফিসা বেগমের স্বামী ছিলেন সৈয়দ রাজী খান। তাঁদের পুত্র সৈয়দ মুরাদ আলী ছিলেন ঢাকার নায়েব নাজিম। তিনি আবার তাঁর আপন মামা নবাব সরফরাজ খানের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন (রিয়াজ-বাঃ ২৩৭ পৃঃ)। রিয়াজেও নাফিসা বেগমকে সরফরাজ খানের বোন হিসাবে দেখান হয়েছে। 'তারিখ-ই-বঙ্গালা' (১৪০ পৃঃ) মতেও তিনি সরফরাজ খানের ভগিনী (نفیسه خانم خواهر سرفراز خان) (নাফিসা খানম খাওয়াহির-ই-সরফরাজ খান)।

৬। শুধু বিশ্বাসঘাতকতা নয়, কপটতা প্রকাশের ক্ষেত্রেও আলিবর্দীকে অতুলনীয় দেখা যাচ্ছে। এই প্রতিজ্ঞার সামান্য কিছু দিন পরেই সরফরাজ খাঁনের ভগিনীপতি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে তিনি সবংশে উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত করেন এবং তাঁদের অবস্থা হয় পথের ভিখারীর মতো।

এরপরে তিনি রাজধানী শহরের দিকে অগ্রসর হন এবং প্রায় ষাট বছর বয়সে[৭] বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে নাফিসা বেগমের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়াও সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে এক লক্ষ টাকা কি তারও অধিক [বার্ষিক] আয়ের নিষ্কর ভূমি দান করা হয়। [এছাড়াও] পরলোকগত নবাবের প্রত্যেক পুত্র-কন্যার জীবন ধারণের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়। মরহুম নবাবের এক শিশু পুত্রসহ তাঁর সন্তান-সন্ততিদের প্রকাশ্য মর্যাদা রক্ষা করার জন্য তিনি সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পরলোকগত নবাবের যে সম্পদ তাঁর হস্তগত হয় তা ছিল নগদ আটত্রিশ লক্ষ টাকা এবং অন্যমতে তা ছিল সত্তর লক্ষ টাকা। সেই সম্পদ ছিল মণি-মাণিক্য, গহণা, স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্র, কারুকার্য খচিত পাত্রাদি, অতিশয় মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং এসবের মূল্য ছিল প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। তিনি হাজী লুৎফে আলী খান, মিনুচিহির খান এবং মর্তুজা খানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশও দেন। নবাবের গৃহস্থালির দ্রব্যাদি হস্তগত করার ব্যাপারে আলিবর্দী খানের স্ত্রী ও কন্যার[৮] ব্যবহারে অতিশয় রূঢ়তা ও অশেষ ধৃষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। কৃতজ্ঞতা ও মানবতার নিয়ম ভঙ্গ করে হাজী আহমদ সরফরাজ খানের কয়েকজন উপপত্নীকে হস্তগত করেন[৯] যদিও আলিবর্দীর কাছে এ

৭। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে আলিবর্দীর বয়স ষাট বছর হলে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে। মৃত্যুকালে (১৭৫৬ খ্রিঃ) তার বয়স ৮২ বছর হয়েছিল বলে এ গ্রন্থেই বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে সেই হিসাব মিলান যাচ্ছে না। ১৭৪০ সনে তাঁর বয়স ৬০ হলে মৃত্যুকালে (১৭৫৬ খ্রিঃ) তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর আর ৮২ বছরে যদি তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকে তবে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে।

৮। আলিবর্দীর তিন কন্যার মধ্যে এখানে একবচনে কন্যার কথাই বলা হয়েছে কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। মূল ফা. পাঠ, 'তমাম শিদ্দত ওয়া নেহায়েত মরতুবা-ই-ঘলাযত' (تمام شدت و نهایت مرتبه غلظت) এর সঙ্গে স্যার যদুনাথের অনুবাদ (য. না.-৯০ পৃঃ) "But the greatest rigour and oppression was practised by his daughters on the wife and daughters of Sarfaraz in siezing the property inside the harem of the late Nawab." সঙ্গতিহীন।

৯। গ্রন্থকার তাঁর আপন শ্বশুর সরফরাজ খানের ধার্মিকতার অনেক প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর উপপত্নীদের সম্পর্কে এর আগে কোনো কথা বলেননি। তবে তাঁর উপপত্নীর সংখ্যা যে অনেক ছিল আলোচ্য উক্তিই তা প্রমাণ করে। এই সম্পর্কে রিয়াজে (রিয়াজ-বা, ২৫৪ পৃঃ) বর্ণিত আছে, "যেহেতু মহবত জং-এর পরনারীর প্রতি আসক্তি ছিলনা এবং এই প্রকার ভোগের লিপ্সা তাঁর ছিল না সেহেতু হাজী আহমদ ও তাঁর পুত্রগণ এবং আত্মীয় স্বজনেরা সরফরাজ খানের পনেরশ সুন্দরী পোষ্য ও দাসীদের মধ্যে নিজেদের ভাগবাটোয়ারা করে নেয়।' তা.বা.তেও অনুরূপ উক্তি আছে।

ধরনের ব্যাপার ছিল ঘৃণ্য। হাজী আহমদ এদের নিয়ে কয়েক বছর মত্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত[১০] 'যে নিজের ভাইয়ের জন্য গর্ত খনন করে সেই গর্তে সে নিজেই পতিত হবে[১১] এই বাক্য অনুসারে তিনি দুঃখে পতিত হন। কারণ, সুকৃতির জন্য প্রতিদান ও দুষ্কৃতির শাস্তিভোগের ব্যবস্থা— আদি ও অনন্ত সর্বশক্তিমানের বিধান। সীমাহীন পাপ ও দুষ্কর্মের বোঝা কাঁধে নিয়ে তিনি পরলোকে গমন করেন।

সংক্ষেপে, শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পর আলিবর্দী খান, এক বর্ণনামতে, নগদ চার লক্ষ টাকা তাঁর সৈন্যদের মধ্যে পুরস্কারস্বরূপ বিতরণ করেন এবং [অধিকন্তু] প্রত্যেকের অর্ধেক বেতন বৃদ্ধি করে তাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করেন। বাঙলার খালিসা ভূমির দিওয়ান ও সেই সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগরের শাসনকর্তার পদে তিনি তাঁর জামাতা নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানকে[১২] নিযুক্ত করেন। [গিরিয়ার] যুদ্ধে [বন্দুকের] গুলিতে আহত রায়রায়ান আলম চাঁদ[১৩] কিছুদিন পরে মারা গেলে চিনরায়কে রায়রায়ান উপাধি দিয়ে খালিসা ভূমির সহকারী দিওয়ানের পদে নিযুক্ত করা হয়। আলিবর্দী খানের বেগমের ভাই কাসেম আলী খানকে[১৪] পদচ্যুত করে মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানকে পুরাতন সেনাবাহিনীর বখশী ও নবাব পরিবারের বিশ্বস্ত [লোক] নসর উল্লাহ্ বেগ খানকে নতুন সেনাবাহিনীর বখশী পদে নিয়োগ করা হয়। নওয়ারা[১৫] অর্থাৎ রাজকীয় নৌবাহিনী ও নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর দায়িত্ব-এবং তা [সাধারণত] জাহাঙ্গীরনগরের কর্মকর্তাদের

১০। মূল ফা- পাঠ, 'লাম ইয়াঝল ওয়ালা ইয়াঝালুহুম ওয়ারাহ্ জরিয়ান দারাদ'
(الم یزل ولا یزال هم واره جریان دارد)

১১। আরবি বচন ঃ 'মান্ হাফারা বিইরান লিআখিহে ফাকাদ ওয়াকাআ' ফিহি'
(مَنْ حَفَرَ بِئْراً لأخيه فَقَد وَقَعَ فيه)= 'He who digs a pit for his brother will himself fall into it' স্যার যদুনাথের অনুবাদ (৯০ পৃঃ), 'He who digs a pit in his brother's ground verily falls into it'. ত্রুটিপূর্ণ এবং মূল পাঠের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন।

১২। হাজী আহমদের জ্যেষ্ঠপুত্র এই নওয়াজিশ মোহাম্মদের সঙ্গে আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বিবির বিবাহ হয়েছিল।

১৩। এই সম্বন্ধে রিয়াজে (রিয়াজ-বা, ২৫২ পৃঃ) বর্ণিত আছে, "রায়রায়ান আলমচাঁদ তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ (প্রতিফল?) স্বরূপ কপালে তীরের আঘাত পেয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অর্ধমৃত অবস্থায় বাড়িতে পৌছেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি হীরকচূর্ণ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।'

১৪। গ্রন্থকার এই ঘটনার কারণ বর্ণনা করেন নি। এই সম্বন্ধে মোজাফফরনামায় (ম. না-২৬ পৃঃ) আছে ঃ "Alivardi Khan returned victorious to Bengal. Qasim Ali Khan the son of Mirza Mirak, the brother's son of the Nawab Begam Sahiba, was removed from the Bakhshi-ship and appointed faujdar of Rangpur. Mir Muhammad Jafar Khan, who was till now, an officer on Rs, 100 a month was rewarded for his brave deeds by being exalted to the high office of first Bakhshi."

১৫। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) বাঙলায় 'নওয়ারা' (নৌবাহিনী) সৃষ্টি হয় এবং সুবাদার ইসলাম খানের সময়ে (১৬০৮-১২ খ্রিঃ) তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। তবে এর বিশেষ উন্নতি হয় সুবাদার শায়েস্তা খানের আমলে।

দায়িত্ব-নবাবের দৌহিত্র মীর্জা মোহাম্মদ [সিরাজ-উদ-দৌলার] উপর ন্যস্ত করা হয়। নবাবের নিজস্ব গোলন্দাজ বাহিনীর [কর্মকর্তার] পদে হায়দর আলী খান উপাধিধারী মীর্জা নজর আলীকে নিযুক্ত করা হয়।[১৬] তিনি ছিলেন হোসেন কুলী খানের চাচার পুত্র। হোসেন কুলি খানকে[১৭] জাহাঙ্গীর নগরের সহকারী শাসনকর্তার পদসহ নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের দায়িত্বসমূহের আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনা করার কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে যুগের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে [অতি] সম্মানজনক স্থান প্রদান করা হয়। প্রাসাদ সরকারের পদ থেকে মীর মর্তুজাকে বদলি করে আলিবর্দী খানের অন্তরঙ্গ [লোক] গোলাম হোসেন খানকে সেই পদে নিযুক্ত করা হয়।

ইতোমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে, [দিল্লীতে] ইসহাক খান মো'তামান-উদ-দৌলা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এবং এই ঘটনায় আলিবর্দী খান খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ, সম্রাটের দরবারে আলিবর্দী খানের সর্ব ব্যাপারে তিনি শুধু সমর্থনকারী ও উকিলই নন, বরং এ ব্যাপারে (সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা) তাঁর প্ররোচনাকারীও ছিলেন। অবশেষে সম্রাটের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান সা'দ-উদ্-দীন আহমদ খানের মাধ্যমে আলিবর্দী খান [সম্রাটের নিকট] এই মর্মে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন যে, বাঙলার শাসন ক্ষমতা যদি তাঁকে সরকারিভাবে প্রদান করা হয় তবে পরলোকগত নবাব আলা-উদ-দৌলার সব সম্পদ সম্রাটের খেদমতে প্রেরণ করা হবে। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্ এ প্রস্তাব গ্রহণ করা সুবিধাজনক মনে করে পরলোকগত নবাবের সম্পদ অধিকার ও সংগ্রহ করার জন্য মোরিদ খানকে প্রেরণ করেন।[১৮] মোরিদ খান আজিমাবাদে এসে পৌছেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদে তাঁর আগমন আলিবর্দী খানের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি তাঁকে (মোরিদ খান) সিক্রিগলিতে অপেক্ষা করতে এবং তিনি (আলিবর্দী খান) সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে সম্পদ হস্তান্তর করবেন বলে পত্র মারফত জানালেন।

১৬। এই হায়দর আলী খান ছিলেন একজন বীর সৈনিক। তিনি পরে সিরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক নির্মমভাবে এবং বিনা কারণে অন্ধ অবস্থায় নিহত হন।

১৭। হোসেন কুলী খান ছিলেন ঘসেটি বিবি ও আমেনা বেগমের অতি প্রিয় পাত্র। পরে সিরাজ তাঁকে নিহত করেন।

১৮। এ সম্বন্ধে রিয়াজে বর্ণিত আছে (রিয়াজ-বাঃ ২৫৫ পৃঃ) ঃ "যখন সরফরাজ খানের পতন ও বাংলার মসনদে আলিবর্দী খানের আরোহণের সংবাদ বাদশাহ্ নাসির-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহ্র নিকট পৌছায় তখন তিনি অশ্রু বিসর্জন করে বলেছিলেন, নাদির শাহের জন্য আমার সমস্ত সাম্রাজ্য ওলটপালট ও ধ্বংস হয়ে গেলো। কিন্তু প্রতিকার কঠিন বিধায় বাদশাহ্ চুপ করে রইলেন। প্রধানমন্ত্রী নওয়াব কমর-উদ-দীন খানের অন্যতম সহযোগী মুরাদ খানের মাধ্যমে মহবত জং প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। সরফরাজ খানের বাজেয়াফ্তকৃত সম্পদ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা এবং নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়াও কর হিসেবে আরো চৌদ্দ লক্ষ টাকা মহবত জং বাদশাহ্র নিকট প্রেরণ করেন, এতদ্ব্যতীত, কমর-উদ-দীন খান উজীরকে পাঠান তিন লক্ষ টাকা এবং আসফজা নিজাম-উল-মুল্ককে পাঠান এক লক্ষ টাকা। এই রূপে তিনি অন্যান্য বাদশাহী কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে বশীভূত করেন। সরফরাজ খানের প্রতিনিধি রাজা যুগল কিশোরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মহবত জং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার নিজামতের সনদ পান।" 'তারিখ-ই-বঙ্গালাই' গ্রন্থে (১৪০ পৃঃ) প্রায় হুবহু বর্ণনাই আছে।

এ সম্বন্ধে সিয়ারের বর্ণনা (সিয়ার-বাঃ ৪১৮ পৃঃ দ্রঃ)। সেখানে মোটামুটি বিশদ বর্ণনা আছে। তবে এসব বর্ণনার মধ্যে তথ্যগত পার্থক্য লক্ষণীয়।

সেই বছরই (১১৫৩ হি=১৭৪০ খ্রিঃ) রজব মাসে আলিবর্দী খান আকবর নগর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে দিন কয়েক অপেক্ষা করে মোরিদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান এবং তাঁর নিকট নগদ সাত লক্ষ টাকাও প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা মূল্যের মূল্যবান দ্রব্যাদি হস্তান্তর করেন। এসব মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে ছিল বিভিন্ন মণি-মাণিজ্য-জহরতাদি, অলঙ্কারাদি, মূল্যবান পোশাক, স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্রাদি, হস্তী, অশ্ব ও অন্যান্য দ্রব্যাদি। মোরিদ খানের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সেই বছরই শা'বান মাসের শেষদিকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ে সম্রাটের নিকট থেকে তাঁর জন্য বাংলার সুবাদারির সনদ ও সেই সঙ্গে 'হোসাম-উদ-দৌলা'[১৯] উপাধিও তাঁর কাছে এসে পৌঁছে। সেই সঙ্গে নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের জন্য বাঙলার দিওয়ানি পদের সনদসহ 'শাহামত জঙ',[২০] সাঈদ আহমদ খানের জন্য আসে 'সওলত জঙ'[২১] এবং জয়ন-উদ্-দীন খানের জন্য আসে 'হয়বত জঙ'[২২] উপাধিসমূহ। জয়ন-উদ্-দীন খানের জন্য আজিমাবাদের নায়েব-সুবাদারের সনদ এবং আতাউল্লা খানের জন্য 'সাবিত জঙ'[২৩] উপাধিও আসে।

১৯। 'হোসাম-উদ-দৌলা' (حسام الدولہ) = রাজ্যের তরবারি।

২০। 'শাহামত জঙ' (شہامت جنگ) = সংগ্রামে সাহসী।

২১। 'সওলত জঙ' (صولت جنگ) = সংগ্রামে দুর্দান্ত।

২২। 'হয়বত জঙ' (ہیبت جنگ) = সংগ্রামে সিংহ।

২৩। সাবিত জঙ (ثابت جنگ) = সংগ্রাম অদম্য।

সপ্তম অধ্যায়

অন্যান্য ঘটনা [উড়িষ্যায় আলিবর্দীর সঙ্গে রুস্তম জঙের বিরোধিতা ও তাঁর পরাজয়]

নবাব সরফরাজ খানের মৃত্যুর পর শুজা-উদ্-দৌলা খানের জামাতা ও কটকের [নায়েব] সুবাদার (দ্বিতীয়) মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ[১] আলিবর্দী খানের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে একটা শান্তিমূলক মীমাংসার জন্য[২] আকা মোহাম্মদ সুরাটীকে আলিবর্দীর নিকট প্রেরণ করেন। এই পরিবারের অধিকার রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি আলিবর্দী দিয়েছিলেন, সেই অতীত অধিকারের কথা স্মরণ করে এবং তাঁর নিজের সহজাত সহৃদয় অন্তকরণের কারণে আলিবর্দী খান এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং মুর্শিদকুলী খানের দূতকে সন্তুষ্ট করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। কিন্তু [দ্বিতীয়] মুর্শিদকুলী খানের জামাতা মীর্জা বাকের খান ইস্পাহানি[৩] এই মীমাংসার প্রস্তাবে সম্মত হন নি। কারণ, বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভের

১। তাঁর প্রকৃত নাম লুৎফ উল্লাহ্। তিনি ছিলেন সুরাট নগরের এক বণিকের পুত্র। তিনি একজন জ্ঞানী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এবং 'সারসার' ছদ্মনাম ধারণকারী প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তিনি নবাব শুজা-উদ-দৌলার কন্যা দুর্দানা বেগমকে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৪১৬ পৃঃ দ্রঃ এই দুর্দানা বেগম ছিলেন নবাব সরফরাজ খানের বৈমাত্রেয় ভগিনী) বিবাহ করেন। নবাব শুজা খানের রাজত্বকালে তিনি ছিলেন ঢাকার নায়েব নাজিম এবং তখন তাঁকে [দ্বিতীয়] মুর্শিদকুলী খান রুস্তম জঙ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁরই সময়ে ১৭২৯ মতান্তরে ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে আগা সাদেক ও মীর হাবিবের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য চূড়ান্তভাবে বিজিত হয়ে রওশনাবাদ নামধারণ করে। শুজা খানের রাজত্ব কালে (১৭৩৪ খ্রিঃ) তাঁর অপর পুত্র ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম তকী খানের মৃত্যু হলে রুস্তম জঙকে সেই পদে নিযুক্ত করা হয়। আলিবর্দী লোভের বশবর্তী হয়ে নাফিসা বেগমকে দেওয়া তাঁর প্রতিজ্ঞা বেমালুম ভুলে গিয়ে তাঁকে রাজ্যহারা করেন সত্য কিন্তু উড়িষ্যা রাজ্য তিনি কোনোদিন ভোগ করতে পারেন নি এবং তা শেষ পর্যন্ত মারাঠাদের হাতেই চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে অন্যায়ভাবে উড়িষ্যা অধিকারের পর থেকেই আলিবর্দীর দুর্ভাগ্যের সূচনা হয় এবং তা শেষ হয় সিরাজের পতনে।

২। রিয়াজের মতে (রিয়াজ-বা, ২৫৬ পৃঃ) এই মধ্যস্থতাকারী ছিলেন হাজী আহমদের জামাতা মুখলিস আলী খান যিনি আগে থেকেই আলিবর্দীর পক্ষাবলম্বন করে গোপনে ষড়যন্ত্র করে সেনাবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সিয়ারের মতে (সিয়ার-বা, ১ম খন্ড ৪১৯ পৃঃ) সুরাটের আগা মোহাম্মদ তকী খান ছিলেন মধ্যস্থতাকারী। তা. বা. মতে (১৪২ পৃঃ) মুখলিস আলীই ছিলেন মধ্যস্থতাকারী।

৩। মীর্জা বাকের ইসপাহানি (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৪১৯ পৃঃ) ইরানের সাফাভি রাজবংশের অধস্তন পুরুষ। তিনি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে আগা বাকের নামের আরও দুইজন আমির বাঙলায় ছিলেন। তাঁদের পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হবে।

ইচ্ছা তাঁর মনকে বারবার নাড়া দিচ্ছিল যদিও আলিবর্দীর নিকট এই দাবি উত্থাপনের কোনো ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। অতএব প্রতিশোধ নেওয়ার অজুহাতে তিনি বিদ্রোহ ও বিরোধিতার পথ বেছে নেন।[৪] আলিবর্দী খান এই সংবাদ অবগত হয়ে [দ্বিতীয়] মুর্শিদকুলী খানের নিকট যে সংবাদ প্রেরণ করেন তার সারমর্ম এই ঃ "আপনার কোনো প্রকার ক্ষতি বা অনিষ্ট করার কোনো ইচ্ছা বা অভিপ্রায় আমার নেই। কিন্তু এত নিকটবর্তী স্থানে আপনার অবস্থান কোনো পক্ষেরই নিরাপত্তার কারণ হতে পারে না বিধায় আশা করা যাচ্ছে যে, আপনার পরিবারবর্গ, সম্পদ ও মালামাল নিয়ে আপনি মুর্শিদাবাদ হয়ে হিন্দুস্তানে অথবা একইভাবে[৫] দাক্ষিণাত্যে চলে যাবেন।"[৬]

নবাব আলিবর্দী খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি ও সামর্থ্য তাঁর নেই জেনে মুর্শিদকুলী খান বিদ্রোহ ও সংগ্রামের পথ পরিহার করে শত্রুতার পরিবর্তে শান্তির পথকে অগ্রাধিকার দেন। কিন্তু তাঁর জামাতা মীর্জা বাকের খান ইস্পাহানির মন থেকে বাঙলার শাসনকর্তা হওয়ার ইচ্ছা দূর হয়ে যায় নি বলে তিনি তাঁর শ্বশুরকে শান্তি স্থাপনের বিরুদ্ধে এমনভাবে প্ররোচিত করেন যে, মুর্শিদকুলী খান নবাব আলিবর্দীর নিকট বিরোধিতাপূর্ণ পত্র লিখে শান্তির পথ[৭] রুদ্ধ করে দেন। নবাব এই সংবাদ অবগত হয়ে হাজী আহমদ ও শাহামত জঙকে মুর্শিদাবাদে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রেখে সেই বছরের (১৩৫৩ হিঃ) শওয়াল মাসের প্রথমদিকে দশ-বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মুর্শিদকুলী খানের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ থেকে কটক অভিমুখে যাত্রা করেন।

৪। এই পরিচ্ছেদের গোড়া থেকেই ইউসুফ আলী একের পর এক মিথ্যা কথাই বলে এসেছেন। তাঁর আলোচ্য উক্তি শুধু মিথ্যা ভাষণ নয়, হাস্যকরও বটে। মুর্শিদকুলী খানরা নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। আর গ্রন্থকার নির্লজ্জের মতো বলছেন যে, তাঁরা বাঙলা অধিকারের কথা চিন্তা করেছেন।

৫। মূল ফা. পাঠে 'হামিন তরিক' (همین طریق) শব্দ আছে। তরিক শব্দের এক অর্থ পথ হলেও 'mode', 'manner' ইত্যাদি অর্থও আছে। এখানে 'একই পথে' না হয়ে 'একইভাবে' হবে। কারণ কটক থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

৬। আলিবর্দীর এ পত্রে শান্তির কোনো কথা নেই, আছে একতরফা ভীতি প্রদর্শন। সরফরাজ খানের পরিবারের সব সদস্যের দাবি ক্রীতদাসের মতো মেনে নিবেন বলে আলিবর্দী যে শপথ বাক্য নাফিসা বেগমের নিকট উচ্চারণ করেছিলেন তা যে ভাওতা ও ভণ্ডামি ছিল এই পত্রই তা প্রমাণ করে। আলিবর্দীর অন্ধভক্ত ইউসুফ আলী, করম আলী, গোলাম হোসেন খান সবাই এ ব্যাপারে মিথ্যা কথাই বলে গেছেন বলে দেখা যায়।

৭। এখানে 'শান্তির পথ' বেছে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে আলিবর্দীর নির্দেশমত মুর্শিদকুলী খানের নিজ রাজ্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। তাঁদের পক্ষে আলিবর্দীর এই শান্তির প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে মেনে না নেওয়া, গ্রন্থকারের মতে, অমার্জনীয় অপরাধ। বর্ণনা দেখে মনে হয় এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সরফরাজ খানের বংশধরকে উড়িষ্যা থেকে উৎখাত করতে আসা আলিবর্দীর পক্ষে কোনো অন্যায় কাজ নয়। অন্যায় কাজ হচ্ছে মুর্শিদকুলী খানদের পক্ষে স্বেচ্ছায় নিজ রাজ্য ছেড়ে না যাওয়া।

উপরে উল্লিখিত খান (মুর্শিদকুলী খান) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং প্রতিরোধের জন্য কটক থেকে নির্গত হয়ে বালেশ্বর বন্দর অতিক্রম করে বালেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত ফুলওয়ার নামক স্থানে উপস্থিত হন। অরণ্য ও নদীনালা[৮] দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শত্রুর আক্রমণের জন্য কঠিন এই স্থানের কেন্দ্রস্থলে প্রায় তিনশ ছোট-বড় কামান সৈন্য শিবিরের চারদিকে স্থাপন করে তিনি নিশ্চিন্ত হন। নবাব আলিবর্দী খান মঞ্জিলের পর মঞ্জিল পার হয়ে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর অতিক্রম করে শত্রু শিবির থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। নবাবের এই শিবির ছিল শত্রু রাজ্যে। এই অঞ্চলের জমিদারগণ নবাবের সেনাবাহিনীর রসদ ইত্যাদি সরবরাহ করতে শুধু অপারগতাই প্রকাশ করেন নি, সেই সঙ্গে নারায়ণগড় জেলা ও অন্যান্য নিকটবর্তী স্থান থেকে যেসব রসদ নবাবের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল পথে সেগুলিও নষ্ট করে দেন। ফলে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তা অশ্বারোহী সৈন্যদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৯]

মীর্জা বাকের এই তথ্য অবগত হন। মুর্শিদকুলী খান তাঁকে সুরক্ষিত ও প্রহরীবেষ্টিত স্থান ত্যাগ করে যুদ্ধে অগ্রসর হতে নিষেধ করলেও তাতে কর্ণপাত না করে মীর্জা বাকের একই বছরের (১১৫৩ হিজরী=ফেব্রুয়ারি, ১৭৪১ খ্রিঃ) জিলকদ মাসের শেষদিকে সেই স্থান পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন। শত্রু সৈন্যের অগ্রসর হওয়ার কথা শুনে নবাব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে তাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে যান। দুই বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হলে প্রথম আক্রমণেই নবাবের বাহিনী শত্রু পক্ষের যেখানে কামান-বন্দুক ইত্যাদি রক্ষিত ছিল সেই স্থানটি অধিকার করে নেয়। কারণ, এই ব্যাপারে শত্রু পক্ষ অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। তখন উভয়পক্ষের মধ্যে আরম্ভ হয় হাওয়াইবাজি ও বন্দুকযুদ্ধ। দুই পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। তাঁর সঙ্গীদের অনেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও মুর্শিদকুলী খান পূর্ণ অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যুদ্ধ এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলেন যে, তাতে নবাব আলিবর্দীর সেনাবাহিনীর একাংশ

৮। মূল ফা. পাঠের 'নালাহ্' (نله) শব্দের আভিধানিক অর্থঃ 'a small river, canal' etc. এখানে সাধারণভাবে নদীনালা অর্থে ব্যবহৃত।

৯। উড়িষ্যার বালেশ্বরে সংঘটিত এই যুদ্ধের বিবরণ এখানে মোটামুটি বিস্তারিত। এর চেয়েও বিস্তারিত বর্ণনা আছে সিয়ারে (সিয়ার-বা, ১ম খন্ড, ৪২১-২৫ পৃঃ)। কিন্তু উভয় গ্রন্থের বর্ণনাই আলিবর্দীর সমর্থনে বলা হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। হাজী আহ্মদের জামাতা মুখলিস আলী খান মুর্শিদকুলী খানের অধীনে চাকুরিরত থেকে আলিবর্দীর পক্ষে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, সেই সম্পর্কে শুধু রিয়াজের বর্ণনায় (রিয়াজ-বা, ২৫৬-৫৭ পৃঃ) আছে ঃ

"মুর্শিদকুলীর সেনাপতিদের মধ্যে গোপনে রাজদ্রোহিতার বীজ বপনের জন্য মুখলিস আলীকে নির্দেশ দিয়ে ফেরৎ পাঠান হয়। মুরশিদকুলী খানের সামনে উপস্থিত হয়ে মুখলিস খান প্রকাশ্যে তাঁকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করেন এবং গোপনে প্রলোভন দেখিয়ে মুরশিদকুলীর সৈন্য বাহিনীর মধ্যে রাজদ্রোহিতার বীজ বপন করেন। আলী বর্দী খান মহবত জঙকে এ বিষয়ে সাফল্যের বিবরণ প্রেরণ করেন।" তারিখ-ই-বঙ্গালাতেও (১৪৬ পৃঃ) এই মুখলিস খানের বিশ্বাসঘাতকতার কথা আছে। আলিবর্দী এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে উড়িষ্যা গিয়েছিলেন শেষোক্ত গন্থে (১৪৬ পৃঃ) এই বর্ণনা আছে।

বিপর্যস্ত ও নবাবের হস্তীর 'হাওদা' অনাবৃত হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে যুদ্ধে বিজয়ী ঘোষিত হওয়ার আশায় মীর্জা বাকের খান তাঁর অবস্থান সেনাবাহিনীর ডানদিকে [ও] শত্রুবাহিনীর বামদিকে সরিয়ে নেন। সেখানে ছিলেন মীর মোহাম্মদ জাফর খান, কাসেম আলী খান ও অন্যান্য সেনাপতি। মীর্জা বাকের এমনভাবে যুদ্ধ করতে থাকেন যে, নবাবের কিছুসংখ্যক অনভিজ্ঞ কিন্তু সাহসী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, নবাবের সেনাবাহিনীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। [তখন] মীর মোহাম্মদ জাফর খান ও অন্যান্য সাহায্যকারী সেনাবাহিনীর আগমন ও তাদের বারবার আক্রমণের ফলে শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। [যুদ্ধের] অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নবাবের আদেশে বাদকদল বিজয় বাদ্য বাজাতে আরম্ভ করে। সৈন্যগণ এই বিজয় বাদ্য শুনে শত্রুদের পরাভূত করতে আবারও অগ্রসর হয়।

মীর্জা বাকের খান প্রতিরোধের সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন দেখে লজ্জাজনকভাবে [দ্বিতীয়] মুর্শিদকুলী খানের নিকট চলে যান। সেখানে [তাঁদের পক্ষের] কোন সৈন্যের উপস্থিতি না দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তার আরশিতে বিজয় ও অধিকারের চিত্র প্রতিফলিত হবে না এবং [এ কারণে] একসঙ্গে (মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে) পলায়ন করেন।[১০] নবাব [আলিবর্দী খান] বিজয়লাভ করে আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 'সিজদা' করেন এবং সেখান থেকে প্রস্থান করে শত্রু শিবিরে যেখানে ছিল সেখানে বিজয় ও গৌরবের নিশান গাড়েন। [দ্বিতীয়] মুর্শিদকুলী খান ও মীর্জা বাকের বালেশ্বর বন্দরে পৌঁছেন এবং সেখানে এ ধরনের অবস্থার জন্য [আগে থেকেই] একটি নৌকা রক্ষিত ছিল।[১১]

১০। মূল ফা. পাঠ, 'ওয়া চুন ফৌজরা দর আনজা না দীদ সুরত-ই-ফতেহ ও যফর দর আয়নাহ-ই-খিয়াল ওয়া নযর জলুহগর না ইয়াফতাহ ব-ইতিফাক রু ব-ওয়াদ-ই-ফেরার তাখত'

(وچون فوج را در انجا ندید صورت فتح و ظفر در ائینه خیال و نظر جلوه گرنیافته باتّفاق رو بوادی فرار تاخت) -এর ইংরেজি অনুবাদ ডক্টর সোবহান (ত-ই ২২-২৩ পৃঃ) দিয়েছেন;
'Seeing no solders in that place, he became reconciled that he would not carry the day and so he took to his heels with Murshid quli Khan" এটি ভাবনুবাদ হলেও পাদটীকায় তিনি আক্ষরিক অনুবাদে যথার্থই বলেছেন "he did not see the image of victory and triumph reflected in the mirror of his thought and vision." স্যার যদুনাথ (৯০ পৃঃ) যে ভাবানুবাদ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ 'As he saw no troops there he realized that victory was not to be his and turned his face to flight, along with (Murshid Quli)"। মূল পাঠের সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই।

১১। সিয়ার-এর মতে (সিয়ার বা ৪২৫ পৃঃ) তাঁরা দৈবাৎ এই নৌকা পেয়ে যান। রিয়াজের মতে (রিয়াজ-বাঃ ২৬০ পৃঃ), সেখানে তাঁর জন্য একটি হাল্কা নৌকা তৈরি ছিল। তা.বা. তেও (১৪৭ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে। রিয়াজে (২৫৬-৬১ পৃঃ) বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং সেখানে মুখলিস আলী খানের বিশ্বাসঘাতকতা, আলিবর্দী খানের সঙ্গে ময়ুরভঞ্জের রাজার বিরোধিতা, মীর আবদুল আজিজের নেতৃত্বে বারের তিনশ সৈয়দ সৈনিকের বীরত্ব ইত্যাদির মোটামুটি নিরপেক্ষ বর্ণনা আছে। প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে 'তারিখ-ই-বঙ্গালা' গ্রন্থেও (১৪৩-৪৭ পৃঃ)

তারা মহিলা ও যত মালপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল তা নিয়ে নৌকায় চড়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে চলে যান।[১২]

নবাব আলিবর্দী খান বালেশ্বর পার হয়ে পরপর কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করে কটকে উপস্থিত হন। [দ্বিতীয়] মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক ফেলে যাওয়া প্রায় দুই লক্ষ নগদ টাকা ও প্রায় সমমূল্যের দ্রব্যাদি নবাবের কর্মচারীদের হস্তগত হয়। কটক সুবার শাসনভার সাঈদ আহমদ খান সওলত জঙের উপর ন্যস্ত করে নবাব আলিবর্দী খান বিজয়োল্লাসে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন এবং কয়েক মাইল অতিক্রম করে একই বছরের (১১৫৪ হিঃ=১৭৪১ খ্রিঃ) সফর মাসের শেষ দিকে (১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে) মুর্শিদাবাদে পৌঁছেন এবং সেখানে বিচার ও ন্যায়নিষ্ঠতার প্রশস্ত গালিচা বিছানোর আদেশ প্রদান করেন অর্থাৎ সুবিচার ও ন্যায়-নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দেন। সওলত জঙকে কটকের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল বলে তাঁর স্থানে কাসেম আলী খানকে[১৩] রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।

১২। মহিলাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা সিয়ার, রিয়াজ ও তা. বা. তে নেই। রিয়াজে (রিয়াজ-বা ঃ ২৬০-৬১ পৃঃ) বর্ণিত আছে যে, পুরীর রাজার সেনাপতি মুরাদ খান পরাজিত নবাবদের বেগমগণ ও তাঁদের সব মালপত্র কটক থেকে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সিকাকুল নামক স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে আলিবর্দীর সৈন্যদের আক্রমণের ফলে বেগমরা নিরাপদে চলে যেতে সমর্থ হলেও তাঁদের মালপত্র আলিবর্দীর হস্তগত হয়। সিয়ারের মতে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড ৪২৬-২৭ পৃঃ) বেগমগণ ও তাঁদের মালপত্রসহ মুর্শিদকুলী খান ও বাকের খানের নিকট পৌঁছে। তা-বা.-র বর্ণনা (তা. বাঃ ১৪৭-৪৮ পৃঃ) রিয়াজ-এর বর্ণনারই অনুরূপ।

১৩। কাসেম আলী খান ছিলেন আলিবর্দীর স্ত্রীর ভ্রাতা। তাঁর সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

মীর্জা বাকের খান কর্তৃক সওলত জঙকে বন্দীকরণ

কটকের শাসনভার গ্রহণ করার পর সওলত জঙ[১] দেখতে পেলেন যে, তাঁর সৈন্য সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত এবং একমাত্র জমাদার[২] গোজর খান ব্যতীত নবাব আলিবর্দী খানের সৈন্যদের মধ্যে [এখানে] আর কেউ নেই। মুর্শিদকুলী খানের অনেক সৈন্য তাঁর সঙ্গে না গিয়ে সেখানেই থেকে গিয়েছিল। সওলত জঙ তাদের অনেককেই সেনাদলে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধের সময় মুর্শিদকুলী খান এই সৈন্যদের যে বেতন[৩], ভাতা[৪] ও বরাদ্দ[৫] দিয়েছিলেন দূরদর্শিতার অভাবে তিনি (সওলত জঙ) সৈন্যদের কাছ থেকে তা ফেরৎ চেয়ে বসেন। এই অন্যায় দাবির ফলে তিনি সৈন্যদের বিরাগভাজন হন। তাঁর নিজস্ব সৈন্য এমন ছিল না যে, তারা [ঐসব] সৈন্যদের কোনো [সম্ভাব্য] বিদ্রোহ দমনে সমর্থ ছিল। তদুপরি তিনি অহংকারী ও উদ্ধত হয়ে পড়েছিলেন এবং ইতর-ভদ্র সকলের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতেন। ফলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সওলত জঙের কাজকর্ম ও ব্যবহারে তাঁর প্রতি বিরক্ত ও বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে তাঁকে অপসারণের চেষ্টা করে। মীর্জা বাকের খান [তখন] নয় কি দশ মঞ্জিল দূরে দাক্ষিণাত্যের কোনো এক জনপদে অবস্থানরত ছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছে বশ্যতা ও আনুগত্য প্রকাশ করে এবং এখানে এসে সওলত জঙকে বন্দী করার জন্য তাঁকে পত্র লিখে।[৬]

মীর্জা বাকের খান এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবকে তাঁর নিজের জন্য মহাসুযোগ ও তাঁর ভাগ্যের ক্ষেত্রে মহাদান মনে করে নিজের আস্তানা ছেড়ে কটক অভিমুখে যাত্রা করেন। মীর্জা বাকের খানের আগমন বার্তা পেয়ে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন সৈন্যরা বেতন ইত্যাদির অজুহাতে সওলত জঙের সঙ্গে [প্রথমে] উদ্ধত ও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন আচরণ করতে থাকে এবং এর পরে প্রকাশ্যে বিরোধিতা ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পূর্বে উল্লিখিত জমাদার

১। রিয়াজের মতে (রিয়াজ-বা ঃ ২৬১ পৃঃ) 'সওলত জঙ বদমেজাজী ও অর্থগৃধ্নু ছিলেন'। তা. বা. তেও (১৪৮ পৃঃ) অনুরূপ মন্তব্য আছে। 'সৈয়দ আহমদ খান কেহ্ ব খসাসত মশহুর বুদ (سید احمد خان که بخساست مشهور بود)'

২। ফা. জমাদার শব্দ তখনকার দিনে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা অর্থাৎ সেনাপতি অর্থে ব্যবহৃত হত।

৩। ফা. পাঠ ঃ মোশাহিরা' (مشاهره)-র অর্থ মাসিক বেতন বা মাহিনা।

৪। ফা. পাঠ ঃ 'রসুম' (رسوم)-এর অর্থ ভাতা।

৫। ফা. পাঠ ঃ 'মোসায়েদাহ' (مساعده)-এর অর্থ দান বা বরাদ্দ বলা যেতে পারে।

৬। রিয়াজে প্রায় অনুরূপ বর্ণনাই (রিয়াজ-বা ঃ ২৬২ পৃঃ) আছে। এ সম্বন্ধে সিয়ারের বর্ণনা (সিয়ারঃ ১ম খন্ড, ৪৩৪-৩৮ পৃঃ) প্রায় রিয়াজের বর্ণনার মতই। 'তারিখ-ই-বঙ্গালাহ'-র বর্ণনায় (১৩৮-৩৯) কিছু নতুন তথ্য আছে। সেখানে মুর্শিদ কুলি খানের কয়েক জন সেনাপতির নাম আছে এবং বাকের খানকে ইরানের শাহজাদাহ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাই ছিলেন।

গাজর খান ছিলেন সওলত জঙের অতি বিশ্বাসের পাত্র। তিনি গোজর খানকে এই বিরোধিতা ও বিদ্রোহ দমনের জন্য তাদের নিকট প্রেরণ করেন। মীর্জা বাকের খানের আশু আগমনের সংবাদে উল্লসিত হয়ে বিদ্রোহীরা গোজর খানকে হত্যা করে।[৭] সে সময়ে সওলত জঙের সাহায্য ও সহায়তাকারী কেউ ছিল না বলে তারা দ্রুতবেগে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সহ সওলত জঙকে বন্দি করে এবং মীর্জা বাকেরের কাছে শত্রুদের পরাজয় ও কটক উদ্ধারের ঘটনা বর্ণনা করে পত্র লিখে। মীর্জা বাকের তড়িৎ গতিতে কটকে এসে উপস্থিত হন এবং সওলত জঙ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের তাঁর (বাকের খান) নিজের বাসভবনের নিকটবর্তী এক স্থানে বন্দী করে রাখেন[৮] এবং প্রচুর অর্থদান করে তিনি [বিদ্রোহীদের] প্রত্যেককে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন।

এই সংবাদের দীপ্তি নবাব আলিবর্দীর আলোকিত অন্তরে প্রবেশ করে।[৯] বাকের খানকে শায়েস্তা করার জন্য স্বয়ং নবাবের [কটকে] আগমনের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বাকের খান নিজাম-উল-মুলক আসফজাও কর্তৃক সাহায্য ও সহানুভূতিপুষ্ট[১০] হয়ে এই দুঃসাহসী ও হঠকারী কার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে [আলিবর্দী] বিশ হাজার সাহসী অশ্বারোহী ও ত্রিশ হাজার সাহসী পদাতিক সৈন্য নিয়ে কটক রাজ্যের বিপর্যস্ত অবস্থার শৃঙ্খলা বিধান ও সওলত জঙকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অমুক বছরের অমুক মাসে[১১] অগ্রসর হন। কয়েক মঞ্জিল পার হয়ে তিনি মেদিনীপুর অতিক্রম করেন। তাঁর সেনাবাহিনীর আগমন বার্তা পেয়ে বালেশ্বরে অবস্থানরত মীর্জা বাকেরের প্রতিনিধি সেই স্থান ত্যাগ করে কটক অভিমুখে পলায়ন করেন। [নবাবের] অগ্রবর্তী বাহিনী বালেশ্বর অতিক্রম করে কটকের দিকে অগ্রসর হয়।

৭। অন্যান্য সমসাময়িক গ্রন্থে গোজর খানের হত্যা সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ বর্ণনাই আছে।

৮। মোজাফফর নামাতে (য. না. ২৭ পৃঃ) আছে ঃ "Baqar Ali arrived; he wished to kill Saulatjong but his wife forbade him and thus saved the lives of the captives."

তারিখ-ই-বঙ্গালাতে বাকের খানের 'সিতাকুল' (سیتاکول) থেকে আগমনের কথা আছে এবং সৈয়দ আহমদকে বন্দী করার পর যুদ্ধ করে মেদিনীপুর ও হিজলী অধিকার করার কথা আছে (তা-বা ঃ ১৪৯ পৃঃ)।

৯। ফা. পাঠ ঃ 'ওয়া চুন পরতু-ই-ইন খবর বর পেশগাহ-ই-যমির-ই আনোয়ার নওয়াব্ মালী আল-কাব তাফত'

(وچون پرتواین خبر بر پیشگاه ضمیر انوار نواب معلی القاب تافت) When the light of this news shone on the enlightened heart of the Nawab'।

১০। ফা. পাঠ ঃ 'ব-ইমদাদ ওয়া ইয়া'নত-ই-নিযাম-উল মূলক আসফ জাহ'

(بامداد و اعانت نظام الملک اصف جاه) 'by the help and assistance of Nizam-ul-Mulk Asaf jah'

১১। ফা. পাঠ ঃ 'দর সাল ওয়া মাহ-ই-ফলান' (در سال و ماه فلان)= অমুক সনের অমুক মাস।

এখান থেকে গ্রন্থকার ঘটনাবলির সন-তারিখ উল্লেখ করতে অপারগতা জানিয়েছেন। তবে খুব সম্ভবত এই ঘটনা ঘটেছিল ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে অথব ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে। কারণ প্রথম অভিযানের বর্ণনায় দেখা যায় যে, আলিবর্দী ১৭৪১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের দিকে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছিলেন।

মীর্জা বাকের খান তাঁর সেনাবাহিনীকে বহু সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং প্রকৃত পক্ষে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েও ছিলেন। তাদের নিকট থেকে সহযোগিতা পাবেন এই প্রত্যাশায় তিনি নবাব আলিবর্দী খানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হন। তাঁর কাছ থেকে অজস্র অর্থ লাভকারী তাঁর এই সেনাদল নবাব আলিবর্দীর সেনাবাহিনীর তুলনায় ছিল প্রবল বাজপাখির কাছে [ক্ষুদ্র] চড়ুই পাখির মতো। বিজয়ী বাহিনীকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।[১২] সৈন্যদের সমর্থন[১৩] থেকে বঞ্চিত হয়ে মীর্জা বাকের হতাশ হয়ে পড়েন এবং যে শাসনকর্তৃত্ব তিনি সাময়িকভাবে পেয়েছিলেন তা হারাবার ব্যাপারে নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে যত কিছু মালপত্র লটবহর সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল তা পূর্বাহ্নেই [দাক্ষিণাত্যে] প্রেরণ করেন। তরঙ্গের মতো অগ্রসরগামী সৈন্যদের আগমন বার্তা শ্রবণ করে তিনি অতিশয় নিরাশ ও হতাশ হয়ে 'পশ্চাদপসরণই শ্রেষ্ঠ'[১৪] এই বাক্য উচ্চারণ করে দাক্ষিণাত্যের দিকে পলায়ন করেন। তিনি সওলত জঙকে একটি 'রথে' আরোহণ করিয়ে তেলিঙ্গা ও মোঘলদের মধ্য থেকে একদল সৈন্য নিয়োজিত করেন এবং তাদেরকে এই আদেশ দিয়ে যান যে, [শত্রুপক্ষ] সওলত জঙকে উদ্ধার করার জন্য আসার পূর্বেই যেন তীক্ষ্ণ তরবারি ও রক্তক্ষরণকারী ছোরা দ্বারা তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়।

মীর্জা বাকেরের পলায়ন ও কটক পরিত্যাগ করার সংবাদ নবাব আলিবর্দী খানের নিকট পৌঁছলে দুই-তিন মঞ্জিল দূর থেকেই তিনি অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর প্রধান সেনাপতিদের মধ্য থেকে মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খান বখশী ও গোলাম মোস্তফা খানকে যে প্রকারে সম্ভব সওলত জঙকে উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। এই খানেরা বিদ্যুৎ ও বাতাসের গতিতে কটকে পৌঁছেন এবং সেই নগরীর অপর তীরে অবস্থিত কাটা জুরি নদী অতিক্রম করে পলায়নকারীদের পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হন। এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর সেনাপতিরা সওলত জঙের রথের সন্ধান পান। এই রথ মীর্জা বাকেরের পিছনে পিছনে যাচ্ছিল এবং মীর্জা বাকের একটু সামনে অগ্রসর

১২। এই ও পূর্ববর্তী বাক্যের সংক্ষিপ্ত ও ভাবানুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (৯৪ পৃঃ) "... he wished to set out for opposing 'Alivardi, but the troops declared that they were not strong enough to fight Alivardi's vast army."। এই পাঠ অনেকটা মনগড়া।

১৩। ফা. পাঠের 'এয়া'নত' শব্দসহ এই বাক্যের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (৯৫ পৃঃ), Mirza Baqar despairing of the support of his troops had no help but to leave his usurped kingdom এই পাঠ অনেকটা মনগড়া ও ফারসি পাঠের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন।

১৪। আরবি বচন ঃ 'আল আ'উদু আহমাদ' (العود احمد) 'Retreat is best'।

মীর্জা বাকেরের পলায়ন সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-বা, ৪৪১-৪২ পৃঃ) মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে, বিস্তারিত বর্ণনা আছে তা. বা-তেও (১৫০-৫১ পৃঃ)।

হয়েছিলেন। যেসব লোক সওলত জঙকে হত্যা করার জন্য বাকের খান কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিল তারা রথের বাইরে থেকে ভিতরে বর্শার আঘাত করে। রথটি বেশ কয়েকটি পর্দা দ্বারা আবৃত ছিল। দৈবক্রমে সওলত জঙের গায়ে কোনো আঘাত লাগেনি। সওলত জঙকে হত্যা করার জন্য যে দুইজন মোঘল সৈন্যকে রথের ভিতরে রাখা হয়েছিল সওলত জঙ কর্তৃক বশীভূত হওয়ার ফলে তারা তাঁর কোনো ক্ষতি করেনি। বরং রথের বাইরে থেকে বর্শার আঘাত করার ফলে তারা আঘাতপ্রাপ্ত ও আহত হয়েছিল[১৫] ইতোমধ্যে গোলাম মোস্তফা খান ও মীর মোহাম্মদ জাফর খান রথের কাছাকাছি স্থানে এসে উপস্থিত হন এবং চারদিকে দণ্ডায়মান প্রহরীদের বিতাড়িত করে সওলত জঙকে নিরাপদ অবস্থায় রথের বাইরে নিয়ে আসেন। অনেক দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে বিধায় বাকের খানের পশ্চাদ্ধাবন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করে তাঁরা সওলত জঙকে আলিবর্দী খানের নিকট নিয়ে আসেন। আল্লাহ্র কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আলিবর্দী খান ভূমিতে পড়ে 'সিজদা' করেন এবং এই বিপর্যস্ত রাজ্যে সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন।

এই বিপর্যস্ত রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় শৃংখলা স্থাপন করে নবাব চিন্তা করেন যে, সওলত জঙকে এখানকার শাসনকর্তার পদে বহাল রাখা আর সমীচীন হবে না এবং হাজী আহমদ খানের জামাতা মোখলেস খানকে[১৬] এই পদে নিযুক্ত করে নবাব তাঁর রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। দুই-তিন মঞ্জিল অতিক্রম করার পর আলিবর্দী খান ভদ্রক নামক স্থানে পৌঁছেন এবং সেখানে তাঁর প্রধান সেনাপতি গোলাম মোস্তফা খানের

১৫। সিয়ারে এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে তার একাংশ (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড ৪৪১ পৃঃ) নিম্নরূপ ঃ

"শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন আদ্যন্ত শ্বেত বস্ত্রাবৃত একটা রথে, কাপড়ের উপরে ছিল সমস্ত রথ ঘিরিয়া শক্ত দড়ির জালির কাজ। বন্দীর সঙ্গে রথে দুইজন তুরানী মোঘল স্থাপিত হয়, কোনো শত্রু সৈন্যকে দেখিবা মাত্রই ছোরা হস্তে তাঁহার উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করার জন্য আদেশ ছিল। অনুরূপভাবে রথের চারদিকে ৫০০ দক্ষিণা সৈন্য স্থাপিত হইল।"

রিয়াজের বর্ণনায় (রিয়াজ-বা ঃ ২৬৩ পৃঃ) আছে ঃ

"... সওলত জঙকে একটি ঝালর দিয়ে ঘেরা রথে বসান এবং মুর্শিদকুলী খানের ভ্রাতা হাজী মুহম্মদ আমীনকে উন্মুক্ত ছোরা হস্তে সেই রথে সঙ্গীরূপে বসিয়ে দেন। দু'জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যকে রথের দু'পাশে দিয়ে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, যদি মহবত জং-এর সৈন্যরা তাদের নাগাল পায় তাহলে তৎক্ষণাৎ যেন সওলত জঙকে ছোরা ও বর্শার আঘাতে হত্যা করা হয় এবং তিনি যেন কোনোক্রমেই পলায়ন করতে না পারেন।" তা.বা.-তে যে বর্ণনা আছে তো প্রায় অনুরূপ এবং তা ১৫১ পৃষ্ঠায় দ্রঃ।

১৬। হাজী আহমদের জামাতা এই মুখলিস আলী খানের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন এর প্রমাণ এখানেই পাওয়া গেল। এ প্রসঙ্গে রিয়াজের বর্ণনা দ্রঃ।

পরামর্শে তিনি মোখলেস আলী খানকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থানে শেখ মোহাম্মদ মাসুমকে এ পদে নিযুক্ত করেন। বিশ্বস্ততার কারণে এই গোলাম মোস্তফা খান সেনাপতিদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৭]

বিজয়ী বাহিনী জয়োল্লাসে বালেশ্বর পৌছলে নবাব তাঁর সেনাবাহিনীকে ময়ুরভংর জমিদারের রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে আদেশ দেন। এই জমিদার (রাজা জাগরধর ভঞ্জ)[১৮] শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন এবং তাঁর শাস্তি বিধান আবশ্যক বলে নবাবের মনে হয়েছিল। আদেশ পাওয়ার পর সেনাবাহিনী অবিলম্বে জমিদারের নগর অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং অনতিবিলম্বে সেই নগর ধুলিস্মাৎ করে ফেলে এবং মেয়ে ও পুরুষ মিলিয়ে হাজার হাজার শিশুকে বন্দী করে।[১৯] এ স্থান ধ্বংস করার পর কয়েক দিনের মধ্যে নবাব বালেশ্বর হয়ে মেদিনীপুরে এসে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে দুই মঞ্জিল দূরে ঝিক্কা নামক স্থানে এসে পৌছেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। কোনো মানুষ কল্পনা করে নি এমন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা সেখানে ঘটে।

১৭। এই সেনাপতি (মোস্তফা খান) পরে বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং সেই বর্ণনা পরে দ্রঃ।

১৮। রিয়াজের মতে তাঁর নাম ছিল 'জগৎ ইসর'। তাঁর অধীনে অসংখ্য সৈন্য থাকার কারণে তিনি আলিবর্দীকে 'তোয়াক্কা করতেন না'। আলিবর্দী তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন (রিয়াজ- বাঃ ২৬৫ পৃঃ); তা. বা. -তেও অনুরূপ বর্ণনা আছে।

১৯। হাজার হাজার শিশুকে (বালক ও বালিকা) বন্দী করার কি যুক্তি থাকতে পারে তা মানব বুদ্ধির অগম্য। ময়ুরভঞ্জের রাজার অপরাধ, তিনি আলিবর্দীর কাছে মাথা নত করেন নি। কিন্তু এই হাজার হাজার শিশু কি অপরাধ করেছিল? তথাকথিত ভাল মানুষ আলিবর্দীকে মানবতার বিচারে কোন স্থানে ফেলা যায় তা বিচার্য বিষয়।

নবম অধ্যায়

বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাঙলা অধিকারে ভাস্কর পণ্ডিতের বর্ধমানে আগমন

সংক্ষেপে এই ঘটনার বর্ণনা নিম্নরূপ[১] : রঘুজী ভোঁসলা[২] ছিলেন মারাঠাদের মধ্যে একজন বড় নেতা ও বেরার রাজ্যের বিদ্রোহী অধিকারী। বাহ্যত মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং গোপনে নিজাম-উল-মূলক আসফ জাহার[৩] প্ররোচনায়, সম্ভব হলে বাঙলা অধিকার অথবা সেখান থেকে চৌথ[৪] আদায় করার জন্য আনুমানিক বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে তিনি ভাস্কর[৫] নামক তাঁর প্রধান সেনাপতিদের একজনকে প্রেরণ করেন। [মারাঠাদেরকে] চৌথ দেওয়ার প্রচলন ও রীতি প্রায় সমগ্র দেশেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই অন্যায়ের হাত থেকে বাঙলা রাজ্য সুরক্ষিত ও নিরাপদ ছিল।

পার্বত্য পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে কটকের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ভাস্কর বাঙলায় প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিক দিয়ে কোনো উন্মুক্ত পথ না পেয়ে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে [প্রায়] আট মঞ্জিল পশ্চিমে অবস্থিত পাচেট গিরিপথ অভিমুখে অগ্রসর হন।

১। গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খান এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁর পিতা গোলাম আলী খান ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের একজন সেনাপতি। মীর্জা বাকেরের উড়িষ্যা থেকে পলায়নের পর নবাব সসৈন্যে বাঙলায় ফিরে আসছিলেন। তখন তরুণ গ্রন্থকার পিতাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উড়িষ্যা অভিমুখে অগ্রসর হলে পথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। মারাঠাদের সঙ্গে নবাবের যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় গ্রন্থকার তা নিজের চোখে দেখেন এবং তাঁর গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেন। সিয়ার রচয়িতা গোলাম হোসেন তবতবায়ি এ যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক তথ্য ইউসুফ আলীর গ্রন্থ থেকে নিয়েছিলেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন।

২। ফা. পাঠ : 'রঘুজি খোসলা' (رگھوجی کھوسلا)। এ পাঠ ভুল এবং তাঁর প্রকৃত নাম ছিল রঘুজী ভোঁসলা। তিনি মারাঠা শাহুরাজার ভ্রাতৃস্পুত্র ও নাগপুরের শাসনকর্তা ছিলেন। তা. বা. (১৫৫ পৃঃ)-তে আছে : "রঘুজী ভোঁসলা বেরাদর জাদাহ-ই-রাজা সাহু" = রাজা সাহুর ভ্রাতুস্পুত্র রঘুজী ভোঁসলা।

৩। দাক্ষিণাত্যের মোঘল সুবাদার নিজা-উল-মূলক আসফ জাহ, ছিলেন মোঘল সাম্রাজ্যের আমিরদের মধ্যে একজন প্রধান ও শক্তিশালী আমির। সেই সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষদিকে (প্রকৃতপক্ষে অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই) মোঘল সম্রাটদের তেমন কোনো ক্ষমতা ছিল না। দরবারের শক্তিশালী আমিরগণ তাঁদের সুবিধা অনুসারে সম্রাট বানাতেন এবং প্রয়োজনে তাঁদের হত্যাও করতেন। সেই শক্তির দ্বন্দ্বে নিজাম-উল-মূলকও ছিলেন একজন অংশীদার। কোনো কারণে দিল্লীর দরবারে তাঁর প্রভাব কিছুটা কমে গেলে তিনি উস্কানি দিয়ে মারাঠাদের দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তিকে সবল রাখার অভিপ্রায়ে।

৪। মারাঠারা দিল্লীর সম্রাটের কাছে 'চৌথ' অর্থাৎ সাম্রাজ্যের রাজস্বের এক চতুর্থাংশ দাবি করে বসে এবং দৈহিক শক্তি বলে তা আদায় করেও নেয়। বাঙলা তখন পর্যন্ত সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিল।

৫। ভাস্কর পণ্ডিত ছিলেন রঘুজী ভোঁসলার প্রধান সেনাপতিদের অন্যতম। তাঁর সম্বন্ধে বর্ণনা পরে আছে।

ঝিকরে অবস্থানকালে এই সংবাদ নবাব আলিবর্দী খানের শ্রুতিগোচর হয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে [তখন পর্যন্ত] মারাঠা নাম বাঙলার অধিবাসীদের কানে কোনোদিন প্রবেশ করেনি এবং [পশ্চিম দিক থেকে] এ রাজ্যে প্রবেশ করার একমাত্র [এবং তাও] পার্বত্য পথ ছিল সিক্রিগলি[৬]। এসব কারণে নবাব এই সংবাদকে কোনো গুরুত্ব দেননি। কিন্তু মোবারক মঞ্জিলে[৭] পৌছার পর মারাঠাদের পাচেট নিরিপথ অতিক্রম করে বর্ধমান চাকলার সীমান্তে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ নবাবের কাছে পাকাপাকিভাবে পৌছে। কটক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর [রাজ্যের] কোথাও কোনো গোলমাল বা বিপদের আশংকা না থাকায় এবং কাউকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু মনে না করার কারণে নবাব ইতঃপূর্বে সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। [ফলে] পাঁচ-ছয় হাজার অশ্বরোহী সৈন্যের বেশি সে সময়ে [তাঁর সেনাদলে] ছিল না। নবাব মুর্শিদাবাদের বেশ কাছাকাছি স্থানে পৌছেছিলেন বলে এবং পথে তাঁর কোনো বিপদ বা শত্রুতার আশংকা ছিল না বিধায় [তাঁর] অধিকাংশ সৈন্য রাজধানীতে পৌছে গিয়েছিল। সে সময়ে নবাবের কাছে তিন কি চার হাজারের বেশি অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর চার কি পাঁচ হাজারের বেশি পদাতিক সৈন্য ছিল না।

ঘন জনবসতি ও খাদ্যশস্যের প্রাচুর্যের কারণে[৮] বর্ধমান কসবা বাঙলার অন্যান্য পরগনার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। অনেক বিবেচনা করে ও গোলাম মোস্তফা খানের পরামর্শে বর্ধমানকে নিকট পশ্চাতে রেখে নবাব শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তিনি মোবারক মঞ্জিল থেকে নির্গত হয়ে সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় দিনে বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন। এই সময় দুই-একদিনের মধ্যেই লুন্ঠনকারী সেনাদলের দেখা পাওয়া যায় এবং বিজয়ী বাহিনী তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড লড়াই হয় এবং কিছুসংখ্যক সৈন্য আহত হয়ে [নবাবের] শিবিরে ফিরে আসে। এই সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলে। প্রচন্ড যুদ্ধ ছাড়া তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হওয়া কঠিন জেনে ভাস্কর পন্ডিত এই প্রস্তাব দেন; "আমি বহু দূরত্বের পথকষ্ট সহ্য করে মহামহিমের রাজ্যে এসেছি। আতিথেয়তার দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি নগদ দশ লক্ষ টাকা আমাকে প্রদান করা হয় তবে আমি ফিরে চলে যাব।"[৯]

৬। রাজমহলের নিকটবর্তী গিরিপথ এবং তা ছিল পশ্চিম থেকে বাঙলায় প্রবেশের একমাত্র পথ।

৭। নবাব শুজা খান কর্তৃক নামকৃত এ স্থান ছিল বর্ধমান জেলায়। সেই নাম এখন আর টিকে নেই।

৮। মূল ফা. পাঠ ঃ 'দর কিসরত ঘল্লাত ওয়া ওফর-ই-মুঅ'মুরি' (در کثرت غلات ووفور معموری) Abundance of grain and density of population'। য. না.
(৯৬ পৃঃ) (معموری) শব্দের অর্থ 'houses' দিয়েছেন। এই পাঠ ত্রুটিপূর্ণ।

৯। ভাস্কর পণ্ডিতের এই প্রস্তাবের কথা মোজাফফর নামা, রিয়াজ বা তা. বা. তে পাওয়া যায় না। সিয়ারে অবশ্য এর উল্লেখ আছে। তবে দেখে মনে হয় সিয়ার রচয়িতা এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ইউসুফ আলী খানের রচনা প্রায় হুবহু তুলে ধরেছেন।

তাঁর নিজের বুদ্ধিতে, গোলাম মোস্তফা খানের পরামর্শে ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে [মারাঠাদের] প্রস্তাবিত শর্তে নতি স্বীকার করা অসঙ্গত মনে করে নবাব যুদ্ধ করার পক্ষে উত্তর দেন এবং এইভাবে দিন কয়েক অতিবাহিত হয়। নবাবের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সম্মুখ সমরে এই যুদ্ধের অবসান ঘটেনি। কারণ, মারাঠাদের যুদ্ধের রীতি ছিল প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে পলায়ন করা এবং শত্রুকে অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণ করা। [একদিন] গাড়ি ও চক্র জাতীয় অতিরিক্ত সরঞ্জামাদি[১০] শিবিরে রেখে একদল অশ্বারোহী সৈন্য কর্তৃক[শত্রুকে] দ্রুত গতিতে আক্রমণ করার জন্য [নবাব] আদেশ প্রদান করেন। এই অভিপ্রায়ে এক প্রভাতে নবাব অশ্বারোহনে নিগর্ত হন এবং কঠিন আদেশ জারি করেন যে, [অতিরিক্ত] সরঞ্জামাদি যেন শিবিরে রাখা হয় এবং শিবিরের কর্মীরা (অর্থাৎ শিবির প্রহরীরা) যেন সেনাদলের সঙ্গে না যায়। কিন্তু মারাঠাদের ভয়ে শিবিরের লোকজন [নবাবের] নিষেধাজ্ঞা পালন না করে জোর করে সৈন্যদের সঙ্গে চলে যায়। তারা কিছুদূর অগ্রসর হলেই লুণ্ঠনকারী সেনাদল (অর্থাৎ মারাঠারা) এগিয়ে আসে এবং চারদিক থেকে আক্রমণ করে।[১১]

সেদিন প্রচন্ড যুদ্ধ হয় এবং উভয়পক্ষে [অনেক লোক] নিহত হয়, [অনেক লোককে] হত্যা করার প্রচেষ্টা চলে। নবাবের আমিরদের মধ্যে ওমর খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোসাহিব খান[১২] নিহত হন। যুদ্ধ করতে করতে নবাব যখন শত্রু শিবিরের দিকে অগ্রসর হন তখন অপরাহ্ন কাল। এই সময়ে নিজ শিবিরে ফিরে যাওয়া কঠিন এবং শত্রু শিবির

১০। মূল ফারসি 'কসদ আন ফরমুদ কেহ আসবাব-ই-যিয়াদতি' (قصد آن فرمود که اسباب زیادتی) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (য. না.-৯৭ পৃঃ)= 'So he planned to leave his heavy things'। 'আসবাব-ই-যিয়াদাতি' শব্দের অর্থ ভারী বস্তু নয়, অতিরিক্ত বস্তু।

১১। রিয়াজে (রিয়াজ-বা, ২৬৬ পৃঃ) এই যুদ্ধের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ "আলিবর্দী খান ময়ুরভঞ্জের জঙ্গল অতিক্রম করার পূর্বেই মারাঠা দস্যুগণ বর্ধমান চাকলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহব্বত জঙ্গ দিবারাত্র মার্চ করে বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হয়ে বর্ধমানের সংলগ্ন উজালন সরাইতে উপস্থিত হন। মারাঠা দস্যুগণ বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করে তাঁর লটবহর ও শিবির লুণ্ঠন করতে থাকে। বাংলার সৈন্যবাহিনী মারাঠা দস্যুদের যুদ্ধরীতি ও কৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল; তবে তারা মারাঠাদের বর্বরতা ও ধ্বংসমূলক কার্যের কথা শুনেছিল। সেই জন্য বাংলার সৈন্যরা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং মারাঠারা চতুর্দিক থেকে তাদের কোণঠাসা করে ফেলল। বাংলার লটবহর তো লুণ্ঠিত হলোই, তদুপরি তাদের রসদ সরবরাহের পথও মারাঠারা বন্ধ করে দিল। বাংলার সৈন্য, অশ্ব, হস্তী ও উট দস্যুরা দখল করে নিয়ে গেল। দস্যুদের প্রচন্ড আক্রমণ ও অবরোধের ফলে বাংলার সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ....

১২। এই সম্বন্ধে রিয়াজের বর্ণনায় (রিয়াজ-বা, ২৬৬ পৃঃ) আছে, "মারাঠারা চারদিক থেকে আক্রমণ করে লাওাহ হস্তীটি হস্তগত করে নিজেদের শিবিরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই হস্তীর উপরে মহবত জঙ্গ-এর বেগম ছিলেন। সেনাপতি ওমর খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোসাহেব মুহম্মদ খান তাঁর হিন্দুস্তানী বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দস্যুদের আক্রমণ করেন এবং রুস্তমের মতো সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে হাতি ও বেগমকে দস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু এই মোসাহেব খান এবং তাঁর বহুসংখ্যক সঙ্গী ও আত্মীয় এই যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেই স্থানেই তাঁদের দাফন করা হয়।"

অধিকার করা অসম্ভব বিবেচনা করে নবাব যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানেই [নিজের বাহন থেকে] নিরুপায় হয়ে অবতরণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে [বলা যেতে পারে যে,] এই ভূমি ছিল অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির কারণে কর্দমাক্ত। চার-পাঁচটি পালকি[১৩], গরম কাপড়ে তৈরি একটি সাধারণ তাঁবু ছাড়া সেনাবাহিনীর আর সরঞ্জামাদি শত্রুসৈন্য কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাঁবুটি নবাবের জন্য প্রেরণ করা হয়। এই মহাসংকটের মধ্যে কোনও প্রকারে রাত্রিযাপনের পর পরদিন প্রভাতে ভাস্করের নিকট একটি শান্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এই উল্লিখিত ব্যক্তি (ভাস্কর পণ্ডিত) নবাবের সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ সরঞ্জামাদি ধ্বংস করেছিলেন। তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে উত্তর দেন, "আপনার সাহায্যকারীদের যুদ্ধ করার কোনো ক্ষমতাই নেই এবং আপনার সমুদয় বাহিনীকে আমি ঘিরে রেখেছি এবং অতি শীঘ্রই তাদের গ্রেফতার ও বন্দী করব। কিন্তু আপনি হিন্দুস্তানের আমিরদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। আপনি যদি এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চান তবে নগদ এক কোটি টাকা ও আপনার সেনাদলের সব হাতি আমাকে দিয়ে দিন যাতে আমি আপনার কোনো ক্ষতি না করি এবং আপনার মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়।"[১৪]

সেদিন নবাবের সেনাবাহিনীতে প্রচন্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই সেনাবাহিনীর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে শত্রু পক্ষে যোগদানের কথা চিন্তা করে।[১৫] রাজা জানকী রাম ছিলেন নবাবের দিওয়ানখানা ও সেনাবাহিনীর কর্মাধ্যক্ষ। তিনি নবাবের নিকট নিবেদন করেন, "শত্রু পক্ষের প্রবলতা সীমা অতিক্রম করে গেছে। যে অল্পসংখ্যক সৈন্য আমাদের সঙ্গে আছে অবস্থা দেখে তারাও শত্রুপক্ষে যোগদান করতে চায়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

১৩। পালকি কাষ্ঠ নির্মিত ও মনুষ্যবাহিত শিবিকা বিশেষ। সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের পরিবহনের জন্য সেই সময়ে এই বাহন অত্যাবশ্যক ছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত এই বাহন মধ্যবিত্ত বাঙালীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। বাল্যকালে আমরা মনুষ্যবাহিত এ পালকিতে চড়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেছি।

১৪। এই এক কোটি টাকার কথা মোজাফফরনামাতেও (য. না-২৮ পৃঃ) আছে এবং সেখানে সিরাজ-উদ-দৌলাকে জামিন হিসাবে রাখার অতিরিক্ত শর্তের কথাও আছে।

১৫। নবাবের সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই মারাঠাদের সঙ্গে আপোস করার কথা সমর্থন করেছিলেন বলে সিয়ারে বর্ণিত আছে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৪৬২ পৃঃ)। রাজা জানকী রামের সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কথা সিয়ারেও আছে। প্রধান সেনাপতিসহ অন্যান্য সেনাপতিরও সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কথা আছে। সেখানে আছে ঃ "স্রোত বন্ধ করা বা তাঁহার ব্যাপারে প্রতিকারের কোনো উপায় উদ্ভাবন করা অসম্ভব দেখিয়া সুবাদার কোনো অনুচর বা মশালচী সঙ্গে না লইয়া মধ্যরাত্রে তাঁহার তাঁবু ত্যাগ করিরেন। বালক সিরাজ-উদ-দৌলার হাত ধরিয়া তিনি পদব্রজে মোস্তফা খাঁর তাঁবুতে গমন করিয়া বলিলেন, 'আপনাকে আমার কিছু বলিবার আছে। কাজেই ঘুম হইতে উঠিয়া আসুন' ... সুবাদার উত্তর দিলেন বন্ধু মোস্তফা খাঁ আমার কথা শুনুন। মানুষের নিকট তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর কিছুই নাই। কিন্তু আমার অবস্থা এখন এমন যে, আমার সহজতম ও প্রধানতম কার্য হইল মৃত্যুবরণ। আমরা একাকী। আমাকে এক্ষুণি হত্যা করুন।" সিয়ারের এই বর্ণনা সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত। এই উপায়ে নবাব তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ করার সংকল্প স্থাপনে কৃতকার্য হয়েছিলেন।

শত্রুপক্ষের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ ও হস্তীগুলি হস্তান্তরে সম্মত হওয়া আবশ্যক। কারণ বাঙলায় হস্তী খুব একটা মূল্যবান কিছু নয়। [আর] দাবিকৃত টাকার ব্যাপারে রাজকোষে যে চল্লিশ লক্ষ টাকা মজুদ আছে এই নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তা দিতে পারবে এবং অবশিষ্ট টাকা জরিমানা হিসাবে সংগ্রহ করা হবে।"

অন্য উপদেষ্টারাও জানকী রামের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই কথা বললেন। কিন্তু অপরিসীম সাহসিকতা ও পূর্ণ আত্মমর্যাদাবোধের কারণে নবাব এই কার্যে অংশীদার হতে কোনো মতেই সম্মত না হয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "আমি এই অপমান ও অবমাননার প্রস্তাব কখনও গ্রহণ করব না। আমি যুদ্ধ ও প্রতিরোধ করে তাদেরকে পরাজিত করব। এমন অবমাননাকর পরিস্থিতিতে শত্রুদেরকে অর্থ দেওয়ার কি স্বার্থকতা থাকতে পারে! আল্লাহ্ চাহেন তো যুদ্ধ শেষে রাষ্ট্রের যে সব সাহায্য ও সহায়তাকারী[১৬] যাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এই যুদ্ধে তাঁদের শৌর্য প্রদর্শন করবেন তাঁদেরকে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসাবে দিব।"

একদল জমাদারের মধ্যে সংকল্পের বিশৃংখলা ও নীচতার[১৭] চিহ্ন প্রকট হলে গোলাম মোস্তফা খান নিজেও তাঁদেরকে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করে বলেন[১৮], "চল্লিশটি তরবারি একত্র হলে একটি রাজ্য জয় করা যায়। আর আমরা এখানে তিন হাজারের বেশি মানুষ আছি। আমাদের পক্ষে এই ভীতি ও ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চরম কাপুরুষতা। আল্লাহর রহমতে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা বিজয়ী হব। যতদিন আমি গোলাম মোস্তফা খান বেঁচে আছি, আমার মস্তক মহাবত জঙের নিকৃষ্টতম ভৃত্য হিসাবে তাঁর অশ্বের খুঁড়ের সঙ্গে আবদ্ধ আছে বলে মনে করবেন।"

এ ধরনের বাক্য শ্রবণ করে সেনাবাহিনীর সব লোক সাহস সঞ্চয় করে চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত সেই সেঁতসেঁতে স্থানে রাত পর্যন্ত সারাদিন যে উপায়ে পারে সেখানে থেকে যায়। রাতের অন্ধকার তাদের লজ্জা নিবারণের আবরণ হলে শিবিরের বেশ কিছু নিম্নপদস্থ কর্মচারী এবং এমনকি নবাবের [নিজের] সৈন্যবাহিনীর কিছু লোক পলায়ন করে শত্রু পক্ষে যোগদান করে। [ফলে] কিছু বিখ্যাত জমাদার ও স্বনামধন্য সঙ্গী ছাড়া আর [বিশেষ] কেউ সেখানে থাকেনি।[১৯] [এর আগে] শিবির লুণ্ঠনের দিন নবাবের কামানগুলি শত্রুদের হস্তগত হয়েছিল। তারা গাছের উপর কামান রেখে নবাবের

১৬। ফা. পাঠ ঃ 'মুয়া'ঈন ও মুয়া'যদিন' (معانین و معاضدین) helpers and assistants। স্যার যদুনাথ এই বাক্যের যে ভাবানুবাদ দিয়েছেন (৯৮ পৃঃ) তা ত্রুটিপূর্ণ এবং নিম্নরূপ ঃ "Instead of giving this money to the enemy under such humiliation, it is better that, God willing, after fighting the battle I shall give ten lakhs of rupees as reward to the faithful soldiers who will loyally and bravely sacrifice their lives in this war."

১৭। ফা. পাঠ ঃ যললি ও খললি (زللی و خللی) = Confusion and baseness.

১৮। ফা. পাঠ ঃ 'ত'আন ওয়া তশনিই' কারদাহ্ গোফ্ত্' (طعن و تشنیع کرده گفت) = 'reviled and reproached....saying'.

১৯। ফা. পাঠ ঃ 'কেহ্ গায়ের আয্ মোশাহির জমাদারান ওয়া আ'যাহ্-ই রওশনাস কাসে নাবুদ '(که غیر از مشاهیر جمعداران و اعزهٔ روشناس کسی نبود) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ (২৯ পৃঃ) দিয়েছেন "Except the followers of (these) *jamadars* and personal comrades of the Nawab(مشاهیر واعزه روشناس) প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে প্রিয় অথবা স্বনামধন্য সঙ্গী বা পরিচিত ব্যক্তিগণ।

সৈন্যদের উপর কামানের গোলা ও লোহার গুলি নিক্ষেপ করতে থাকে। জমিদারদের [স্বাভাবিক] আচরণের [দৃষ্টান্ত] অনুযায়ী বর্ধমানের দিওয়ান মানিক চাঁদ সকালের দিকে বর্ধমানে পলায়ন করেন।[২০] ইতোমধ্যে হঠাৎ করে মারাঠা বাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু করে দেয়। নবাব তাঁর নিজের হস্তীতে আরোহণ করে সেই আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। নবাবের সৈন্যরা এই প্রথমবারের মত মারাঠাদের যুদ্ধপ্রণালি দেখার সুযোগ পায় এবং তাতে অভ্যস্ত না হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিপর্যয় নেমে আসে এবং শত্রু সৈন্য তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মীর হাবিবউল্লাহ খান সিরাজী[২১] নবাব শুজা-উদ-দৌলার সময় থেকেই একজন জমাদার বা ব্যবসায়ী হিসাবে বাংলায় বসবাসরত ছিলেন। তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করতে বিলম্ব করেছিলেন বলে মারাঠারা তাঁকে ঘিরে ফেলে। তিনি দুই কি তিনটি তরবারির আঘাত পান ও ধরাশায়ী হয়ে পড়েন।

মীর হাবিব উল্লাহর অতীত জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ পরলোকগত নবাব আলা-উদ-দৌলার নিহত হওয়ার পরে তিনি (মীর হাবিব) দীর্ঘকাল ধরে নিজেকে তাঁর গৃহের অভ্যন্তরে অন্তরীণ রাখেন। তাঁর মনে নিরাপত্তা ও চরম বিপর্যয়ের ভয় ছিল। শেষ পর্যন্ত নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান তাঁকে নবাব আলিবর্দীর নিকট নিয়ে যান। কিন্তু মীর হাবিব হাজী আহমদের বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতার আশঙ্কায় সব সময়ই আতঙ্কিত

২০। পরবর্তীকালে কলকাতাতে ইংরেজদের সঙ্গে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিবাদের সময় এই মানিক চাঁদ ইংরেজদের ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পলায়ন করেছিলেন। অনুরূপ বীরত্ব প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত এখানেও পাওয়া যাচ্ছে।

২১। মীর হাবিব নামে অধিক পরিচিত এ ব্যক্তি ছিলেন ইরানের শিরাজ নগরের অধিবাসী এবং ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসেন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না কিন্তু অপরিমেয় মেধা ও কর্মদক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি নবাব শুজা-উদ-দৌলার রাজত্বের প্রথম দিকে তাঁর জামাতা ঢাকার নায়েব নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের অধীনে সেনাপতি ছিলেন এবং বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে বলদাখাল পরগনার জমিদার আগা সাদেকের সহায়তায় ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্য জয় করে সেই রাজ্যের নতুন নামকরণ করেন 'রওশনাবাদ'। আজাদ আল-হোসায়নি রচিত "Naubahar-i-Murshid Quli Khani' গ্রন্থে (Bengal Nawabs, by Sir Jadunah Sarkar, PP.4-9) তাঁর সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। পরে তিনি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে উড়িষ্যা যান এবং সেখান থেকে নবাব শুজা খানের সময়ে মুর্শিদাবাদে আসেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হলেও তিনি ছিলেন লোভী ও নীতিজ্ঞানহীন এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি তিনি পান তার নতুন মনিব মারাঠাদের হাতে শোচনীয়ভাবে নিহত হয়ে। তাঁর সম্বন্ধে করম আলী বলেন (য. না. ই ঃ ২৮ পৃঃ) ঃ

Habib-ullah Khan, who accompanied the Nawab in this campaign, by creating a false report of having been slain, had kept himself aloof from the army; he had been from former times an enemy of Alivardi's family. The Marathas carried him off with them." তাঁর সম্বন্ধে রিয়াজে (রিয়াজ-বাঃ ২৬৪ পৃঃ) বর্ণনা আছে ঃ "মুর্শিদকুলী খানের পরাজয়ের পর তার প্রধান সেনাপতি মীর হাবিব রঘুজী ভোঁসলার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বাংলা জয়ের জন্য প্ররোচিত করেন। এই সময় দক্ষিণের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুজী ভোঁসলা বেরার সুবার গভর্নর ছিলেন।"

ছিলেন। দুই বছর পরে মীর্জা বাকের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পর নবাবের সৈন্য ফিরে আসার সময় হাজী আহমদ নবাবকে লিখেছিলেন, "মীর হাবিবের জীবনের সূত্র ছলনার তরবারির কাঁচি দ্বারা ছিন্ন না করা পর্যন্ত সরকারি কাজের সূত্রাবলী সংঘবদ্ধ করা যাবে না।"[২২]

দৈবক্রমে সেই পত্র মীর হাবিবের হাতে পড়ে। তিনি তা গোলাম মোস্তফা খানকে দেখান। তিনিও তখন বেশ ক্রুদ্ধ ছিলেন। কারণ, জয়ন-উদ-দীন খান শুধু সন্দেহবশত জমাদার রওশন খানকে আজিমাবাদে হত্যা করেছিলেন। মোস্তফা খান মীর হাবিবকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে নবাবের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। ঠিক সেই সময় [মারাঠা] শত্রুদের আক্রমণ ঘটে। তিনি মীর হাবিবকে বলেন, "এই সময়ে সৈন্যদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের সঙ্গে প্রতারণামূলক আচরণ করা পৌরুষের পরিচায়ক নয়। মারাঠাদের পরাজিত করার পর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তা কার্যে পরিণত করা হবে।"

সংক্ষেপে বর্ণনা এই যে, সর্বদিক থেকে মারাঠা সৈন্য লুণ্ঠন ও আক্রমণ করতে আসে। সেনাপতিদের মধ্যে মীর মোহাম্মদ জাফর খান, গোলাম মোস্তফা খান, শমশির খান, ওমর খান, সরদার খান, রহীম খান ও অন্যান্যরা যুদ্ধ করার জন্য সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসেন এবং মারাঠা সৈন্যদেরকে বিতাড়িত ও আহত করেন। 'দস্তী তোপ খানার[২৩] দারোগা হায়দর আলী খান সেদিন সীমাহীন বীরত্বের পরিচয় দিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেন।

[বিপর্যস্ত] মারাঠা সেনাপতিগণ নবাবের সেনাবাহিনীর হাতে আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হয়ে এবং তাদের অধিকাংশ সৈন্যকে হত বা আহত দেখে চারদিকে বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত সৈন্যদের একত্র করে নবাবের সেনাবাহিনীর পিছন দিকে অবস্থান গ্রহণ করেন। নবাবের দিশাহারা সৈন্যবাহিনী নিজেদেরকে সংহত করে এবং এক সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটোয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। সেদিন [নবাবের] সৈন্যদের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি ও খাদ্য দ্রব্য শত্রুদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। মাত্র দুই কি তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণকারী কিছু সৈন্য ও পাঁচ কি ছয়শত পদাতিক সৈন্য ছাড়া খাদ্য, বস্ত্র [বা] পরিবহনের মতো আবশ্যকীয় কোনো দ্রব্যই তাদের কাছে ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ করে নবাবের সেনাবাহিনী যাত্রাশেষে সন্ধ্যাকালে পানির ধারে[২৪] আস্তানা গাড়ে। ধনী ও দরিদ্র কারোর জন্য উন্মুক্ত আকাশ ছাড়া আর কোনো

২২। হাজী আহমদের চরিত্রে মহত্ত্ব না থাকলেও দূরদৃষ্টির অভাব ছিল না। তিনি মীর হাবিবকে চিনতে ভুল করেননি।

২৩। 'দস্তী' (دستی) ও 'জিনসী' (جنسی) এই দুই রকমের কামানের অস্তিত্ব তখনকার দিনের গোলন্দাজ বাহিনীতে ছিল বলে দেখা যাচ্ছে। হাতে নিয়ে চালনা করা যায় এমন কামানকে বোধ হয় দস্তী কামান বলা হত আর ভারী কামানগুলিকে বোধ হয় 'জিনসী' কামান বলা হত।

আচ্ছাদন[২৫] এবং ভূমি ছাড়া আর কোনো শয্যা ছিল না। ভাগ্যবান ব্যক্তিদের জন্য সারাদিন ও সারারাতের মধ্যে মাত্র একবার এমন অতিসামান্য কিছু [আহার্য] পাওয়া যায় যা তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এবং [অন্যান্য] সব লোক কলাগাছের খোল[২৬] ও এ জাতীয় বস্তু আহার করে তাদের উদর পূর্তি করে।

এই পঙক্তিগুলির রচয়িতা তার পরলোকগত (পরে) পিতাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য গিয়েছিল[২৭] এবং সে সময়ে সে নবাবের সঙ্গী হয়। [গ্রন্থকারের] স্মরণে আসে, তিনদিনের মধ্যে মাত্র একবার তিন পোয়া ওজনের খিচুড়ি পাওয়া গিয়েছিল এবং তা সাতজনে ভাগ করে খেয়েছিল। অন্য আর একদিন তিনব্যক্তি 'সাকর পারা' নামক এক ধরনের সাতটা মিষ্টি খেয়ে বেঁচে থাকে। তৃতীয় দিন কয়েক ব্যক্তি আধা সের গরুর মাংসের 'কবাব' খেয়ে বেঁচে থাকে[২৮] কাটোয়াতে পৌঁছলে প্রচুর খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে এই আশায় এই অনাহারী মানুষগুলি অতি দ্রুতগতিতে সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেখানকার অবস্থা এই পর্যায়ে এসে পড়ে যে, সেখানে তাদের আগমনের পূর্বেই মারাঠা বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়ে সে স্থান লুণ্ঠন করে এবং যে সব খাদ্যদ্রব্য তাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয়নি সেগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তিন দিন অনাহারে থাকার পর

২৪। ফা. পাঠ ঃ 'কিনার-ই-আব'। (کنار آب)। ফা. আব (آب) শব্দ সাধারণত পানি অর্থে ব্যবহৃত হলেও নদী অর্থেও এর ব্যবহার দেখা যায়। এখানে নদী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বলে মনে হয়। কারণ, কোনো নদীর উল্লেখ বর্ণনায় নেই। খুব সম্ভব কোনো পুকুর বা দিঘির কাছে নবাব আস্তানা গেড়েছিলেন।

২৫। ফারসি ঃ 'সায়া' (سایہ) শব্দের অর্থ ' A shade, shadow; an apparition, a wicked spirit, name of a demon, protection." তা. ই. ৩২ পৃঃ) 'protection অনুবাদ দেওয়া হয়েছে ডক্টর সোবহান কর্তৃক। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দ এখানে 'আচ্ছাদন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৬। স্যার যদুনাথ (১০০ পৃঃ পাদটীকায়) বলেন যে, ফারসি পাঠ ছিল 'saq-i-shajar-i-mauz'। তিনি ফারসি ভাষায় পাঠ দেননি এবং তাঁর প্রদত্ত পাঠের অনুবাদ দিয়েছেন, by eating the stalk of banana plant' অর্থাৎ কলাগাছের কাণ্ড ভক্ষণ করে। ডক্টর সোবহান কর্তৃক প্রদত্ত ফারসি পাঠ ঃ 'বা কুল্লে সাক-ই-শজর-ই-মুইয' (৪১ পৃঃ)(باکل) =The stalk of banana trees'। তিনি অবশ্য সঠিকভাবে ধরেছেন যে, (ساق شجر موز) আরবি 'মোয' = (banana trees) শব্দের পরিবর্তে ভুলবশত এখানে 'মুইয' (موز) শব্দের অপপ্রয়োগ হয়েছে।

২৭। গ্রন্থকারের পিতা গোলাম আলী খান ছিলেন একজন সেনাপতি। 'তিনি কিছুকাল আজিমাবাদের [রাজস্ব] শাসনকর্তার পদে কাজ করেন বলে সিয়ারের বর্ণনায় (সিয়ার-বাঃ ৪৬৬ পৃঃ) দেখা যায়। তিনি আলিবর্দীর সঙ্গে উড়িষ্যা অভিযানে গিয়েছিলেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে খুব সম্ভব মেদিনীপুর-বর্ধমান অঞ্চলে তরুণ গ্রন্থকারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তিনি (গোলাম আলী খান) ১৭৬৩-৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদে মৃত্যুবরণ করেন।

২৮। গ্রন্থকারের এসব বর্ণনা সিয়ারে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এ সম্বন্ধে সিয়ার রচয়িতা বলেন (৪৬৬ পৃঃ) "যে ইউসুফ আলী খাঁ আমাদের জন্য তাঁহার অভিযানের বিশেষভাবে এই বিপদসংকুল প্রত্যাবর্তনের বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই একই ব্যক্তির প্রদত্ত বিশদ বিবরণ সযত্নে লিখিত হইলেও বিশ্বাসের অযোগ্য।"

চতুর্থ দিনে মানুষ ও পশু কাটোয়াতে এসে উপস্থিত হয় এবং পোড়া শস্যকে মধু ও অমৃতের[২৯] মতো [সুস্বাদু জ্ঞানে] আহার করে। কাটোয়াতে পৌঁছার পর নবাব সেখানে আস্তানা গাড়েন এবং তাঁর ভ্রাতা হাজী আহমদ ও নবাব নওয়াজিশ মোহাম্মদ শাহাম্মত জঙকে নিরাপত্তা ও সাবধানতার জন্য পত্র লিখেন। সওলত জঙএর আগেই নবাবের দলের প্রত্যাবর্তনের পথে মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছেছিলেন। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য বস্তু নিয়ে কাটোয়াতে আসার জন্য নবাব তাঁকে আদেশ দেন। দিন কয়েকের মধ্যেই উল্লিখিত নবাব (সওলত জঙ)[৩০] আলিবর্দীর নিকট উপস্থিত হন এবং চারদিক থেকে প্রচুর আহার্য দ্রব্য সেখানে আসতে থাকে এবং তাদের ক্ষুধাকে তৃপ্তিতে রূপান্তরিত করে।

নবাবের বিজয়ী সৈন্যদের[৩১] হাতে তাঁর সেনাবাহিনী যে [প্রচণ্ড] মার খেয়েছে সে কারণ ছাড়াও বর্ষাকাল[৩২] আসন্ন বলে তাঁর পক্ষে বাঙলায় অবস্থান করা কঠিন[৩৩] হবে বিবেচনা করে ভাস্কর পণ্ডিত বীরভূম হয়ে তাঁর নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থ করেন। কিন্তু মীর হাবিব[৩৪] তাঁর পূর্বে উল্লিখিত শত্রুতার কারণে তাঁকে এ কাজে বাধা দিয়ে বলেন, "অর্থ লাভ করাই যদি আপনার লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে আমাকে কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য দিন। মুর্শিদাবাদে কোনো [প্রতিরক্ষা] প্রাচীর বা পরিখা নেই। মহাবত জঙ এখন কাটোয়াতে। আমি জগৎশেঠ ও অন্যান্যের গৃহ লুণ্ঠন করে প্রভূত অর্থ নিয়ে আসি।"

২৯। ফা. 'মান্না ওয়া সলওয়া' (من و سلوی) পাঠের মান্না শব্দের অর্থ হচ্ছে 'honey dew', এক ধরনের মধু এবং সলওয়া শব্দের এক অর্থ 'quails' হলেও আর এক ও প্রধান অর্থ মধু। য. না. (১০০ পৃঃ) 'as if it were honey'। তা.ই 'manna and salwa'। ডক্টর সোবহান অনুবাদ দেননি।

৩০। আলোচ্য গ্রন্থে (৩৩ পৃঃ) শাহাম্মত জঙ (صولت جنگ)' 'Shahammat jang' এই পাঠ ভুল। মূল ফা. পাঠে (৪২ পৃঃ) 'সওলত জঙ' আছে।

৩১। ফা. 'আয গাযীয়ান-ই-ফিরোজী নিশান' (از غازیان فیروزی نشان) পাঠের ইংরেজী অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থ (৩৩ পৃঃ) মতে 'The Bengal army' এবং স্যার যদুনাথের (১০০ পৃঃ) মতে 'Our Ghazis'। যে সৈন্যদল মারাঠাদের আক্রমণে বন্দুক কামান, তাঁবু এমন কি রসদ পর্যন্ত মারাঠাদের অধিকারে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে কাটোয়া এসে পৌঁছেছিল সে বাহিনীকে 'বিজয়ী বাহিনী' বলা যে চাটুকারিতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ, এস. এর The Bengal army পাঠ ভাবানুবাদ এবং য. না. র পাঠ ও তা-ই।

৩২। ফা. পাঠ 'আয়াম-ই-বর্শাকাল' (ایام برشاکال) অর্থাৎ বর্ষাকাল। 'বর্ষা' শব্দ স্থানীয় ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। বর্ষাকাল শব্দ ফারসি ভাষায় নেই।

৩৩। ফা. পাঠ ঃ 'দশোয়ার' (دشوار) শব্দের সঠিক অর্থ কঠিন এবং এ. এস. কর্তৃক প্রদত্ত 'embarassing' নয়। স্যার যদুনাথের (১০০ পৃঃ) 'difficult' পাঠ সঠিক।

৩৪। এ সম্বন্ধে সিয়ারে আছে (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড ৪৬৩ পৃঃ) ঃ "আলিবর্দী যাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকায় তিনি (মীর হাবিব) ইতোপূর্বেই শত্রু পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করেন এবং দল ত্যাগের জন্য শুধু অনুকূল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।"

ভাস্কর তাঁর উপদেষ্টার (মীর হাবিব) কথা মেনে নিয়ে তাঁকে কয়েক হাজার সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য দেন। এ সংবাদ পেয়ে এ ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সঙ্গত মনে করে এবং মুর্শিদাবাদ নগরে কোনো সুরক্ষিত দুর্গ, পরিখা বা কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না বলে নবাব দ্রুতবেগে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন্। মুর্শিদাবাদে তাঁর আগমনের একদিন আগে মারাঠা বাহিনী সেখানে পৌঁছে এবং জগৎশেঠের গৃহ লুণ্ঠনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তারা নগদ তিন লক্ষ টাকা ও অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে যায়। তারা নগরের আরও কয়েকটি গৃহে হামলা করে। মীর হাবিব তাঁর ভাই মীর শরিফকে তাঁর গৃহ থেকে নিয়ে যান। হাজী আহমদ খান, শাহামত জঙ ও আতাউল্লাহ্ খান তাঁদের নিজ নিজ স্থানে ক্ষুদ্র একেক দল সৈন্য নিয়ে শক্ত অবস্থায় ছিলেন বলে মীর হাবিব সে সব স্থানে আক্রমণ করেন নি।[৩৫] নবাব আলিবর্দী খান এখানে আসবেন, এ সংবাদ পাওয়া মাত্র মারাঠারা [দ্রুতগতিতে] পলায়ন করে। নবাব শেষ রাতের দিকে মুর্শিদাবাদে পৌঁছেন। তার আগের দিনই মারাঠারা লুণ্ঠন কার্য সমাধা করে পলায়ন করে। নবাব রাজ্যের বিভিন্ন অধিবাসীকে বিভিন্ন পারিতোষিক ও অনুগ্রহ দান করেন এবং সেনাদল ও জনসাধারণ সবার কাছেই তিনি সাহায্যের উৎস বলে বিবেচিত হন।

মীর হাবিব মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করে সমৃদ্ধ[৩৬] হয়ে নিরাপদে ভাস্করের নিকট ফিরে যান এবং দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করার [পরিকল্পনার] জন্য ভাস্করকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করেন। বাঙলা অভিযানের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে মীর হাবিব ভাস্করকে [দেশে প্রত্যাবর্তন করার] পথ থেকে পুনরায় কাটোয়া অভিমুখে অগ্রসর হতে বাধ্য করেন। নবাব এই সংবাদ পান। কিন্তু এ বছর মারাঠাদেরকে বাঙলার মাটি থেকে উচ্ছেদ করা তাঁর কাছে সম্ভবপর বলে মনে হয় নি। আগত-প্রায় বর্ষা ঋতু ছাড়াও নবাবের সৈন্য সংখ্যা ছিল অল্প এবং তারাও এক বছর ধরে যুদ্ধ ও অভিযান চালিয়ে আহত ও ক্লান্ত ছিল। অতএব মুর্শিদাবাদ নগরের রক্ষা ও নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে নবাব আমানিগঞ্জ[৩৭] ও তারকপুরে ছাউনি ফেলেন। মারাঠারা দু-একবার পলাশী ও দাউদপুর পর্যন্ত এসে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে কাটোয়া ফিরে যায়। মাসখানেক পরে ভাগীরথী

৩৫। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৪৭৪-৭৫ পৃঃ) এবং রিয়াজেও (রিয়াজ-বাঃ ২৬৮ পৃঃ) আছে। এ সম্বন্ধে রিয়াজে আছে (২৬৮ পৃঃ) ঃ "সমস্ত মালমাত্তাসহ মীর হাবিবের ভ্রাতা মীর শরীফ তাঁর পরিবারবর্গ ও লোকজনসহ মুর্শিদাবাদে ছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করার জন্য মীর হাবিব সাত শত মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যসহ অতর্কিতে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করতে সাব্যস্ত করেন। .... জগৎশেঠের বাড়ি লুট করে যতটা পারে স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগ্রহ করে।" এই গ্রন্থে এই অঞ্চলে লুটপাটের আরও বিশদ বর্ণনা আছে। তা. বা. তে (১৬০-১৬১ পৃঃ) অনুরূপ বর্ণনা আছে।

৩৬। ফা. পাঠ ঃ 'ঘনামা ও সালমা' (غانما , سالما) = 'rich and safe'.

৩৭। আমানিগঞ্জ ও তারকপুর মুর্শিদাবাদ নগর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত।

নদীর পানি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে নগরে নদী পার হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে[৩৮] যায় এবং কাটোয়া ভাগীরথী নদীর অপর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বিধায় মারাঠা সৈন্যরা এদিকে আসা বন্ধ বা সংক্ষিপ্ত করে [কাটোয়ার] নিকটবর্তী গ্রামসমূহে তাদের অত্যাচারের হাত প্রসারিত করে।

[কাটোয়া] থেকে মারাঠাদের এক বাহিনী হুগলীতে অগ্রসর হয়ে সেখানকার নবাবের প্রতিনিধি ও মীর্জা প্যারন নামে অধিক পরিচিত মীর্জা মোহাম্মদকে[৩৯] গ্রেফতার করে এবং তাঁকে মারাঠাদের পক্ষ থেকে হুগলী ও হিজলীর শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। বর্ধমান চাকলার সমগ্র অঞ্চল মারাঠাদের অধিকারে আসে এবং মেদিনীপুর থেকে বালেশ্বর পর্যন্ত সমুদয় স্থানে তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। মেদিনীপুরের ফৌজদার মীর কলন্দর[৪০] কোনও প্রকারে নিজেকে সেই বিপদ থেকে মুক্ত রাখেন এবং [রাজ্যের] কোনো এক [নিরাপদ] কোণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কটক সুবার নায়েব নাজিম শেখ মা'সুম মারাঠাদের আগমনের কারণে কটক পরিত্যাগ করে নদী পার হয়ে অপর তীরবর্তী এক নিরাপদ স্থানে চলে যান। বীরভূম জেলা, রাজশাহীর অধিকাংশ পরগনা এবং আকবর নগর (রাজমহল) শহরও মারাঠাদের অধিকারে আসে। একমাত্র মুর্শিদাবাদ ও গঙ্গার অপর তীরবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ জাহাঙ্গীরনগর ও রংপুর প্রভৃতি স্থান ছাড়া নবাবের কর্মকর্তাদের অধিকারে আর কিছুই থাকে নি।

মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা সুদীর্ঘকালের মধ্যে এ ধরনের বিপদের মুখ কোনোদিন দেখেনি, এমনকি কোনোদিন শুনেনি। এই নগরের চারদিকে [প্রতিরক্ষামূলক] কোনো দুর্গ বা পরিখা না থাকার কারণে নগরের অধিবাসীরা এই কয়েক মাস বর্ষাকাল হওয়া সত্ত্বেও চরম বাধ্যতামূলক এবং অসহায় অবস্থায় নৌকায় আরোহণ করে তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে নদীর অপর তীরে অবস্থিত স্থানসমূহ যেমন জাহাঙ্গীরনগর, মালদহ, রংপুর প্রভৃতি স্থানে চলে যান।[৪১] এমন কি নবাব শাহামত জংও নদীর অপর

৩৮। ফারসি 'পাইয়াব' (پایاب) শব্দ এখানে আছে। এর অর্থ fordable অর্থাৎ পায়ে হেঁটে নদী অতিক্রম করার মতো অবস্থা। পানি বৃদ্ধির ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়।

৩৯। সিয়ারের মতে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড ৪৭৬ পৃঃ) হুগলীর এই শাসনকর্তা ছিলেন আলিবর্দীর 'বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মদ ইয়ার খান'। কিন্তু তিনি মারাঠাদের অধীনে চাকুরি করেছিলেন, এই উল্লেখ সেখানে নেই। রিয়াজের মতে (রিয়াজ-বাঃ ২৬৯ পৃঃ) হুগলীর ডিপুটি ফৌজদার ছিলেন মীর মুহম্মদ রেজা। রিয়াজে হুগলী অধিকার ও সেখানে মীর হাবিব কর্তৃক মারাঠাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তা. বা. তে (১৬০ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

৪০। মীর কলন্দর সম্বন্ধে বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-বাঃ ৪৭৭ পৃঃ) আছে।

৪১। বর্গী নামে অধিক পরিচিত এই মারাঠা দস্যুদের সীমাহীন ও অকথ্য অত্যাচারের ভয়ে মুর্শিদাবাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অসংখ্য লোক গঙ্গার অপর তীরে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানে চলে গিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। যাঁরা যেতে পারেন নি এবং তাঁরাই সংখ্যায় অধিক–তাঁরা মারাঠাদের অত্যাচার সহ্য করেন।

তীরে অবস্থিত এবং মুর্শিদাবাদ থেকে একদিনের পথ [রাজশাহীর] গোদাগাড়িতে[৪২] চলে যান। সেখানে বসতি স্থাপন করে তিনি সে স্থানের নাম রাখেন ভাগনগর এবং সেখানে তাঁর স্ত্রী ও পরিবার-পরিজন নিয়ে বাস করতে থাকেন। কিছুদিন পরে নিজ কর্মের এই নীচতায় লজ্জিত হয়ে তিনি তাঁর কয়েকজন প্রিয় রমণীকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। নবাব আলিবর্দীর আসবাব ও মালপত্র সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল।[৪৩]

বর্ষার এই কয়েক মাস সময় নবাব আলিবর্দী খান তাঁর সেনাবাহিনীর মন জয় করার জন্য তাঁর মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতে তিনি তাঁর সৈন্যদের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসাবে বিতরণ করেন। এসব দান ও অন্যান্য পারিতোষিকের মাধ্যমে তিনি সৈন্যদের মনে তাঁর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বীজ বপন করেন।

৪২। শাহাম্মত জঙ্গ রাজশাহীর গোদাগাড়ি অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে সেখানে একটি মাটির দুর্গ নির্মাণ করেন। রাজশাহী নগরী থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত সেই মাটির দুর্গ এখন (১৯৯৬ খ্রিঃ)নদীর ভাঙ্গনে বিলুপ্ত প্রায়।

৪৩। গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদে মারাঠাদের বাঙলা ও উড়িষ্যা অধিকার সম্পর্কে সত্য কথাই বলেছেন। মুর্শিদাবাদ নগর ও ভাগীরথী ও পদ্মার অপর তীরে অবস্থিত অঞ্চল ছাড়া নবাবের অধিকারে যে বাঙলার অন্য কোনো অঞ্চল ছিলনা গ্রন্থকারের বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়।

দশম অধ্যায়

ভাস্করকে বহিষ্কার করার জন্য আলিবর্দীর অভিযান ও তাঁর সমর্থনে সফদর জঙের আগমন

আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎসাহের কারণে[১] বর্ষাকাল অবসানের জন্য অপেক্ষা না করে দশহরার[২] আগেই বিজয়ী বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে দস্যু-দুশমনদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে নবাব আলিবর্দী খান অভিযানে অগ্রসর হন। ভাস্করের কাটোয়াতে অবস্থানরত থাকার কারণে সেখানে নদী অতিক্রম করা যুক্তিসঙ্গত মনে না করে নবাব পলাশী অতিক্রম করে কাটোয়া থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে ভাগীরথীর অপর তীরে থেমে সেখানে নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করে অগ্রসর হয়ে কাটোয়া থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত অজয় নদীর তীরে রাজসিকভাবে উপস্থিত হন।[৩] [বন্যাহেতু] নদী পানিতে পরিপূর্ণ থাকার কারণে[৪] নবাবের কর্মচারীরা সেখানেও একটি সেতু নির্মাণ করেন।[৫] এই সেতু নির্মাণের পর সেনাপতিদের মধ্যে মীর মোহাম্মদ জাফর খান, হায়দর আলী খান, গোলাম মোস্তফা খান, শমশির খান, সরদার খান ও রহম খান প্রমুখকে রাতের অন্ধকারে সেতু অতিক্রম করার আদেশ প্রদান করা হয় যাতে শত্রুরা নদী অতিক্রম করা সম্বন্ধে কিছু জানতে এবং আক্রমণ করতে না পারে। এই আদেশের কারণে প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী নদী অতিক্রম করতে শুরু করে। অধিকাংশ সেনাপতি [তাঁদের সেনাবাহিনীসহ] নদী অতিক্রম করেন।

১। ফা. 'ব-হুকম-ই-গায়রত-ই-আযলি' (بحکم غیرت ازلی) পাঠের অর্থ আলোচ্য গ্রন্থে (৩৬ পৃঃ) মতে ঃ 'by his traditional sense of honour'। এই পাঠ সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। শব্দ আল্লাহ্ বা (ازلی) শব্দের অর্থ 'by sense of honour' হতে পারে। কিন্তু (غیرت) 'existing from eternity'-কে বোঝানো। অতএব আমাদের (উপরে) দেওয়া অর্থ সঠিক বলে মনে হয়। স্যার যদুনাথ এই শব্দগুলির অনুবাদ দেননি।

২। ফা. 'দশহরা' (دشهرا) বলতে খুব সম্ভব বাংলা আশ্বিন মাসে উদিত চাঁদের দশ তারিখে হিন্দুদের দুর্গা পূজার প্রতিমা বিসর্জনের দিনকে বোঝান হয়েছে। স্যার যদুনাথের মতে এই দিন ছিল ২৭শে অক্টোবর ১৭৪২ খ্রিঃ।

৩। ফা. 'নযুল-ই-আজলাল ফরমুদ' (نزول اجلال فرمود) 'alighted majestically'। স্যার যদুনাথ এই শব্দগুলির অনুবাদ দেননি।

৪। ফা. 'তেলিয়ান দাশ্ত্' (طلیان داشت) 'was in flood.'

৫। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-বা ১ম খন্ড ৪৮৫ পৃঃ) আছে। রিয়াজের (রিয়াজ-বাঃ ২৭০ পৃঃ) বর্ণনায় আছে ঃ "জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), জলঙ্গী, মালদহ, আকবরনগর (রাজমহল) প্রভৃতি স্থান থেকে অসংখ্যক নৌকা আমদানি করে মহবত জং কাটোয়া যাওয়ার পথ তৈরি করেন। ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে পুল তৈরি করার জন্য তিনি বার হাজার লোককে আলাদা নিযুক্ত করেন....।" সেতু নির্মাণের প্রায় অনুরূপ বর্ণনা তা. বা. তেও (১৬২ পৃঃ) আছে।

সেতুর উপরে তখনও অনেক লোক ছিল। সেখানে অধিক লোক সমাগম ও তাদের মধ্যে হুড়াহুড়ি এবং পশুদের (হাতি ঘোড়া ইত্যাদি) সেতু অতিক্রম ইত্যাদি কারণে সেতুর রশি ছিন্ন হয়ে যায় এবং কয়েকটা নৌকা একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকারে কিছুই দেখা না পাওয়ার কারণে এবং লোকগুলি অতি দ্রুতগতিতে কোনো দিকে না তাকিয়ে সেতু অতিক্রম করছিল বলে যারা সেতুর বিচ্ছিন্ন অংশে পৌছল তারা সবাই পানিতে পড়ে গেল। এভাবে ছয় কি সাত শ' এমনকি তারও অধিক লোক পানিতে ডুবে গেলে কেয়ামতের দিনের মতো এক অতি অসাধারণ আর্ত চিৎকার শোনা গেল। তখন অবশিষ্ট যেসব লোকের আয়ু তখনও শেষ হয় নি তারা সাবধান হয়ে গেল।[৬] বেলদার কর্মী ও অন্যান্যরা [তৎক্ষণাৎ] সেতু মেরামতের কাজে লেগে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তা ঠিক করে ফেলল। পরদিন প্রভাতে নবাব তাঁর অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে সেতু পার হন।

ভাস্করের সঙ্গে প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও [নবাবের] সৈন্য দলের নদী অতিক্রম করার সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি ভয় ও ভীতিতে অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বিপর্যস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় [তাঁর আস্তানা থেকে] এমন অবস্থায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন যে, তাঁর সৈন্যরা সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় যেসব দ্রব্য ও ব্যবহারের বস্তু হাতের কাছে পেয়েছিল সেগুলিই সঙ্গে করে নিয়ে গেল এবং অবশিষ্ট সব কিছু যেখানে তারা ছিল সেখানেই পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল।[৭] নবাব ভাস্করের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং কাটোয়া থেকে দুই ক্রোশ দূরে তিনি প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হন। সেখানে যে যুদ্ধ হয় তাতে ভাস্করের অধীনস্থ বহুসংখ্যক লোক ভূপাতিত হওয়ার ফলে সেখানে অধিকক্ষণ টিকে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি পাচেট[৮] গিরিপথের দিকে অগ্রসর হন। বর্ধমান, হুগলী, হিজলী ও অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর যে সব সৈন্য বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল তারা ভাস্করের সংবাদ শ্রবণ করে সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা হয়ে সবাই পলায়নের পথ বেছে নিল। নবাব তাদের পশ্চাদ্ধাবণে বিরত না হয়ে পাচেটের অরণ্যে প্রবেশ করেন। দুই বাহিনী এক মঞ্জিলের কম দূরত্বের ব্যবধানে পথ চলতে থাকে। কয়েক মঞ্জিল পরে নবাব এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হন যে ঝোপঝাড়ের [ঘনত্বের] জন্য সেখানে পিঁপড়া ও সাপের পক্ষেও হামাগুড়ি দিয়ে চলা কঠিন ছিল। অরণ্যের গাছের ঘনত্বের কারণে দু'জন অশ্বারোহীরও পাশাপাশি চলা সম্ভব ছিল না। শত্রুপক্ষের সৈন্য দলের কথা দূরে থাক, নবাবের পক্ষে নিজ সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল।[৯]

৬। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারে (সিয়ার-বাঃ ৪৮৫ পৃঃ), রিয়াজ (রিয়াজ-বাঃ ২৭১ পৃঃ) ও তা. বা. (১৬২-৬৩ পৃঃ)তেও আছে।

৭। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ার (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড, ৪৮৬ পৃঃ) মোজাফফরনামা (য. না. ২৯-৩০ পৃঃ) ও রিয়াজেও (রিয়াজ-বাঃ ২৭২ পৃঃ) আছে। 'তারিখ-ই-বঙ্গালা' (তা. বা. ১৬৩-৬৪ পৃঃ)-তেও সংক্ষেপে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

৮। পাচেট (پاچت) খুব সম্ভব বর্তমান বর্ধমান জেলার পশ্চিমে ছোট নাগপুরের বনাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সিয়ার (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড ৪৮৮ পৃঃ) ও মোজাফফর নামাতে (য. না. ৩০ পৃঃ) এই ঘটনার বর্ণনা আছে। শেষোক্ত গ্রন্থের বর্ণনা বেশ সংক্ষিপ্ত কিন্তু সিয়ারের বর্ণনা বেশ বিস্তারিত।

৯। মারাঠাদের যুদ্ধের রীতি ছিল সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ ও লুঠতরাজ করা এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বেকায়দায় পড়লেই পলায়ন করা। এক্ষেত্রেও তা.ই ঘটেছিল। কিন্তু প্রভুভক্ত ইউসুফ আলী খান মারাঠাদের সেই পালিয়ে যাওয়াকেই আলিবর্দীর বিজয় বলে সগর্বে উল্লেখ করে প্রভুকে বাহবা দিয়েছেন। অথচ সেই মারাঠা বাহিনীই যে অন্যত্র আলিবর্দীর নায়েব নাজিমকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেছেন সে কথা উল্লেখ করলেও প্রভুর প্রশংসায় পঞ্চমুখই রয়ে গেছেন।

অরণ্য অতিক্রম করে নিজ রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছতে অসমর্থ হয়ে ভাস্কর নিজেও প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন এবং মীর হাবিবের পরামর্শে বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে চন্দনগড়ের জঙ্গলে গিয়ে মেদিনীপুরে উপস্থিত হয়ে কটক থেকে শেখ মাসুম খানকে বিতাড়িত করার জন্য সেখানে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। শেখ মাসুম খান সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে জাজনগরে অবস্থানরত ছিলেন। ভাস্কর প্রেরিত সৈন্যদল শেখ মাসুমকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। তিনি বীরত্বের সঙ্গে সেই আক্রমণের মোকাবিলা করেন ও যে সামান্য ক'জন সৈনিক তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদত বরণ করেন।[১০]

গুপ্তচরের মাধ্যমে ভাস্করের মেদিনীপুর গমনের সংবাদ পাওয়ার পর নবাব [পাচেটের অরণ্য থেকে] কঠিন জঙ্গল অতিক্রম করে তাঁর প্রত্যাবর্তনের ছায়া বর্ধমানে ফেলেন এবং সেখান থেকে ভাস্করের পশ্চাদ্ধাবন করে তিনি মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। নবাব মেদিনীপুরের কাছাকাছি স্থানে উপনীত হলে ভাস্কর কাটোয়া থেকে যেভাবে পলায়ন করেছিলেন ঠিক তেমনি পুরাপুরি বিশৃঙ্খল ও দিশাহারা অবস্থায় পুনরায় মেদিনীপুর থেকে বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন। ভাস্করকে কোনো স্বস্তি না দিয়ে নবাব তাঁর বাহিনী নিয়ে দ্রুতগতিতে তাঁর পিছনে ধাওয়া করতে থাকলে মেদিনীপুর থেকে দুই ক্রোশের মধ্যে ভাস্কর রুখে দাঁড়ান। এদিক থেকে [নবাবের] বিজয়ী বাহিনী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সেই যুদ্ধে এই পক্ষের কিছু ও অপর (ভাস্কর) পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হলে আরও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো শক্তি না থাকার কারণে ভাস্কর পালিয়ে যান। ভাস্করের কটক না যাওয়া এবং সেখানে কটকের অরণ্যাঞ্চলে উপনীত হয়ে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে তাঁর নিজ রাজ্যের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত নবাব তাঁর পশ্চাদ্ধাবনে ক্ষান্ত হননি।[১১] তাঁর নিজ রাজ্য থেকে পরাজিত শত্রুকে (ভাস্কর) বিতাড়িত করে নবাব বিশ্বস্ততা (নিমকহালালি) ও বন্ধুত্বের ('রফাকাত') জন্য

১০। উড়িষ্যার নায়েব নাজিম.শেখ মাসুমের সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধের কথা সিয়ারে (সিয়ার-বা, ১ম খন্ড ৪৮৯ পৃঃ) আছে। এবং তারিখ-ই-বঙ্গালায় (১৬৪ পৃঃ) আছে। রিয়াজের (রিয়াজ-বাঃ ২৭২ পৃঃ) বর্ণনা তা. বা. র বর্ণনার প্রায় অনুরূপ। রিয়াজে আছে ঃ "উড়িষ্যার ডেপুটি নাজিম শেখ মুহম্মদ মাসুম শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য কটক থেকে অগ্রসর হয়ে তাদের অগ্রগতিতে বাধা দেন।....জমিদারগণ ডেপুটি নাজিমের পক্ষ ত্যাগ করা সত্ত্বেও তিনি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের এক ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে নির্ভীকভাবে যুদ্ধে অটল রইলেন। মারাঠা সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল বেশুমার। তারা....তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করে।"

১১। ভাস্কর পণ্ডিত শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেলেও আলিবর্দী যে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারেন নি তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। অথচ গ্রন্থকার কারণে-অকারণে আলিবর্দীকে প্রশংসা করেই যাচ্ছেন। সিয়ার, রিয়াজ এবং তারিখ-ই-বঙ্গালাতেও এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে তবে এত চাটুকারিতা নেই।

প্রাণ দানকারী শেখ মোহাম্মদ মাসুমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ও গোলাম মোস্তফা খানের সুপারিশে নবাব শেখ মাসুমের ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রসুল খানকে কটকের নায়েব নাজিমের পদে নিযুক্ত করেন।[১২]

সফদর জঙের[১৩] অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ সম্রাটের আদেশে সফদর জঙ নবাবকে সাহায্য করার উপলক্ষে অযোধ্যা সুবা থেকে অগ্রসর হয়ে আজিমাবাদে তাঁর ছায়া ফেলেন। নগরের অধিবাসীদের সঙ্গে তিনি অতিশয় অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আচরণ করেন। [আজিমাবাদের শাসনকর্তা] জয়ন-উদ্-দীন খান তখন মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁর চাচার (নবাব আলিবর্দী খান) সঙ্গে ছিলেন। বন্ধুত্ব ও শিষ্টাচারের নিয়ম লংঘন করে তিনি জয়ন-উদ-দীন আহমদের কয়েকটি ধাতু নির্মিত কামান ও কয়েকটি উৎকৃষ্ট হস্তী অধিকার করেন।[১৪]

এর পরে এই অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ আজিমাবাদের উপশাসনকর্তার[১৫] পত্রাদির মাধ্যমে নবাবের গোচরীভূত হয়। নবাব তাঁর (সফদর জঙ) এই আচরণকে ঐক্য ও বন্ধুত্বের পরিপন্থী বলে মনে করেন এবং কারোর সাহায্য ছাড়াই নবাব ভাস্করকে চরমভাবে পরাভূত করেছেন বলে [জানিয়ে] সফদর জঙকে আর অধিক অগ্রসর হতে নিষেধ করার জন্য অনুরোধ করে সম্রাটের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।

১২। এই বর্ণনা সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থেও আছে এবং প্রায় তিন বছর ধরে যে যুদ্ধ চলে তার মোটামুটি বিশদ বর্ণনা রিয়াজে (রিয়াজ-বাঃ ২৭২-৭৩ পৃঃ) আছে। আবদুর রসুল ছিলেন মোস্তফা খানের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার সম্পর্কে পরে বর্ণনা আছে।

১৩। সফদর জঙ (صفدر جنگ) শব্দের অর্থ হচ্ছে সংগ্রামে কঠিন স্তম্ভ। এই ব্যক্তি ছিলেন অযোধ্যা সুবার শাসনকর্তা প্রতাপশালী সাদত খানের জামাতা ও উত্তরাধিকারী। মারাঠাদের প্রতিহত করার জন্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্যের আবেদন করলে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্‌র আদেশে সফদর জঙ ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে ১০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আজিমাবাদে (পাটনা) আসেন এবং সেখানে আগমনের পর থেকেই অশোভনীয় ও আপত্তিজনক আচরণ করতে থাকেন। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-বা, ১ম খন্ড, ৪৯৪-৯৬ পৃঃ) বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

১৪। এই সম্বন্ধে সিয়ারের (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৪৯৬-৯৮ পৃঃ) বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খানের পিতা সৈয়দ হেদায়েত আলী খান প্রায় বিনা কারণে এতে জড়িত হয়ে পড়েন এবং পরে আলিবর্দী খানের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়।

১৫। আজিমাবাদের নায়েব-নাজিম জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান তখন তাঁর চাচা ও শ্বশুর আলিবর্দীর সঙ্গে মারাঠাদের বিরুদ্ধে উড়িষ্যা অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন তবতবায়ীর পিতা সৈয়দ হেদায়েত আলী খান জয়ন-উদ-দীনের প্রতিনিধি হিসাবে বিহার সুবার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তখন সফদর জঙের আপত্তিজনক ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট বিরক্ত হন এবং আলিবর্দীর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আলিবর্দী ও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য ঘটে। সিয়ারে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৪৯৭-৯৮ পৃঃ) এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। পরবর্তীকালে সৈয়দ হেদায়েত আলী খান সম্রাট আহমদ শাহ্ (শাহ্‌জাদা আলী গওহরের) উজীরের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

[সম্রাট] মোহাম্মদ শাহ্ সফদর জঙের নামে একখানা ফরমান প্রেরণ করেন এবং তা প্রাপ্তির পর সেই দেশে (আজিমাবাদ) থাকা বাঞ্ছনীয় মনে না করে সফদর জঙ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৬]

মঞ্জিলের পর মঞ্জিল ও দিনের পর দিন পথ অতিক্রম করে সাফল্য ও বিজয়ের গৌরব নিয়ে নবাব নিরাপদে ও সগৌরবে কটক থেকে মুর্শিদাবাদে পৌছেন এবং তাঁর আগমনে রাজধানী নগরের জাঁকজমক 'ফেরদৌসের' (স্বর্গের) ঈর্ষার বস্তু হয়ে পড়ে। সম্রাটের রাজ্যের স্তম্ভ আলিবর্দীর বিজয় এবং দেশ ও জাতির শত্রুর পরাজয় ও হতাশার সংবাদ ক্রমাগতই সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্র গোচরিভূত হতে থাকে। সম্রাট আলিবর্দী খানের অপরিবর্তনীয় আনুগত্য[১৭], বিশ্বস্ততা[১৮], সাহসিকতা[১৯] ও বীরত্বের[২০] জন্য প্রশংসাবাণী অনুমোদন করেন এবং তাঁকে 'হোসাম-উদ-দৌলা'[২১] উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দান করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে একটি তরবারি, মণিমুক্তাখচিত একটি খঞ্জর (ছোরা), একটি মুক্তার মালা, একটি সরপেচ[২২] ও একটি বিশেষ খিলাত[২৩] প্রদান করে তাঁর অস্তিত্বকে সম্মানিত করেন।

নবাবের অনুরোধে একই সময়ে শাহামত জঙকে 'ইহ্তি শাম-উদ-দৌলা'[২৪], সওলত জঙকে 'মহাম-উদ্-দৌলা[২৫] হয়বত জঙকে 'ইহ্তিরাম-উদ-দৌলা'[২৬] ও আতাউল্লাহ্ খান সাবিত জঙকে 'ইজাজ-উদ্-দৌলা'[২৭] উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয় এবং গোলাম মোস্তফা খানকে তিন হাজার মনসবদারি প্রদান এবং 'খানী ও বাহাদুর'[২৮] উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

১৬। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-বা ১ম খণ্ড, ৪৯৭-৯৮ পৃঃ) বিস্তারিত বর্ণনা আছে।
১৭। মূল ফা. পাঠ 'রসুখ' (رسوخ) 'constancy'।
১৮। " " " 'ফিদুওরিত' (فدوریت) 'devotion'।
১৯। " " " 'তহুর' (تهور) 'bravery'।
২০। " " " 'শুজা' আত' (شجاعت) 'bravery'।
২১। 'হোসাম-উদ-দৌলা' (حسام الدوله) 'the sword of the kingdom' অর্থাৎ রাজ্যের তরবারি।
২২। 'সরপেচ' (شرپیچ) মণিমুক্তা খচিত মূল্যবান শিরস্ত্রাণ।
২৩। 'খিল-আত-ই-খাস' (خلعت خاص) বিশেষ পরিচ্ছদ।
২৪। 'ইহ্তিশাম-উদ-দৌলা' (احتشام الدوله) the grandeur of the kingdom=রাজ্যের আড়ম্বর।
২৫। 'মহাম-উদ-দৌলা' (مهام الدوله) 'business of the kingdom'= রাজ্যের কার্যাবলী।
২৬। 'ইহ্তিরাম-উদ-দৌলা' (احترام الدوله) 'the honour of the kingdom'=রাজ্যের সম্মান।
২৭। 'ই যায্-উদ-দৌলা' (اعزاز الدوله) 'the pride of the country'=রাজ্যের গৌরব।
২৮। 'খিতাব-ই-খানী ওয়া বাহাদুর' (خطاب خانی و بهادر) the a tittle of khani and bahadur.।

'একাদশ অধ্যায়

ঘটনার সন-তারিখ প্রদানে অক্ষমতার জন্য গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ

এ পর্যন্ত নবাব আলিবর্দী খান সম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সবই মাস ও সন তারিখ সংবলিত। নবাবের পরবর্তী রাজত্বকালে যা ঘটেছে এবং যেসব যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে কালের বিবর্তনে ও [আমার] মানসিক বিপর্যয়ের কারণে সেগুলির সন-তারিখ আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে এবং এর কারণ হচ্ছে কালের পরিবর্তন ও আমার জীবনের দুঃখময় অনেক ঘটনা। সে কারণে নবাবের রাজত্বকালের কোনো প্রবীণ ও বিশ্বস্ত সচিবের সন্ধানে ছিলাম যিনি তাঁর (নবাব) জীবনের কোনো গোপন সংবাদ সরবরাহ করতে পারেন। যদি এ ধরনের কোনো ব্যক্তি পাওয়া যেত তবে তাঁর [দেওয়া] তথ্যের ভিত্তিতে [অধিকতর] বিস্তারিত বর্ণনা আমি দিতে পারতাম। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। ফলে এ গ্রন্থ রচনার কাজ বহুকাল ধরে অসমাপ্ত থাকে।[১] কালের বিবর্তন হেতু ১১৭৭ হিজরী (১৭৬৩-৬৪ খ্রিঃ) সনে আমি নবাব আলী জাহ্[২]-র সঙ্গে এলাহাবাদে ছিলাম। তখন সবে মাত্র সেই নগরে আল্লাহ্‌র রহমতে আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। সুদীর্ঘ দু'বছর ধরে ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকার ফলে নবাবের সহচরদের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার শক্তি আমার ছিল না। কারণ, চিকিৎসার জন্য আমাকে এলাহাবাদে থেকে যেতে হয়েছিল। রোগের কষ্ট ছাড়াও আমার রাত ও দিন কাটছিল কঠিন বেদনা, ব্যাধি, নিঃসঙ্গতা ও স্বদেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতার মধ্যে।

১। এই গ্রন্থ ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল বলে বলা হলেও এর রচনার সঠিক তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এ কাজ যে আদৌ সমাপ্ত হয় নি তা বোঝা যায় গ্রন্থটির অসমাপ্ত অবস্থা দেখেই। এই গ্রন্থ (বিশেষ করে এখান থেকে পরবর্তী অংশ) যে ১৭৬৩-৬৪ খ্রিষ্টাব্দের পরে লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যায়।

২। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বিরোধের ফলে তাদের সঙ্গে নবাব মীর কাসেমের যুদ্ধ বাধে। সেই সব যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নবাব মীর কাসিমকে নিজ রাজ্য ছেড়ে এলাহাবাদে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর রাজ্য আর ফিরে পান নি। তার পলায়নের সময় গ্রন্থকার তাঁর বৃদ্ধ ও অসুস্থ পিতা গোলাম আলীকে নিয়ে নবাবের অনুগামী হয়েছিলেন। ১৭৬৩-৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদে গ্রন্থকারের পিতা মারা যান।

নবাব মীর কাসিম আলী যাহ্ নামে পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থকার ছিলেন তাঁর ভক্ত এবং এ কারণে নবাব মীর জাফরের শত্রু।

নিজেকে ব্যস্ত রাখার অভিপ্রায়ে আমি পাগলের মতো কোনো না কোনো কাজে প্রত্যেকটি ঘন্টা, প্রত্যেকটি মুহূর্ত নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমার উদ্ভ্রান্ত মন কিছুতেই শান্তির সন্ধান পাচ্ছিল না। অত্যধিক দুঃখ ও অতিশয় বাধা-বিপত্তি আমাকে জলজ প্রাণী কুতরুবের মতো অস্থির করে ফেলেছিল।[৩] অতীতের তথ্য ও সংবাদ আহরণে আমার মন উতলা হয়ে পড়লে এগুলি একটি আরবি প্রবাদের কথা আমার মনে এনে দিতে লাগল এবং সেই প্রবাদ হচ্ছেঃ "কোনো কিছু পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় না বলেই সেটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।"[৪]

[আমার মনে হল যে,] নবাবের অবশিষ্ট ইতিহাস সংগ্রহ ও রচনা করা আবশ্যক এবং তাতে করে নবাবের অনেক সাফল্য ও সদগুণের বর্ণনা সময়ের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। অতএব ঘটনাবলীর দিন, মাস ও বছর উল্লেখের উপর গুরুত্ব না দিয়ে উল্লিখিত বছরের[৫] শা'বান মাসের ১৩ তারিখে যে ঘটনাবলী আমার স্মরণে ছিল, [আমি] জানতাম ও দেখেছিলাম সেগুলি লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করি। এই বিক্ষিপ্ত পৃষ্ঠাসমূহের পাঠকের নিকট আমার নিবেদন, যদি এগুলিতে কোনো ত্রুটি ও ভুল,[৬] কোন অগ্রাধিকার ও বিলম্বিতকরণ[৭] বাহুল্য ও স্বল্পতা[৮] তাঁদের দৃষ্টিতে পড়ে তবে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন সেগুলির [বিরূপ] সমালোচনা না করেন। যদি কোন ত্রুটি থাকে তবে তাঁরা যেন সেগুলি উপেক্ষা করেন এবং সম্ভব হলে সেগুলি যেন শুদ্ধ করে দেন।[৯]

৩। গ্রন্থকারের অবস্থা তখন সবদিক থেকেই বেশ শোচনীয় ছিল বলে মনে হয়। এই বাক্যের মূল ফারসি পাঠ ঃ 'আয্ কিসরত ইস্তিহাশ ওয়া শিদ্দত-ই-ইয্তিরার কুৎরবওয়ার করার না দাশ্ত্' (از کثرت استیحاش و شدت اضطرار قطرب وار قرار نداشت) এর অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (য. না ১০৫ পৃঃ) 'like a howling melancholic my mind was unsteady as by the compulsion of some force'-এর অনুবাদ ডক্টর আবদুস সোবহান দিয়েছেন (৪১ পৃঃ) ঃ "Excessive hunger and utmost confusion made me restless like a *qutrub*"। স্যার যদুনাথের অনুবাদ কষ্টকল্পিত ও মূল পাঠের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। ডক্টর আ. সোবানের পাঠ অনেকটা অর্থবোধক। তবে 'ইসতিহাশ' (استیحاش) শব্দের অর্থ এখানে বোধ হয় মনোবেদনা এবং ক্ষুধা (hunger) নয় যদিও উভয় অর্থেই এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব থাকলেও গ্রন্থকারের অন্নকষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। 'ইয্তিযার' (اضطراز) শব্দের অর্থ তাঁর মতে 'utmost confusion'। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ 'violence, necessity, compulsion, restrain? এখানে এই শব্দ প্রতিবন্ধকতা (compulsion বা restrain) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়, এবং 'utmost confusion' অর্থে নয়।

'কুৎরুব' (قطرب)-এর উপমা গ্রন্থকার এই গ্রন্থের বহু স্থানে দিয়েছেন। এই শব্দের অনেক অর্থ আছে। এগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে ঃ 'a little animal perpetually in motion on the surface of the water'. । এই অর্থই এখানে প্রযোজ্য বলে মনে হচ্ছে।

৪। মূল আরবী পাঠ ঃ 'মালা বুদ রাকো কুল্লাহু লাইউত রাকো কুল্লাহ' (مَا لاَ يُدرَكُ كُلُّهُ لاَيُترَكُ كُلُّهُ) "That which is not understood fully should not be left out altogether". A. S. (P. 41) স্যার যদুনাথের অনুবাদ (১০৫ পৃঃ) ঃ "If you cannot get the whole, do not abandon it altogether"। এই অনুবাদ কষ্টকল্পিত।

৫। ১১৭৭ হিজরী সনের শা'বান মাসের ১৩ তারিখ=১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ। এই তারিখে গ্রন্থকার নতুন করে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে।

৬। মূল ফা. পাঠ ঃ 'যললি ওয়া খুললি' (زللی و خللی) = 'flaw or deffect'।

৭। মূল ফা. পাঠ ঃ 'তকদিম ওয়া তাখির' (تقدیم و تاخیر) = 'precedence or delay'।

৮। মূল ফা. পাঠ ঃ 'ইফরাত ওয়া তফ্রিত' (افراط و تفریط) = 'excess or deficiency'।

৯। যে কোনো কারণেই হোক গ্রন্থকার নবাব আলিবর্দী খানের প্রায় অন্ধ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর কোন ত্রুটিই গ্রন্থকারের চোখে পড়ে নি।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাঙলা অধিকারে ভাস্করকে নিয়ে রঘুজী ভোঁসলা ও সম্রাটের আদেশে নবাবের সাহায্যে বালারাও -এর বাঙলায় আগমন[১]

পরাজিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভাস্কর তাঁর দাক্ষিণাত্যের রাজ্যে পৌঁছলে রঘুজী ভোঁসলা ঘটনার সমুদয় বিবরণ অবগত হয়ে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে ভাস্করকে সঙ্গে নিয়ে বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হন। ঠিক সেই সময়েই সুপ্রসিদ্ধ বাজীরাও-এর পুত্র ও মারাঠা শক্তির স্তম্ভ[২] পণ্ডিত বালারাও সম্রাটের আদেশে বুন্দেলখণ্ড হয়ে আজিমাবাদের পার্শ্ব দিয়ে অগ্রসর হন। তাঁর প্রতি সম্রাটের নির্দেশ ছিল, বাঙলার রাজস্ব থেকে [সম্রাটের প্রাপ্য] এগার লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা এবং রঘুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে বাঙলা থেকে বহিষ্কার করা।[৩] রঘুবীর বনাঞ্চল ও বালারাও সাধারণ [পরিচিত] পথে বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হন। বালারাওয়ের আগমনের অনেক আগেই রঘু বাঙলায় উপস্থিত হন এবং কাটোয়া ও বর্ধমানের মধ্যবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করেন এবং ভাস্করকে সুবৃহৎ সেনাদল সহকারে মেদিনীপুরে প্রেরণ করেন।

সেই সময়ে বালারাও[৪] ভাগলপুর ও রাজমহল অতিক্রম করেন এবং [এই] সব সৈন্যের অভিযানের কারণে সেই সব স্থানের কিছু ক্ষতি সাধিত হয়। ভাগীরথী নদীর পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে [পরিচিত] পথ ধরে এসে তিনি মানকরার নিকটবর্তী এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। নবাব নিজেও তাঁর সেনাবাহিনীসহ একই নদীর তীরে তাঁর

১। রিয়াজ (রিয়াজ-বা, ২৭৫-৭৬ পৃঃ) ও তা. বা. (১৬৭-৭৯ পৃঃ) মতে রঘুজীর বাঙলায় এই আগমন ঘটেছিল আলিবর্দী কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা করে ভাস্কর ও তাঁর সেনাপতিদের হত্যার ঘটনার (পরবর্তী ১৩ পরিচ্ছেদ দ্রঃ) পর এবং সেই সময় সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্‌র আদেশে বাজী রাওয়ের পুত্র বালাজী রাও বাঙলায় এসেছিলেন আলিবর্দীর সাহায্যার্থে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ ও সিয়ার (বা, ১ম খণ্ড, ৫০৩ পৃঃ) এমতে ঘটনা ঘটে ভাস্করের হত্যার আগেই এবং এই বর্ণনাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

২। সেই সময়ে বাজী রাও ছিলেন মারাঠা শক্তির স্তম্ভ এবং বালাজী রাও ছিলেন তাঁর পুত্র। বাজী রাওয়ের সঙ্গে রঘুজীর শক্রতা ছিল কিন্তু বাজী রাও ছিলেন তখন পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাটের অনুগত এবং রঘুজী ছিলেন সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।

৩। মারাঠাদের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধের কারণে আলিবর্দী দিল্লীর প্রাপ্য রাজস্ব ১১ লক্ষ টাকা পরিশোধে বিলম্ব করেন এবং সেই অর্থ আদায়ের জন্য সম্রাট বালাজী রাওকে বাঙলায় প্রেরণ করেন এবং সেই সঙ্গে মারাঠাদের বিরুদ্ধে আলিবর্দীকে সাহায্য করার জন্যও।

৪। সিয়ারে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৫০৩ পৃঃ) বালাজী রাও।

ছাউনি ফেলেন। একই সময়ে দুটি মারাঠা বাহিনীর আগমনে নগরের অধিবাসীদের মনে প্রচণ্ড বিভ্রান্তি ও ভীতির সৃষ্টি হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে গঙ্গা নদীর তীরের দূরত্ব ছিল মাত্র দশ ক্রোশ এবং এই দুই স্থানের মধ্যে গাড়ি ও চক্রের সাহায্যে যাতায়াত[৫] ভাড়া হয়ে পড়েছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা এবং নৌকা ভাড়া হয়ে পড়েছিল একই সমান। তাতে এক আশ্চর্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং কয়েক দিন পর্যন্ত তা কেয়ামতের দিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংক্ষেপে, বালারাও-এর কাছাকাছি বিজয়ী বাহিনীর আগমনের পর নবাব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর বালারাও[৬] নবাবকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে যান এবং সেখানে একই স্থানে আলো ও আঁধারের[৭] মিলন ঘটে। প্রচলিত আতিথ্য ও আনুষ্ঠানিকতার পর নবাব তাঁর নিজ রাজকীয় বাসস্থানে ফিরে যান।[৮] অন্য একদিন বালারাও নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য নবাব গালিচার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং পূর্ণ আতিথ্য প্রদর্শন করে বালারাওকে নবাব নিজ মসনদে উপবেশন করান। দুর্দান্ত রঘুকে বহিষ্কারের ব্যাপারে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়। [অতিথিকে] হস্তী, মণি-মাণিক্য ইত্যাদি প্রদানের আনুষ্ঠানিক আচরণাদির পর নবাব রাও পণ্ডিতকে বিদায় দেন।

কাটোয়া ও বর্ধমানের মাঝামাঝি কোনো এক স্থানে রঘু অবস্থানরত ছিলেন। তিনি [সেখানে] এই ঐক্যের সংবাদ পান। তাঁর পক্ষে এই [সম্মিলিত] বিজয়ী প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব মনে করে তিনি পশ্চিম বাঙলার অরণ্যের দিকে অগ্রসর হন।

৫। একই সময়ে দু'টি মারাঠা বাহিনীর বাঙলায় আগমন দেখে জনসাধারণ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল এবং মুর্শিদাবাদ থেকে ভীত নগরবাসীদের পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। ফলে গাড়ি ও নৌকা ভাড়া অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও আছে (সিয়ার-বা. ১ম খণ্ড, ৫০৫ পৃঃ)।

৬। মূল ফারসি 'ওয়া মোশার-ই- ইলায়হি মরাসম-ই- ইসতিকবাল ব-আ'মল আওরদাহ্ ব-খিমাহ্-ই-খোয়েশ বোর্দাহ্' (مشار اليه مراسم استقبال بعمل آورده بخيمه خويش برده) পাঠের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন (৪৩ পৃঃ), "After going through the formalities of welcome. the Nawab took him to his camp. এই অনুবাদ বিভ্রান্তিকর। প্রকৃতপক্ষে বালারাও নবাবকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে এ. এস. উল্টা পাঠ দিয়েছেন। যদুনাথের পাঠ (১০৬ পৃঃ) "After the arrival of Bala Rao. near his own army. Alivardi paid him a visit. Bala Rao advanced to welcome him and took him into his cump" অনেকটা ভাবানুবাদ হলেও অধিক গ্রহণযোগ্য। ডক্টর আবদুস সোবহানের অনুবাদ ক্রটিপূর্ণ।

৭। মূল ফা. পাঠ ঃ 'নূর ওয়া যুলমত' (نور و ظلمت) 'Light and Darkness'। স্পষ্টভাবে বলা না হলেও গ্রন্থকার এখানে আলিবর্দীকে 'আলো' ও বালাজী রাওকে 'অন্ধকার' বলে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন খুব সম্ভব।

৮। মূল ফারসি, 'পাস্ আজ মরাসিম-ই- তওয়াযিই' ওয়া তকাল্লুফ-ই- মতআ'রিফাহ্ নওয়াব ওয়ালা জনাব মোআ'উদত ব-দওলত সেরা-ই-খোয়েশ ফরমুদ' (پس از مراسم توضع و تکلف متعارفه نواب ولا جناب معاودت بدولت سرای خویش فرمود) পাঠের অনুবাদ এ. এস. (৪৩ পৃঃ) দিয়েছেন, "The observance of usual hospitality and formality being over. the Nawab returned to his own palace." । এখানে 'দওলতসিরাহ্' শব্দের অর্থ 'প্যালেস' (palace) নয়, রাজকীয় বাসস্থান অর্থাৎ রাজকীয় তাঁবু বা শিবির।

চুক্তিমতো পরদিন আলো ও অন্ধকারে সেনাবাহিনী সাগরের ঢেউ-এর মত সবেগে রঘুর পশ্চাদ্ধাবন করে ভাগীরথী নদী অতিক্রম করে, পশ্চিম বাঙলার দিকে অগ্রসর হয়। দুই-একদিনের অভিযানের পর নবাবের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে বালারাও তাঁকে এই সংবাদ প্রেরণ করেন ঃ "যে দ্রুতবেগে যাওয়া উচিত তেমন দ্রুতবেগে জনাবের সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়ে রঘুর কাছে পৌছতে পারবে না। আমি জনাবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। দিন কয়েকের মধ্যে [এ রাজ্য থেকে] রঘুর বিতাড়িত হওয়ার সংবাদ জনাবের কাছে পৌছবে।"[৯]

এই সংবাদ প্রেরণ ও যে অর্থের জন্য তিনি এসেছিলেন তা সংগ্রহ করার পর বালারাও পরদিন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে রঘুর পিছনে ধাওয়া করেন এবং তাঁকে ধরে ফেলেন। তাঁদের মধ্যে একটি যুদ্ধ হলে রঘু তাতে পরাজিত হন। [এরপরে] এ রাজ্যে [আর] অবস্থান করা বালারাওয়ের কাছে সঙ্গত মনে না হওয়ায় তিনি গিরিপথ দিয়ে নিজ রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেন। রঘুর অধিকাংশ মালপত্রও লুণ্ঠিত হয়েছিল। ভাস্কর মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে এই সংবাদ অবগত হয়ে তিনি কটকের গিরিপথ দিয়ে চরম বিশৃঙ্খল ও দিশাহারা অবস্থায় [নিজরাজ্যে] প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার কারণে বালারাও দাক্ষিণাত্যে চলে যান। এইবার যুদ্ধ করার কোনো কষ্টভোগ না করেই নবাব বিজয়ী ও গৌরবান্বিত হয়ে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর মুর্শিদাবাদে এসে পৌছেন।

ঠিক এই সময়ে [ঢাকার নায়েব-নাজিম] হোসেন কুলী খান[১০] [তাঁর দিওয়ান] গোকুল চাঁদ পেশকারের সঙ্গে লিখিত চুক্তি[১১] এবং অভিযোগের কারণে পদচ্যুত হন। গোকুল চাঁদের কাছে হোসেন কুলী খান বহু অর্থ দেনা বলে লিখিত দলিল শাহামত জঙের কাছে পেশ করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর নিয়াবতের (নায়েব নাজিম) দায়িত্ব নবাব শুজা-উদ্-দৌলার সময় থেকে [ঢাকার?] ফৌজদার রূপে নিযুক্ত ইয়াসীন খানকে প্রদান

৯। বালাজী রাও ও আলিবর্দীর মধ্যে এই সাক্ষাৎ ও রঘুজীকে বিতাড়িত করার জন্য যুদ্ধ প্রচেষ্টার বর্ণনা সিয়ারে (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড, ৫০৫-০৭ পৃঃ) মোটামুটি বিস্তারিতভাবে তবে একটু ভিন্নরূপে আছে।

১০। মূল ফা. 'আয্ সবব-ই-মহালিফাত ওয়া সিয়া'য়ত' (از سبب مخالفت و سعایت) পাঠের অর্থ এ. এস. (তা. ই. ৪৪ পৃঃ) দিয়েছেন 'because of the enmity and accusation'। আরবী سعایت শব্দের অর্থ 'accusing or informing against; calumny, accusation etc'.। কিন্তু আরবী مخالفت শব্দের অর্থ কোনো মতেই 'enmity' হতে পারে বলে মনে হয় না। এ শব্দের আরবি (مخالف) = 'A confederate, sworn ally' থেকে উৎপন্ন অর্থ 'Entesrng into an agreement, confirming by oath etc'। সুতরাং এ শব্দের অর্থ enmity হতে পারে না। স্যার যদুনাথের পাঠ (১০৭ পৃঃ) 'out of great enmity'। এই পাঠও ভুল। সঠিক পাঠ উপরে অনুবাদে দেওয়া হয়েছে।

১১। হুসেন কুলী খান ছিলেন আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগমের অতি প্রিয় প্রণয়ী। তাঁর এই পদচ্যুতি কি চুক্তিভঙ্গের কারণে না অন্য কোনো কারণে ঘটেছিল তা বলা দুষ্কর। কারণ, পরবর্তীকালে ঘসেটি বেগমের নিকট থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁর কনিষ্ঠা সহোদরা আমিনা বেগমের প্রণয়ী হওয়ার কারণে হোসেন কুলী খানকে প্রাণ দিতে হয়েছিল সিরাজ-উদ্-দৌলার হাতে। এক্ষেত্রে অবশ্য ঘসেটি বিবির চেষ্টায় তিনি অচিরেই পূর্ণ মর্যাদা ফিরে পান।

করা হয় এবং মীর কলন্দরকে ফৌজদার পদে নিযুক্ত করা হয়। হোসেন কুলী খান [মুর্শিদাবাদ] নগরে চলে আসেন এবং নিজের কাজের তদবিরে লেগে যান।

তিনি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁর পক্ষে শাহামত জঙের স্ত্রী ঘসেটি বিবির পূর্ণ অনুকম্পা অর্জনে সমর্থ হন।[১২] ঘসেটি বিবি হোসেন কুলী খানকে তাঁর [পূর্ব] পদে অধিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঘসেটি বিবির পিতা ও স্বামী উভয়েই তাঁর আদেশ ও নিষেধের কাছে নতি স্বীকার করতেন[১৩] বিধায় তিনি হোসেন কুলী খানের অন্যায়ের মার্জনা ও অপরাধের ক্ষমা পাওয়ার কারণ হয়ে পড়েন। হোসেন কুলী খানের আনুগত্য ও সদিচ্ছা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে শাহামত জঙ দ্রুত আদেশ প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে জাহাঙ্গীর নগরের [নায়েব] নাজিমের পদে নিযুক্তি ও খেতাব প্রদান করেন। হোসেন কুলী খান এমন একজন [শক্তিশালী] পৃষ্ঠপোষক পেয়ে অধিকতর ক্ষমতার অধিকার ও মানসিক শান্তি নিয়ে জাহাঙ্গীর নগরে চলে যান।

কোনো অপরাধ বা অন্যায়ের কারণে ইয়াসীন খানের পদচ্যুতি হয়নি। এই পদচ্যুতিকে অপমান মনে করে তিনি 'ফকিরের লেবাস'[১৪] ধারণ করেন। ইয়াসীন খানের সঙ্গে আতাউল্লাহ্ খান সাবিত জঙের[১৫] সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ইয়াসীন খানের বাড়িতে যান এবং তাঁকে অনেক প্রবোধ ও উৎসাহ দিয়ে তাঁর নিজ চাকুরিস্থল ভাগলপুরে ইয়াসীন খানকে নিজ প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে সেখানে প্রেরণ করেন। ঘসেটি বিবির পৃষ্ঠপোষকতার কারণে হোসেনকুলী খান জাহাঙ্গীর নগরে এসে নবাবের কার্যে আরও অধিকতর মনোযোগের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি গোকুল চাঁদকে পেশকারীর পদ থেকে পদচ্যুত করে তাঁর

১২। এ সম্বন্ধে সিয়ার-এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদক যে টীকা দিয়েছেন (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড ৫৭২ পৃঃ পাদটীকা) তাতে বলা হয়েছে "অবশেষে সুন্দর দেহ ও যথাস্থানে প্রদত্ত বিপুল অর্থ বলে তিনি ঘসেটি বিবির এত অধিক অনুগ্রহভাজন হইলেন যে, অচিরে তিনি তাঁহার পূর্ণ গৌরব ফিরিয়ে পান।" সেখানে আরও বলা হয়েছে, "সারা মুর্শিদাবাদে ইহা সুপরিচিত যে, তিনি (ঘসেটি) নিমন্ত্রণ ও কুটনী পাঠাইতেন এবং কোনো সুদর্শন বলবান পুরুষ রাস্তায় সর্বদা নিরাপদ ছিল না।"

১৩। সিয়ারেও (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড, ৫০৯ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে। গ্রন্থকারের এই বর্ণনা সত্য ও নিরপেক্ষ।

১৪। তখনকার দিনে বিশেষ করে মোঘল আমলে কর্তৃপক্ষের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে কোনো অসহায় সরকারি কর্মকর্তার প্রতিবাদের একমাত্র উপায় ছিল 'ফকিরী লেবাস' ধারণ করে সংসার ধর্ম ত্যাগ করা এবং এসব ব্যক্তিকে 'মুনযয়ী' (منزوی) বলা হত এবং এ শব্দের অর্থঃ 'solitary, recluse, a hermit'.। 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী' রচয়িতা মীর্জা নথন নিজেই একবার নবাব ইসলাম খানের অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে এ ধরনের আচরণ করেছিলেন বলে সেই গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

১৫। আতাউল্লাহ্ খান সাবিত জঙ ছিলেন আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদের কনিষ্ঠা কন্যা রাবেয়া বেগমের স্বামী।

বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনয়ন করেন এবং রাজবল্লভকে নিজের সহকারী রূপে নিযুক্ত করেন। জাহাঙ্গীর নগরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করে তিনি ভাবলেন যে, তাঁর পক্ষে নবাবের সান্নিধ্যে থাকা অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হোসায়েন-উদ্-দীন খানকে জাহাঙ্গীরনগরে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রেখে তিনি মুর্শিদাবাদে চলে আসেন।[১৬]

সেই সময় থেকে তাঁর উপর চরম বিপদ না আসা পর্যন্ত তাঁর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই চরম বিপর্যয়ের কথা পরে লিপিবদ্ধ করা হবে।[১৭] শাহামত জঙের পরিবারের সঙ্গে তাঁর এত ঘনিষ্ঠতা হয় যে, সেই বাড়ির যে কোন কাজের ব্যবস্থা, আংশিক বা পূর্ণ, সবই তাঁর চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শাহামত জঙের ভাই, ভৃত্য অথবা মুৎসুদ্দিদের মধ্যে কারও হোসেন কুলী খানের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তাঁর মতের সঙ্গে মত মিলিয়ে যিনি চলতে পারতেন তাঁর পদোন্নতি হত এবং যিনি তাঁর মতের বিরুদ্ধে যেতেন তাঁর বিপদ হত এবং তাঁর উদ্দেশ্য কোনদিন সফল হত না।

১৬। হোসেন-উদ-দীন খান ছিলেন হোসেন কুলী খানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। সিরাজ-উদ-দৌলার প্ররোচনায় (?) আগা বাকেরের পুত্র আগা সাদেক তাঁকে জাহাঙ্গীরনগর দুর্গে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা মোজাফফরনামাতে আছে।

১৭। আলিবর্দী খানের প্ররোচনায় সিরাজ-উদ-দৌলা হোসেনকুলী খানকে অন্যায় ও নির্মমভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করেন। এই ঘটনার বর্ণনা পরে আছে। সিয়ারেও (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড ৫১০ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভাস্করের দ্বিতীয়বার কাটোয়া আগমন ও ১৯ জন সেনাপতিসহ তাঁকে হত্যা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, [বাঙলার] বাহাদুর গাজীদের তরবারির আঘাতে পরাজিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভাস্করকে বাঙলার মাটি থেকে নিজ দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল। পরবর্তী বছর[১] রঘু বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহকারে ভাস্করকে বাঙলায় এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে, সম্ভব হলে [নবাবের] সঙ্গে একটি চুক্তিপত্র করা হবে এবং তা না হলে যুদ্ধ করা হবে।[২] ভাস্কর সেই সব সৈন্য নিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেন। নবাব ইতোমধ্যে তাঁর সেনাবাহিনীকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। কারণ, পর পর কয়েক বছর ধরে তারা ভ্রমণের যাতনা ভোগ করে আসছে। বাঙলা রাজ্যে ভাস্করের আগমনের পরে 'যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণা'[৩] এই নীতি অনুসরণ করে নবাব প্রকাশ্যে শান্তির প্রস্তাব দিয়ে [দূত] প্রেরণ করেন। তাঁর প্রধান সেনাপতিদের অন্যতম মোস্তফা খান ও তাঁর মুৎসদ্দিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও তাঁর নিজ গৃহের দিওয়ান রাজা জানকী রামকে তিনি ভাস্করের নিকট প্রেরণ করেন প্রকাশ্য সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে। কিন্তু তিনি তাঁদের কাছে [গোপনে] তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন যাতে তাঁরা চাতুরি ও চালাকি করে সন্ধি করার আশ্বাস দিয়ে ভাস্করকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে পারেন এবং তাঁর আগমনের পরে 'বিধর্মীদের সকলকে হত্যা কর',[৪] এই বাণী স্মরণে রেখে তাঁরা তাঁকে হত্যা করতে পারেন।

১। ফা. 'সাল-ই-দিগর' (سال دیگر) পাঠের অর্থ সাধারণত 'অন্য এক বছর' হলেও এখানে সবাই 'পরবর্তী বছর'ই করেছেন এবং তা-ই সঙ্গত।

২। মূল ফা. পাঠ ঃ 'আগর ইত্তেফাক-ই-সোলেহ্ শওয়াদ মোসালেহ নমায়েদ ওয়া আ'লা বামোজারেরাহ্ পর দরাদ' (اگر اتفاق صلح شود مصالہ نمايد و الا بمجاربہ پر دارد) বা "conclude a treaty, if possible, or else resort to fighting"। স্যার যদুনাথের অনুবাদ (য. না, ১০৮ পৃঃ) ঃ "...to make peace if possible, or else to engage in fighting".

৩। আরবি প্রবাদ 'আল হারবু খোদআ'তুন' (الحرب خدعة) 'War is deception'. স্যার যদুনাথ (১০৮ পৃঃ) ঃ "War is a kind of stratagem."। এ সম্বন্ধে রিয়াজে (রিয়াজ-বাঃ ২৭৩ পৃঃ) আছে, "'যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণা' এই নীতি অনুসরণ করে মহবত জঙ্গ কূটকৌশলে অন্যতম মারাঠা নেতা আলী কারাওয়ালের (যিনি পূর্বে মারাঠা ছিলেন ও পরে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করায় নামকরণ হয়েছিল আলী ভাই) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন।" এরপরে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ও ভাস্কর পণ্ডিত, আলী ভাই ও একুশজন মারাঠা সেনাপতিকে হত্যা করা হয়। অনুরূপ বর্ণনা তা. বা. তেও (১৬৬-৬৭ পৃঃ) আছে।

৪। আরবি প্রবচন ঃ 'ফাক্তুলুল মুশরিকিনা কাফ্ফাতান' (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) "Slay the infidels in their entirety."—A.S. (৪৬ পৃঃ)। স্যার যদুনাথ (১০৮ পৃঃ) এই আরবী বাক্যের কোনো অনুবাদ না দিয়ে সমুদয় বাক্যের ভাবানুবাদ দিয়েছেন ঃ "...and after Bhaskar's arrival he would slay them"। এ সম্বন্ধে সিয়ারের বর্ণনা (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড ৫১৯ পৃঃ) দ্রঃ।

কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে এই গোপনীয় বিষয় সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে অগ্রসর হন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত মনকরা [নামক স্থানে] তাঁর বিজয় শিবির স্থাপন করেন। ভাস্কর [তখন] কাটোয়ার পার্শ্ববর্তী স্থানে এসে পৌঁছেছিলেন। গোলাম মোস্তফা খান ও রাজা জানকীরাম সেখানে গিয়ে ভাস্করের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার ব্যাপারে আলোচনা চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই আলাপ-আলোচনার মধ্যে চাতুরি ও প্রতারণার সঙ্গে ছিল প্রতিজ্ঞা। [এর ফলে] ভাস্কর নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হন।

ভাস্কর প্রথমে তাঁর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি আলী ভাই[৫] নামক ব্যক্তিকে নবাবের নিকট এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে, তিনি (আলী ভাই) যদি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসেন তবে তিনি (ভাস্কর) আপোসকারীদের কাছে মীমাংসার জন্য যাবেন। গোলাম মোস্তফা খান ও রাজা জানকী রাম তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে কাজ হচ্ছে দেখে আলী ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নবাবের নিকট ফিরে আসেন। জিহবার মাধুর্য ও বাক্যের মিষ্টতা[৬] দিয়ে নবাব আলী ভাইয়ের নিকট ভাস্করের প্রতি তাঁর সদিচ্ছা ও বন্ধুত্ব এমনভাবে প্রকট করেন এবং আলী ভাই নবাবের উত্তম আচরণে এমনভাবে মুগ্ধ ও আকর্ষিত হন যে, পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তিনি গোলাম মোস্তফা খান ও রাজা জানকী রামকে সঙ্গে নিয়ে ভাস্করকে নবাবের কাছে আনয়ন করার জন্য তাঁর কাছে যান।[৭] সন্ধির শর্ত নিয়ে আলাপ-আলোচনার [মধ্যবর্তী] সময়ে ও সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত নবাব প্রত্যহ বাঙলার বিভিন্ন ভোজ্য দ্রব্য, বস্ত্র, ফল ইত্যাদি ভাস্করের নিকট প্রেরণ করতে থাকেন যাতে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব বর্ধিত ও ভাস্করের অশান্ত মন শান্ত হয়।

[নির্দিষ্ট তারিখের] একদিন আগে নবাব প্রশস্ত আঙ্গিনা ঘিরে সুউচ্চ তাঁবু ও সুবৃহৎ পর্দাসমূহ খাটালেন এবং সেনাপতিগণের মধ্যে নবাব সওলত জঙ, মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খান, ফকির উল্লাহ বেগ খান প্রমুখের নিকট তাঁর [গোপন] অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।[৮] তিনি [এই] আদেশ দেন যে, বিজয়ী বাহিনীর সৈন্যগণ তাঁবুর ভিতরে দুই কি তিন সারিতে দণ্ডায়মান থাকবে এবং আদেশের সময় পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে।

৫। আলী ভাই সম্বন্ধে বর্ণনা উপরে ৩ পাদটীকায় দ্রঃ।

৬। মূল ফা. পাঠ ঃ 'ব-তলাকত-ই-লসান ওয়া অ'যু য়াত-ই-বয়ান' (بطلاقت لسان و عزوت بیان) = 'glibness of language and sweetness of speech'। মোজাফফর নামার (য. না. ৩০ পৃঃ) অনুরূপ পাঠ যথা 'The Nawab won his heart by abundance of kindness and favours' আছে।

৭। এ সম্বন্ধে মোজাফফর নামাতে (য. না. ৩০ পৃঃ) আছে, "These two men met Raja Bhaskarram and strengthened the bond of friendship by taking oaths according to their religions. Alivardi Khan sent many presents to Bhaskarram and threw him off his guards."

৮। অনুরূপ বর্ণনা রিয়াজ (রিয়াজ-বাঃ ২৭৪ পৃঃ), মোজাফফরনামা (য. না. ৩১ পৃঃ) এবং সিয়ারেও (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড, ৫২২-২৩ পৃঃ) আছে। সিয়ারের বর্ণনা যথেষ্ট বিস্তারিত।

নবাবের আদেশ পাওয়া মাত্র তারা সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুততা ও অতিশয় সাহসিকতার সঙ্গে তা পালন করবে এবং কাজ শেষ হলে তাদেরকে প্রচুর আনুকূল্য ও পারিতোষিক প্রদান করা হবে। এই আদেশ শোনার পর সকল সৈন্য "আমি শুনেছি এবং আমি তা পালন করব"[৯] মনের এই কথা মুখে এনে আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়।

পরদিনের প্রভাত ছিল ভাস্করের জীবনের সায়াহ্নকাল। উল্লিখিত বর্ণনামতো নবাব তাঁর দরবারে আসন গ্রহণ করে ভাস্করের প্রতীক্ষায় থাকেন। এই সময়ে গোলাম মোস্তফা খান, রাজা জানকী রাম এবং আলী ভাই ভাস্কর ও তাঁর মারাঠা সেনাপতিদের সঙ্গে পাশাপাশি অশ্বারোহণে নবাবের তাঁবুর দ্বারে এসে উপস্থিত হন। প্রথমে মারাঠা সেনাপতিগণ তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। [মারাঠাদের] প্রত্যেককেই প্রবেশ করার পর নবাব প্রশ্ন করেন "তিনি কি রাও জীও?"

সেই সময়ে মৃত্যুর আকর্ষণে ভাস্কর রাজা জানকী রামের হাত ধরাধরি করে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করেন। এই অবস্থায় গোলাম মোস্তফা খান কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে রাজা জানকী রামকে বলেন, "আপনি হিন্দুস্তানের আমিরদের মধ্যে অন্যতম। আপনার হাত আমার হাতে থাকবে তা কী করে হয়!"[১০] এই ছুতাতে তিনি তাঁর হাত তাঁর [ভাস্করের] হাত থেকে সরিয়ে আনেন[১১] এবং ঠিক সেই সময়ে নবাব উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন, "এই কাফেরদের হত্যা কর।"[১২]

সঙ্গে সঙ্গে রক্তপিপাসু বীরগণ তাদের তরবারি কোষমুক্ত করে বিধর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং চোখের পলকে দাক্ষিণাত্যের সেনাপতিদের রক্তে সেই রণভূমি রঞ্জিত হয়। ভাস্কর তাঁর উনিশ জন[১৩] সেনাপতিসহ বীর সৈনিকদের তরবারির খোরাকে

৯। আরবি বাক্য ঃ 'সাময়ে'না ওয়া আতা' না' (سَمِعنَا وَ أَطعنَا) 'I have heard[and] I shall excute= it'. A. S. (P. 48) এই বাক্যের সরাসরি অনুবাদ দেননি এবং ভাবানুবাদ দিয়েছেন ঃ "All the soldiers, on hearing the order signified their obedience to the act". কিন্তু পাদটীকায় উপরে উল্লিখিত পাঠ দিয়েছেন। য. না. (১০৮ পৃঃ) All the soldiers, on hearing this order, girt their loins to do the work."

১০। গ্রন্থের এই ও পরবর্তী বাক্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর ও দুর্বোধ্য। সেই তুলনায় সিয়ারের বাক্য অধিক স্পষ্ট। সেখানে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৫২৪ পৃঃ) আছে, "এই সময় ভাস্কর তাঁহার ঘোটকী হইতে অবতরণ করিয়া ডাইন হাতে মোস্তফা খাঁন ও বাম হাতে জানকী রামের হাত ধরিয়া তাঁবুর ভিতরে আসিলেন।" আমাদের গ্রন্থকারের পাঠে কিছু ত্রুটি আছে। এ ধরনের ত্রুটি গ্রন্থের অন্যত্রও আছে। তাঁর বিপর্যস্ত অবস্থা ও মানসিক অস্বস্তির কারণে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ গ্রন্থটি খুব মনোযোগ সহকারে রচনা করতে পারেননি বলে মনে হয়।

১১। মূল ফা. পাঠ, 'ব-ইন্ হিলাহ্ দস্ত্ আয্ দস্ত-ই-উ বরদাশ্ত্' (باین حیله دست از دست اور بسرداشت) "With this pretext he took out his hand from his side." (A.S. P. 48), "By this strategem he separated his hand (from the hand of Janakiram) (য. না-১০৯ পৃঃ)।

১২। মূল ফা. পাঠ, 'ইন্ কাফিরানরা বকুশিদ' (این کافرانرا بکشید) "Kill these infidels"— A.S. (P. 48)।

১৩। মূল ফা. পাঠ, 'বা-নুযদাহ্-ই-সরদার-ই-দিগর' (بانوزده سردار دیگر) "Along with nineteen other leaders."- A. S. (P. 48)। রিয়াজ (রিয়াজ-বাঃ ২৭৫ পৃঃ) ঃ 'ভাস্কর ও ২১ জন মারাঠা সেনাপতিকে হত্যা করা হয়েছিল।" সিয়ারে (সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড, ৫২৪ পৃঃ) মারাঠা সেনাপতিদের সংখ্যা ২২ দেওয়া হলেও নিহতদের সংখ্যা দেওয়া হয়নি। মোজাফফরনামা (য. না. ৩১ পৃঃ) ঃ "Only 12 captains and Ali Bhai".

পরিণত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হলে[১৪] নবাব হস্তীতে আরোহণ করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পনের থেকে বিশ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য নবাবের সৈন্য দল থেকে কিছু দূরে অবস্থান করে ভাস্করের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষারত ছিল। এই ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং পলায়ন করতে শুরু করে। নবাবের বিজয়ী সেনাবাহিনী পরাজিত শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা ও বন্দী করা এবং [তাঁদের মালপত্র] লুন্ঠন করার ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠে। এই কার্য সমাধা করার ব্যাপারে তারা নিজেদেরকে রেহাই দেয় নি। মারাঠাদের মধ্যে যারা তরবারির হাত থেকে রেহাই পায় তাদের বাঙলার মাটি থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং দুর্বৃত্তদের কোনো নাম বা চিহ্ন এদেশে থাকেনি[১৫] বিজয়ী ও জয়োল্লাসিত হয়ে নবাব মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই বিজয় উৎসব[১৬] পালনের ব্যাপারে নবাব তাঁর সমুদয় সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত করেন। তাদের প্রত্যেকের বেতন বৃদ্ধি করে দেন·এবং তাদেরকে অনেক প্রকারের বখশিশ ও পারিতোষিক দান করেন। পুরস্কার হিসাবে তিনি সৈন্যদেরকে দশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। তাঁর বিজয়াবলীর [বর্ণনা দিয়ে] নবাব [সম্রাটের নিকট] এক আবেদনপত্রে গোলাম মোস্তফা খানের 'মনসব' বৃদ্ধি, তাঁকে 'বাবরজঙ'[১৭] উপাধি প্রদান ও নওবত[১৮] প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন। সেই সঙ্গে তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত মীরজাফর আলী খান, ফকির উল্লাহ্ বেগ খান প্রমুখের ন্যায় তাঁর অন্যান্য সহকর্মী যাঁরা সাহসিকতা ও ত্যাগ স্বীকারের প্রতীক ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পুরস্কারের

১৪। মূল ফা. পাট : 'চুন তীর-ই-তদবির বর হদফ-ই- মুরাদ জাগীর শুদ (چون تیر تدبیر بر هدف مراد جاگرشد) "When the arrow of his plan struck the butt of fulfilment". A.S. (P. 48). After Plan succeeded"-(য.না. ১০৮) স্যার যদুনাথ ভাবানুবাদ দিয়েছেন।

১। রিয়াজ (রিয়াজ-বা ২৭৫ পৃঃ মতে "মারাঠা সেনাপতিদের মধ্যে একজন , যিনি দশহাজার অশ্বারোহী ভাবানুবাদ সৈন্যসহ বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছিলেন, সসৈন্য পলায়ন করেন।"

১৬। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতাকে গ্রন্থকারের বিজয় উৎসব বলেছেন এবং তা আলিবর্দীর প্রতি তাঁর অন্ধ অনুরাগেরই প্রমাণ। এই ঘটনার পর হাজী আহমদের মতে দুর্বৃত্তও আলিবর্দীকে বলেছিলেন"Youhave to-day created enemis for youself till Doomsday." Muzaffar Nama.(য. না. ৩১ পৃঃ)।

১৭। 'বাবরজঙ'=(بابرجنگ)= যুদ্ধে ব্যাঘ্র।

১৮।' নবুয়ত' (نوبت) শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে এখানে প্রযোজ্য অর্থ হচ্ছে রাজা বা রাজ পুরুষের প্রসাদের তোরণে নির্দিষ্ট সময়ে বাদ্যাদি বাজানোর প্রথা ("Musical band playing in stated time be-for the palsce of a king or prince."

সুপারিশ করেন। সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্ নবাবের জন্য বিশেষ খিলা'ত,[১৯] মণিমুক্তা, অশ্বাবলী ও তরবারি, গোলাম মোস্তফা খানের জন্য বাবরজঙ উপাধি, নওবত ও পাঁচ হাজারের মনসবদারি এবং অন্যান্য যাঁদের নাম সুপারিশ করা হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকের মর্যাদা বৃদ্ধির আদেশ সংবলিত অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত এক 'ফরমান'[২০] জারি করেন। অতি সহজে লব্ধ এই অতিশয় উৎকৃষ্ট বিজয়ে[২১] নবাব মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্টি লাভ করেন এবং সৈন্য সংখ্যা কর্তন করে আরামের আসনে নিজেকে সমর্পণ করেন। বড় বা ছোট [রাজ্যের] প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ নিজ পছন্দমতো আনন্দদায়ক কাজে নিয়োজিত থাকে। বিশেষ করে নবাব শাহামত জঙ আনন্দের প্রত্যেক উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং আনন্দের পরিধিকে বৃদ্ধি করার আয়োজন করেন। তিনি অজস্র অর্থ পাঠিয়ে শাহজাহানাবাদ[২২] থেকে নর্তকী আনয়নের ব্যবস্থা করেন। এভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর [চিরাচরিত] প্রথা মতো অশোভন আকাশ নেমে এল এবং বিসদৃশ সুরের সংযোজন হল[২৩] এবং তা শীঘ্রই বর্ণিত হবে।

এই সময়ে হাজী আহমদ রাজকীয় মনের অধিকারী তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে কলহ করে আজিমাবাদে চলে যান। এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, কটক রাজ্যের শাসনভার হারানর পর নবাব সওলত জঙের কোন ভাল চাকুরি ছিল না এবং তাঁর আয় ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছিল। নবাব আলিবর্দী খান হুগলীর ফৌজদারি নবাব সওলত জঙের নামে বরাদ্দ করেন। হাজী আহমদ কিছুদিন ধরে হুগলীর ফৌজদারি লাভের আশা মনে মনে পোষণ করছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে তিনি তাঁর ভ্রাতা ও পুত্রের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হন। মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য স্থানের আবগারি শুল্কের আয় তাঁর ব্যয়ের চেয়ে অধিক ছিল বিধায় এবং তাঁর অবস্থা বিবেচনাযোগ্য[২৪] ছিল না বলে নবাব এ ব্যাপারে হাজী আহমদের পুত্রের পক্ষ নেন। নবাব আলিবর্দী নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার

১৯। খিলা'ফত (خلعت) রাজা বা রাজপুরুষ কর্তৃক কোনো প্রদত্ত বিশেষ সম্মানী পোশাক।

২০। ফরমান (فرمن) সংস্কৃত প্রমাণ শব্দ থেকে উদ্ভূত ফারসি 'ফরমান' শব্দের অর্থ 'A mandate. command. order or royal patent'. অর্থাৎ রাজকীয় আদেশপত্র বা আদেশনামা।

২১। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতাকে গ্রন্থকার 'আজ ইনকেহ্ ফতেহ্ চুনিন কেহ্ সর আমাদ' (از اینکه فتحی چنین که سر آمد) etc= "As this victory that can be (describedas) one of the excellent was won quite easly" A.S. (P.49) য. না. পৃঃ ১০৯ Alivardi atter so easily aelieuring such a supeme victory'

২২। আলিবর্দীর পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে শাহামত জঙের চরিত্রের পরিচয় এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

২৩। ফা. পাঠ. 'ফালাক-ই-নাসাজ বর আ'দত মোস্তামোরা-ই-খোয়েশ না সাজ গারি কার্দাহ্ নেদা-ই-সাজ মোখালিফাত দার দাদ' (فلك ناساز برعادت مستمره خويش ناساز گاری کرده ندای شاز مخالفت درداد) "The nuseemly sky. according to is its traditonal habit. dissented and struck a discordant note ...."A. s. (p. 49) য. না. ভাবানুবাদ দিয়েছেন ১০৯ পৃ :) : "When the haveen turrned hostile" এটা যে ভাবানুবাদ তা বলাই বাহুল্য।

২৪। মূল ফা. পাঠঃ 'আজ ইনকেহ্ মদাখিল-ই-হাজী আহমদ আয্ ও'লাফা-ই- সায়ের ই-মুর্শিদাবাদ ওয়ায়রাহ্ যিয়াদাহ্ বর মোখারিজাশ বুদ দার ইন আমর্ কেহ্ লায়েক-ই-বহালিশ নাবুদ পিসর্ তরফ মিশুদ (از این که مداخل حاجی احمد از علاقه سایر مرشدآبا وغیره زیاده بر مخارجش بود دراین امر که لائق بحالش نبود بابشر طرف می شد) "As the income of Haji ahmad from the land custom of Musrshidabad and other places was more than his expeniture. the Nawab, in this matter sided with the son" -A.S. (৫০ পৃঃ)। তিনি 'দর ইন আমর কেহ্ নায়েক বহালিশ নাবুদ' এবং তাঁর অবস্থা বিবেচনার যোগ্য ছিল না বলে) এই অংশের অনুবাদ দেননি। য. না.- পাঠকেও (১১০ পৃঃ) ভাবানুবন্দ বলা যেতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গিতে হাজী আহমদের কাছে নিজেকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে হুগলীর ফৌজদারি নবাব সওলত জঙকে প্রদান করেন।

এ কারণে হাজী আহমদ তাঁর ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ মিশ্রিত ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং আজিমাবাদে চলে যান। সেখানেই তিনি চরম বিপদে পতিত হবেন এবং সেখানেই তাঁর দেহাবশিষ্ট[২৫] সমাহিত হবে বলে সৃষ্টিকর্তার বিধান ছিল এবং অচিরেই তা বর্ণিত হবে। জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান তাঁর ভাইদের তুলনায় পিতার প্রতি প্রকাশ্যে অধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে যান এবং হাজী আহমদের পছন্দমতো এক স্থানে তাঁকে দ্রুত নিয়ে আসেন। পিতার প্রতি আচরণে প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি ছিলেন পুরোপুরি নির্ভুল। কিন্তু সেই অবাঞ্ছিত[২৬] মানুষটি তাঁর বৃদ্ধ বয়স[২৭] সত্ত্বেও প্রচুর অশ্লীল আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে তিনি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পরিত্যক্ত[২৮] ও মানুষ কর্তৃক নিন্দিত[২৯] হয়েছিলেন। তাঁর অশিষ্ট আচরণসমূহের মধ্যে একটি ছিল এই যে, তাঁর গৃহের সামনে একটি স্থান নির্ণয় করে সেখানে পবিত্র নবীর পদচিহ্ন বহনকারী এক খণ্ড পাথর অতিশয় ভক্তিভরে তিনি স্থাপন করেন। কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাস তাঁর ও তাঁর সম্প্রদায়ের (মজহাবের)[৩০] বিশ্বাসের বিরোধী ছিল। আজিমাবাদ নগরের যত লম্পট ও নর্তকীর দল যারা বহু বছর ধরে প্রতি বৃহস্পতিবার আরজান শাহ্র মাজারে সমবেত হত তিনি তাদেরকে সেখানে যেতে নিষেধ করে দেন এবং তাদেরকে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে আসতে বলা হয়।

২৫। ফা. পাঠ, 'মুশত-ই-খাকাশ' (مشت خاکش) 'his earthly remains'.

২৬। মূল ফারাবী 'ওয়াখিম-উল-আ'কিবাত' (وخیم العاقبات) পাঠের অনুবাদ এ. এস (৫১ পৃঃ) দিয়েছেন, 'the hapless man' এবং ম. না. (১১০ পৃঃ) দিয়েছেন, 'the unfortunate man'। কোনো অনুবাদই সঠিক বলে মনে হয় না। আরবি (وخیم) (ওয়াখিম) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'heavy, unwholesome, noxious, hurtful, disastrous, injurious, a heavy disagreeable man.'। এখানে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' অধিক সঙ্গত পাঠ বলে মনে হয়।

২৭। ফা. পাঠ, 'কিবরসন' (کبرسن) 'Reaching to an advanced age, full of years great old age.'। আলিবর্দীর চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন হাজী আহমদ (প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রঃ)। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করার সময় আলিবর্দীর বয়স ৬০ বছর ছিল বলে গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন এবং ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুকালে আলিবর্দীর বয়স ৮২ বছর ছিল বলেও গ্রন্থকার বলেছেন। এই দুই বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলেও ১৭৪৮-৪৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ আলোচ্য ঘটনার সময় হাজী আহমদের বয়স যে ৭০ বছরের উপরে ছিল তাতে বোধ হয় সন্দেহ নেই।

২৮। মূল ফা. পাঠ 'মরদুদ' (مردود)= rejected =পরিত্যক্ত।

২৯। মূল ফা. পাঠ 'মলুম' (ملوم) =repriemaded =নিন্দিত।

৩০। মূল ফা. পাঠ 'মযহাব' (مذهب) =সম্প্রদায়। মযহাব শব্দের অনুবাদ এ. এস. দেননি।

চতুর্দশ অধ্যায়

নবাবের চাকুরি থেকে মোস্তফা খানের ইস্তফাদান ও জয়ন-উদ-দীনের সঙ্গে যুদ্ধ

গোলাম মোস্তফা খানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে, নবাবের পরিপূর্ণ মর্যাদাবোধ ও সাহসিকতা থাকা সত্ত্বেও তিনি গোলাম মোস্তফা খানের সঙ্গে পরামর্শ ও তাঁর অভিমত ছাড়া অনেক বিষয়ে আদেশ দিতে সাহস পেতেন না এবং মোস্তফা খানের সুপারিশের পরিপন্থী কোনো কাজ করার ক্ষমতা নবাবের ছিল না। বাঙলার সমুদয় জমিদার মোস্তফা খানের নিকট উপস্থিত হতেন বলে তাঁর (নবাবের) খালিসা[১] ভূমির রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ নামে মাত্রই ছিল। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ ধৈর্য ও আত্মসংযম ছাড়া তিনি আর কোনো উপায় দেখতে পান নি। প্রকাশ্যে নবাব তাঁর প্রতি যথা সম্ভব সম্মান প্রদর্শন করতেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে মোস্তফা খানের সব অন্যায়কে পর্যুদস্ত করার ব্যাপারে নবাবের চেষ্টার কোনো অবহেলা ছিল না।

একদিন[২] এমন ঘটল যে, গোলাম মোস্তফা খান বরাবরের মতো তাঁর দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি আউদল শাহ্ ও হাকিম শাহ্‌কে প্রথমে নবাবের দরবারে পাঠিয়ে তিনি নিজে পরে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁরা দু'জন যখন নবাবের দরবারে উপস্থিত হন ঘটনাক্রমে তখন এই গ্রন্থের রচয়িতাও সেখানে উপস্থিত ছিল এবং সেই সময়ে উপস্থিত

১। বাঙলায় মুসলিম বিশেষ করে মোঘল আমলে সরকার কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিন প্রকার ভূমির অস্তিত্ব ছিল এবং সেগুলি ছিল (১) দেশীয় রাজা বা জমিদারদের অধীনস্থ ভূমি, (২) জাগীর ভূমি ও (৩) খালিসা নামে পরিচিত সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ভূমি। প্রথম শ্রেণীর ভূমির জন্য সরকার নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব পেতেন নির্দিষ্ট চুক্তি বা বন্দোবস্ত মতে। জাগীর ভূমি বরাদ্দ করা হত বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য এবং তাঁদেরকে নগদ অর্থ না দিয়ে ভূমি বরাদ্দ করা হত তাঁদের ব্যয় নির্বাহের জন্য। সরকারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ও সরকারি কর্মচারীদের সহায়তায় খালিসা ভূমির রাজস্ব আদায় করা হত। প্রকৃতপক্ষে এই ভূমি ছিল সরকারের রাজস্বের প্রধান উপায়।

২। এই ঘটনার আরও বিস্তারিত বিবরণ সিয়ারে (সিয়ার-বা, ১ম খণ্ড, ৫৩০-৩২ পৃঃ) আছে। কিন্তু সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন তব্‌তবায়ী এই কাহিনী ইউসুফ আলী খানের বর্ণনা থেকে নিয়েছেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "ইউসুফ আলী খাঁ আমাদের জন্য তাঁহার সমসাময়িক ব্যাপারের যে বিচিত্র ইতিবৃত্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই নিবৃত্তির কারণ প্রকাশিত হইয়াছে।"—(সিয়ার-বাঃ ১ম খণ্ড, ৫৩০ পৃঃ)। এখানে উল্লেখ্য, আলোচ্য ঘটনার সময় ইউসুফ আলী সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন এবং সিয়ার রচয়িতা তখন ছিলেন দিল্লীতে। তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল কি সতের বছর। এই ঘটনার সামান্য কিছুকাল পরেই তিনি আজিমাবাদে (পাটনায়) আসেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ইউসুফ আলীর বর্ণনা মোটেই পরিস্কার নয়।

ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন ভৃত্য ছাড়া দরবারে আর বিশেষ কেউ ছিল না। এ সময়ে প্রাসাদের একজন খোয়াজা[৩] ভিতর থেকে এসে সংবাদ দিল যে, নবাব বেগম শক্ত ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ঠিক সেই সময়ে গোলাম মোস্তফা খান দরবারের নিকটবর্তী স্থানে [উপস্থিত হয়েছেন], ঘোষক এ সংবাদও দিল। আউদল শাহ্ ও তাঁর ভ্রাতাকে অপেক্ষা করতে বলে বেগমের পরিচর্যার জন্য নবাব প্রাসাদের ভিতরে চলে গেলেন। এই সময়ে প্রাসাদের একটি কক্ষ থেকে [মানুষের] চলাফেরার শব্দ শুনে আউদল শাহ্র সন্দেহ হল, নবাব তাঁকে ও গোলাম মোস্তফা খানকে হত্যা করার জন্য একদল সৈন্য সেখানে রেখেছেন এবং উপরে উল্লিখিত অজুহাত দেখিয়ে তিনি ভিতরে চলে গেছেন। এই অলীক কল্পনায় বশবর্তী হয়ে আউদল শাহ্ সেখান থেকে সরে পড়েন এবং স্বগৃহে প্রস্থানের পথে মোস্তফা খানকে ঘটনার কথা বলেন।

গোলাম মোস্তফা খান ইতোমধ্যেই দরবারের কাছাকাছি স্থানে এসে পৌঁছেছিলেন। 'বিশ্বাসঘাতকরা ভীরু'[৪] এই বাক্য অনুসারে গোলাম মোস্তফা খান তাঁর ভবিষ্যৎকে নিয়ে নবাবের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না বরং বিদ্রোহ করার জন্য তিনি কোন না কোন ছুতা বা সুযোগের[৫] জন্য সর্বক্ষণই চিন্তারত ছিলেন। আউদল শাহ্র অলীক কথা বিশ্বাস করে মাঝপথ থেকে তিনি নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সংবাদ নবাবের শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে তিনি নবাব শাহামত জঙকে গোলাম গোলাম মোস্তফা খানের নিকট প্রেরণ করেন যাতে তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টার মাধ্যমে তাঁর মনে প্রবোধ দিয়ে তাঁকে নবাবের কাছে নিয়ে আসতে পারেন। গোলাম মোস্তফা খানের সঙ্গে নবাব শাহামত জঙের পথে সাক্ষাৎ ঘটে এবং শাহামত জঙ মোস্তফা খানকে মিষ্টি বাক্য দিয়ে সর্বপ্রকারে প্রবোধ দিতে ও শান্ত করতে চান। কিন্তু ফল সবই তার লক্ষ্যের বিপরীত হয়[৬] এবং গোলাম মোস্তফা খান নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। [তখন] পদাতিক সৈন্য ছাড়াই তাঁর নয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তিনি তাদেরকে তাঁর পিছনে দাঁড়াতে সম্মত করিয়ে বিদ্রোহ ও শত্রুতার পতাকা উত্তোলন করেন।

তিনি চাকুরি থেকে পদত্যাগ করেন ও তাঁর প্রাপ্য বকেয়া বেতন দাবি করে নবাবের নিকট এক বার্তা প্রেরণ করেন। শাহামত জঙের কথা ও কাজ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখার সদস্য ও অন্যান্যের কাছে যথেষ্ট কার্যকরী ছিল। শাহামত জঙের মাধ্যমে ও সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নবাব আশা করেছিলেন যে, গোলাম মোস্তফা খানের

৩। ফা. পাঠ, খোরাজা সরাই (خواجه شرائی) = an eunuch.

৪। আরবি প্রবাদ, 'আল খা-ইয়েনু খাইফুন' (اَلْخَائِنُ خَائِف)= 'A traitor is timid '

৫। ফা. পাঠ, 'ওসিলাহ্ ওয়া বহানাহ' (وسیلهٔ و بهانه)= 'cause or pretext'

৬। এখানে সিয়ারের বর্ণনা (সিয়ার-বা. ১ম খণ্ড, ৫৩২ পৃঃ) অধিক বিস্তারিত।

৭। সিয়ারের বর্ণনা মতে (সিয়ার-বা. ১ম খণ্ড ৫৩৩ পৃঃ) আলিবর্দী আগের মতো তাঁর প্রাণপ্রিয় সিরাজ-উদ-দৌলাকে সঙ্গে নিয়ে গোলাম মোস্তফা খানের নিকট যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের চাপে পড়ে তিনি সেই চিন্তা পরিত্যাগ করেন।

বিভ্রান্ত মন শান্ত হবে কিন্তু তাতে কোনো ফল পাওয়া যায় নি। গোলাম মোস্তফা খানের মনকে শান্ত করার জন্য নবাব নিজে তার কাছে যাবেন বলে মনে মনে ভাবেন। গোলাম মোস্তফা খানকে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে নবাব সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।[৭] সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গোলাম মোস্তফা খানের অধীনস্থ বর্তমানে চাকুরিরত ও [পূর্বে] পদচ্যুত সৈনিকদের সংখ্যার পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করেই নবাব [মোস্তফা খানের] প্রস্তাব অনুমোদন করে তাঁকে সতের লক্ষ[৮] টাকা [সৈনিকদের] বেতন হিসাবে প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে আদেশ দেন।

শমশির খান, সরদার খান, রহম খান ও সেনাবাহিনীর অন্যান্য জমাদারের[৯] সঙ্গে জাতি ও সম্প্রদায়গত[১০] কারণে গোলাম মোস্তফা খানের যথেষ্ট ঐক্য ও হৃদ্যতা ছিল। ইতোমধ্যে গোলাম মোস্তফা খান তাঁদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁদের বিশ্বস্ততার প্রতিদানে মহাবত জঙকে বিতাড়িত করে তিনি তাঁদের সঙ্গে বাঙলার শাসক্ষমতা সমানভাবে ভাগ করে নিবেন।[১১] শমশির খান ছিলেন একটু বোকা[১২] প্রকৃতির লোক। তিনি গোলাম মোস্তফা খানের সান্নিধ্যে থাকতে সম্মত হন। কিন্তু সরদার খান ও রহম খান উত্তর দেন, "মহাবত জঙ যদি তোমার উপর কোন অন্যায় করেন অথবা তোমার বেতনের অঙ্গীকারকৃত অর্থ পরিশোধ করতে টালবাহানা করেন তবে আমরা তোমরা সঙ্গে আছি। তবে তোমার উদ্দেশ্য যদি শুধু বিরোধিতাই হয় তবে রাজদ্রোহিতার লজ্জা ও অপমান আমরা সহ্য করতে পারব না।"

মানুষের হৃদয় জয় করার ব্যাপারে নবাব ছিরেন যুগের অনুপম ব্যক্তি। [মোস্তফা খানের] এসব ঘটনা যখন ঘটছিল নবাব ইতোমধ্যে নিজেকে এ কাজে এমনভাবে নিয়োজিত করেন যে, এ ব্যাপারে আফগানরা নবাবের সঙ্গে এক মন ও এক অন্তর হয়ে

৮। করম আলী খান রচিত মোজাফফর নামা মতে (য, না,-৩৮ পৃঃ) নয় লক্ষ টাকা। সেখানে আছে, "Alivardi . . . . at once gave him nine lakhs of rupees which were his due as arears of pay, through Jagat Seth and sent him back to his home with all honours." খুব সম্ভব করম আলী খান এই ঘটনার বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী ইউসুফ আলী খান থেকেই নিয়েছিলেন। কারণ, করম আলী ছিলেন তখন ঘোড়াঘাটের ফৌজদার হিসাবে সেখানেই কর্মরত।

৯। আরবি থেকে ফারসি ভাষায় গৃহীত জমা'দার (جمعدار) শব্দ ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে বিশেষ করে ইংরেজ আমলে সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাকে (non commisioned officers of the armed forces) বোঝাত। মুসলিম বিশেষ করে মোঘল আমলে এই শব্দ দ্বারা উচ্চপদস্থ সেনাপতিকে বোঝাত।

১০। এঁদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন জাতিতে আফগান। রিয়াজে (রিয়াজ-বাঃ ২৭৬ পৃঃ) আছে, "আফগান সৈন্যরা মোস্তফা খানের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সঙ্কট বৃদ্ধি পায়।"

১১। আরবি বচনসহ মূল পাঠ ঃ "হুকুমাত-ই-বঙ্গালাহ্-বিস্ সুয়েইউতি ফিমা বাইনাহুম বাতাকসিমে খাহাদ রাসিদ' (حکومت بنگالہ باسَویّۃ فیما بینهم بتقسیم خواهد رسید) = ="that, in return for their fidelity, he would share with them the rulership of Bengal."

১২। মূল ফা. পাঠ সাফাহাত মিযায (سفاهت مزاج)=' Stupid disposition'.

পড়েন। গোলাম মোস্তফা খান হতাশাগ্রস্ত হয়ে আট কি নয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আজিমাবাদ অধিকার করার জন্য অগ্রসর হন। সৈন্যদের বেতন পৌঁছিয়ে দিয়ে তাদের অভিলাষপূর্ণ করে ও শাহামত জঙকে মুর্শিদাবাদে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে নবাব নিজেও [আজিমাবাদ অভিমুখে] অগ্রসর হন। মোস্তফা খান মুঙ্গেরে পৌঁছে সেই দুর্গ অধিকার করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই দুর্গ বহুকাল ধরে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত ছিল না। [দুর্গ অধিকার করতে গিয়ে] মোস্তফা খানের ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রসুল খান ঘাড়ে প্রস্তরাঘাতের কারণে নিহত হন। কিন্তু গোলাম মোস্তফা খান[১৩] দুর্গ অধিকারে সমর্থ হন।[১৪]

গোলাম মোস্তফা খান এবার আজিমাবাদের দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার শাসনকর্তা জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জঙ তখন গঙ্গার অপর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ত্রিহুতে ছিলেন। এই সব সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে যে মুষ্টিমেয় সৈন্য ছিল তাদেরকে নিয়ে নদী অতিক্রম করে তিনি জাফর খানের বাগানে আস্তানা গাড়েন। তিনি হাজী মোহাম্মদ খান ওরফে হাজী আলমের মাধ্যমে গোলাম মোস্তফা খানের নিকট এই বার্তা প্রেরণ করেন ঃ "এই নগর ও রাজ্য অধিকার করা যদি আপনার বাসনা হয়ে থাকে তবে প্রয়োজনীয় বাদশাহী সনদ প্রদর্শন করুন। আর চলে যাওয়াই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়ে থাকে তবে তাতে কোন বাধা নেই। আপনি এই নগরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে চলে যান।"

গোলাম মোস্তফা খান উত্তর দিলেন ঃ "ইসলামী আইন মতে ঈমানের উপর যারা আঘাত হানে তাদের ধ্বংস করা আবশ্যক এবং 'যে জয় করে রাজ্য তাঁরই'। [১৫] এই বাণী অনুসারে এই দলকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে কোনো সনদের প্রয়োজন হয় না। কোনো সনদের বলে আপনার চাচা বাঙলা অধিকার ও এর শাসকর্তাকে হত্যা করেছিলেন?"[১৬]

সংক্ষেপে বর্ণনা এই যে, নবাব আলিবর্দী খান জয়ন-উদ-দীন খানকে যুদ্ধ না করে নিজেকে সংযত রাখতে এবং [প্রয়োজন বোধে] আজিমাবাদ পরিত্যাগ করে নবাবের সঙ্গে যোগদান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে পরে শত্রুকে একযোগে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু যুদ্ধের জন্য গোলাম মোস্তফা খানের অভিপ্রায় জয়ন-উদ-দীন খানের নিকট ধরা পড়লে তাঁর (জয়ন-উদ-দীন খানের) সহজাত

১৩। রিয়াজে (রিয়াজ-বাঃ ২৭৬ পৃঃ) ভুল করে আবদুর রসুল খানকে মোস্তফা খানের 'অন্যতম চাচাত ভাই' বলা হয়েছে।

১৪। এ সম্বন্ধে সিয়ারের বর্ণনা (সিয়ার-বাঃ ৫৪৬–৪৭ পৃঃ) অধিক বিস্তারিত।

১৫। আরবি বচন ঃ 'আলমূলকু লিমান ঘালবা) (اَلْمُلْكُ لِمَنْ غَلَبَ) ='A kingdom belongs to the conqueror.'

১৬। এই প্রশ্ন ছিল খুবই সঙ্গত এবং এর কোনো উত্তরও এ পক্ষের কাছে ছিল না যদিও আলিবর্দী চতুরতা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে দিল্লী থেকে বিহারের সুবাদারির একটি সনদ লাভ করেছিলেন। এই সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

সাহসিকতা ও বীরত্বের কারণে তিনি সেই আদেশ অমান্য করেন এবং তাঁর বীরত্ব ও আত্মসম্মানবোধের কারণে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হন এবং নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে পাঁচ কি ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পরিখা খনন করে [যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন]। সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে তিনি অনেক পরিশ্রম করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। গোলাম মোস্তফা খান তাঁর বীর আফগান সেনাপতিদের নিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন। জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানও তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সাহসিকতার বাহনে[১৭] অধিরূঢ় হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।[১৮]

গোলাম মোস্তফা খান জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের বাহিনীর পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করে পরিখার ভিতরে প্রবেশ করে সৈন্যদের আবাসস্থল ধ্বংস করেন এবং জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের নিকটে পৌছে তিনি যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। জয়ন-উদ-দীন খানের বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তখন তাঁর নিজের কাছে দু'শ-র অধিক সৈন্য ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনিশ্চয়তা ও উদ্বিগ্নতার কারণে তাঁর দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পের ভিত্তি স্পর্শিত হয়নি এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও মর্যাদার সঙ্গে তিনি শত্রু দমনে অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে গোলাম মোস্তফা খানের হস্তীর মাহুত প্রাণবিদারণকারী কামানের গোলার আঘাতে ভূমিতে পড়ে যায় এবং [এর ফলে] হাতিটা বশে থাকেনি। সেই সময়ে গোলাম মোস্তফা খান অন্য একটি বাহনে আরোহণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর হাতির পিঠ থেকে নেমে আসেন। তাঁর এই অবস্থা লক্ষ্য করে তাঁর সেনাবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। গোলাম মোস্তফা খান যুদ্ধক্ষেত্রকে তাঁর লক্ষ্যের বিপরীত ও সেখানে তাঁর উপস্থিতি অসুবিধাজনক দেখে পলায়নের লজ্জাজনক বাদ্য বাজালেন।

জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের নিকট এই বিজয় আশাতীত ছিল। তিনি নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে শুকুর গুজারি করেন এবং সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিজয় বাদ্য বাজিয়ে দ্রুতগতিতে তিনি গোলাম মোস্তফা খানের পশ্চাদাবন করেন এবং পরিখার বাইরে স্থান গ্রহণ করেন। সে স্থানের বিপরীতেই ছিল গোলাম মোস্তফা খানের শিবির। সাত দিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্দুক ও কামানের লড়াই চলে। অষ্টম দিনে গোলাম মোস্তফা খান আজিমাবাদের পশ্চিমে মিঠাপুরে তাঁর শিবির স্থানান্তরিত করেন এবং তিনি নিজে [হস্তী পৃষ্ঠে] আরোহণ করে যুদ্ধ করতে আসেন।

১৭। ফা. পাঠঃ 'বর মোরাক্কাবে হিম্মত সওয়ারি নমুদাহ্' (ابر مـركب همت سـوارى نموده) 'riding on the courage of valour'.

১৮। সিয়ারে এই যুদ্ধের বর্ণনা অধিক বিস্তারিত (সিয়ার-বা. ১ম খণ্ড ৫৪২-৪৩ পৃঃ) সিয়ার রচয়িতা গোলাম হোসেন তবতবায়ি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বলেন (সিয়ার-বা. ১ম খণ্ড ৫৪২-৫৯ পৃঃ) "নরকূলের সর্বাপেক্ষা অধম আমি, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকী আলী খানের সঙ্গে স্থাপিত হই। তখন ১১৫৭ সনের জিলকদ মাস। অতঃপর পরবর্তী মাসের ১৪ তারিখে আমি শাসনকর্তার (জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান) পরিবায় স্থান গ্রহণ করিয়া আমার চাচার ভাগ্যের সঙ্গে আমার নিজের ভাগ্য গ্রথিত করি।"

রিয়াজে (রিয়াজ-বাঃ ২৭৭ পৃঃ) এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে।

যুদ্ধের প্রথম দিনের মতো তিনি আক্রমণ করতে এগিয়ে আসেন। এবারও জয়ন-উদ্-দীন খান ও তাঁর সঙ্গীরা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে পৌরুষের পরিচয় প্রদান করেন। সেই যুদ্ধে দৈবাৎ বন্দুকের [গুলির] আঘাত গোলাম মোস্তফা খানের চোখে লাগলে তিনি হস্তীপৃষ্ঠে পড়ে যান। প্রতিরোধের ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনস্তিত্বশীল দেখে তিনি যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাঁর শিবিরে প্রত্যাবর্তান করেন। পরদিন তিনি তাঁর শিবির থেকে পিছন দিকে যাত্রা করেন। [গোলাম মোস্তফা খানের বিরুদ্ধে] যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে সেই সময় নবাব আলিবর্দী খান বাঙলা থেকে এসে আজিমাবাদ থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে শুভ অবতরণ করেন। জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান তাঁর শ্রদ্ধেয় খুল্লতাতকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাঁর পদচুম্বন করে তাঁর শুভাশিস লাভ করেন।

সেই স্থান থেকে [নবাব] তাঁর বিজয় বাহনে গোলাম মোস্তফা খানের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তাঁর [মোস্তফা খান] সেনাবাহিনী চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁর বড় বড় সেনাপতিদের মধ্যে অধিকাংশ নিহত হওয়ার কারণে যুদ্ধ করার শক্তি তাঁর থাকেনি। কোথাও সম্মানের সঙ্গে পা রাখার স্থান না পেয়ে তিনি আজিমাবাদের সীমানার বাইরে চলে যান।[১৯] তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে নবাব বিহার রাজ্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছেন। সফদর জঙের [আগমনের] সময়ে আজিমাবাদ নগরে যে ক্ষতিসাধন করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ স্বরূপ নবাব গঙ্গ অতিক্রম করে বারাণসী লুণ্ঠন করার মনস্থ করেন। কিন্তু আলী মোহাম্মদ রোহিলাকে শায়েস্তা করার জন্য সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্ তখন মিনকারাতে ছিলেন। [একাজ] সম্রাটের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে মনে করে নবাব তা থেকে বিরত থাকেন এবং সফদর জঙের রাজের অন্তর্গত শুধু জমিনাহ্[২০] নামক স্থান লুণ্ঠন করে সৈন্যরা বিজয়ী[২১] বেশে ফিরে আসে। ইতোমধ্যে গোলাম মোস্তফা খানকে সাহায্য ও বাঙলা ধ্বংস করার জন্য কটকে রঘুর আগমনের সংবাদ আসে।

১৯। রিয়াজের মতে (রিয়াজ-বাঃ২৭৭পৃঃ) "মুস্তফা খান পরাজিত হয়ে জগদীশপুর পশ্চাদ গমন করেন।" রিয়াজের ইংরেজি অনুবাদক ও টীকাকার আবদুস সালাম বলেন (রিয়াজ-বাঃ ৫৭২ পৃঃ), "'আইন-ই আকবরী'-তে জগদীশপুরের উল্লেখ আছে (ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৪০০ ও ৪৯৮ পৃঃ)। এই স্থান আকবরের আমলে বিহারের তৎকালীন সর্ববৃহৎ জমিদার 'রাজা গজপতি' বা 'কাচাইতের' সুরক্ষিত অবস্থিতি স্থান ছিল।"

২০। ফা. পাঠ, 'যমিনাহ্' (زمينه)। সিয়ার মতে (সিয়ার-বা ঃ ৫৬০পৃঃ) এ স্থানের নাম 'জেমেনিয়াহ'।

২১। সফদর জঙকে কিছু না করে তাঁর নিরীহ প্রজাদের উপর এই অত্যাচারের কী হেতু থাকতে পারে! আলিবর্দীর এই বীরত্ব প্রদর্শনকে গ্রন্থকার বেশ সুনজরেই দেখেছেন বলে দেখা যাচ্ছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুর্শিদাবাদের কাছে রঘুর পুনরাগমন, বীরভূমের কাছে শিবির স্থাপন, আজিমাবাদের দিকে আগমন ও অবরুদ্ধ গোলাম মতুর্জাকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা ইত্যাদি

বিদ্রোহ ও রাজাদ্রোহের পতাকা[১] উত্তোলন কালে গোলাম মোস্তফা খান রঘুর নিকট পত্র লিখে তাঁকে বাঙলায় আসার জন্য প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করেন।[২] এই পত্র যখন রঘুর কাছে পৌছে ভাস্কর ও তাঁর অতি উত্তম বাইশজন[৩] সেনাপতির হত্যার কারণে মাথায় ও লেজে আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের মত প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে তখন তিনি [প্রচণ্ডক্রোধে] মোচড়াচ্ছিলেন ও কুণ্ডলী পাকাচ্ছিলেন।[৪] গোলাম মোস্তফা খান কর্তৃক প্রেরিত এই পত্রকে তিনি দৈব প্রেরিত বলে মনে করেন। চার হাজার বীর অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং কটকের পার্বত্যাঞ্চল দিয়ে তিনি এ রাজ্যে প্রবেশ করেন। বিপর্যস্ত মোস্তফা খানের পশ্চাদ্ধাবন ও তাঁকে পরাজিত করে নবাব তখন আজিমাবাদের পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। শাহাম্মত জঙের পত্রাবলীর মাধ্যমে তিনি রঘুর আগমনের সংবাদ পান। মুর্শিদাবাদ নগরে [প্রতিরক্ষামূলক] কোন প্রাচীর ও পরিখার অস্তিত্বহীনতা এবং শাহাম্মত জঙেরও নগর রক্ষার উপযুক্ত ক্ষমতা না থাকার কারণে গোলাম মোস্তফা খানের ব্যাপার জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের উপর ন্যস্ত করে এবং রহম খানকে তাঁর কাছে রেখে নবাব বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হন। গোলাম মোস্তাফা খান সেই সময়ে বিরোধী মনোভাব নিয়ে চুনারগড় ও অন্যান্য স্থান ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করে নবাব মুর্শিদাবাদে এসে উপস্থিত হন।

১। ফা. পাঠ ঃ 'আ'লম-ই-বঘাউত ওয়া তিঘিয়ান' (علم بغاوت و طغیان)='The standard of rebellion and sedition'।

২। রিয়াজের বর্ণনা মতে (রিয়াজ-বাঃ ২৭৭ পৃঃ), "মুস্তফা খান এবার রঘুজী ভোঁ'সলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। রঘুজী এই প্রকার সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। কাজেই তিনি সানন্দে সৈন্য-সাহায্য প্রেরণ করেন।" সিয়ারের মতে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২পৃঃ) রঘু এই পত্র পেয়েছিলেন ভাস্করের হত্যাকান্ডের পরে।

৩। এই প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত ১৯ জন সেনাপতির উল্লেখ (১৩ পরিচ্ছেদ দ্রঃ) দ্রষ্টব্য। এখানে পরিষ্কারভাবে বাইশজন (বিস্ত্ ওয়া দু সরদার' (بیست و دو سردار) সেনাপতির উল্লেখ দেখা যাচ্ছে।

৪। মূল ফারসি 'মানান্দ-ই-মার সর ওয়া দুম যাদাহ্ বহ্ পিচ ওয়া তাব ওয়া দর সদুদ ইনতিকাম বুদ' (مانند مار سرودم زده به پیچ و تاب و در صدد انتقام بود) পাঠের ইংরেজি অনুবাদ য. না. (১১৪ পৃঃ) দিয়েছেন, "who had been smarting like a snake hit on the head and looking out for an opportunity....." । এই পাঠ সঠিক ও সম্পূর্ণ নয়। এ, এস,-এর অনুবাদ (৫৫ পৃঃ) "...he was curling and twisting like a serpent ...." অধিক গ্রহণযোগ্য।

এ সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৩ পৃঃ) আছে, "The Marhatta Prince who since his generals' murder, who like an untroden snake retired within its holes."

ইতোমধ্যে বালেশ্বর ও মেদিনীপুর অতিক্রম করে রঘু বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন। গোলাম মোস্তফা খানের বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে নবাব পুরাপুরি সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেননি বলে মুন'ইম আলী খানকে তাঁর প্রতিনিধি রূপে রঘুর নিকট শান্তির প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করা তিনি সুবিধাজনক বলে বিবেচনা করেন। এসব কারণে নবাবকে বিপর্যস্ত ও মানসিকভাবে হাতাশাগ্রস্ত মনে করে রঘু সন্ধির শর্ত হিসাবে তিন কোটি টাকা দাবি করেন। সন্ধির এই আলোচনায় প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হলে নবাবের নিকট সংবাদ আসে যে, গোলাম মোস্তফা খান নিহত হয়েছেন। সেই সুদীর্ঘ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

এই খানের সাহসিকতা হঠকারিতার পর্যায়ে এসে পড়েছিল এবং তাঁর সঙ্গী ও সাহায্যকারী এবং আত্মীয়-স্বজন নিহত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও মর্যাদাবোধ তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। কয়েক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে তিনি পুনরায় আজিমাবাদের দিকে ফিরে আসেন। রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তাঁর শ্রদ্ধেয় খুল্লাতাত কর্তৃক সুদক্ষ জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং শত্রুকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তাঁর কোনো অবহেলা ছিল না। প্রায় দশ কি বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি শত্রুর মোকাবেলা করতে অগ্রসর হন। ভোজপুরের নিকট দুই বাহিনীর সাক্ষাৎ ঘটে। উভয়পক্ষের বীর সৈনিকদের মধ্যে যে সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খল লড়াই হয় তাতে চেষ্টা ও আত্মত্যাগের ব্যাপারে কোনো কমতি ছিল না। [সেই সময়ে] জীবন বিনাশকারী একটি গুলি এসে গোলাম মোস্তফা খানের গায়ে লাগলে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

সংক্ষেপে, এই বিজয় লাভ ছিল সমুদয় বিজয়ের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও সবচেয়ে কঠিন। দৈবের সাহায্যে তা নবাবের ভাগ্যে জুটেছিল। এই পরাক্রমশালী শত্রুর তিরোধানের ফলে জনগণের মনে শান্তি ফিরে আসে। রঘুর সঙ্গে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে নবাব তাঁর কাছে এই বার্তা প্রেরণ করেন ঃ "[যুদ্ধে] পরাজয় ঘটলে অথবা কোনো লাভের আশা থাকলে শান্তি চুক্তির প্রশ্ন উঠে। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ, এ পর্যন্ত আমাদের বিজয়ী বীর সৈনিকেরা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আশাহত হয় নি, বরং প্রতিদিনই তারা অধিকতর উৎসাহ নিয়ে তাদের [শত্রুদের] বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগ্রহী। এদের (এই দুই দলের) মধ্যে নৈকট্যের সম্পর্ক স্থাপন গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছনীয় নয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের সৈনিকেরা বিধর্মী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রক্তের নদী বহিয়ে দিয়ে তাতে স্নান করে যুদ্ধ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত শান্তি স্থাপিত হবে না। এর পরে সেই যুদ্ধে যে পরাজিত হবে সে-ই শান্তির প্রস্তাব দিবে।"[৫]

৫। মূল ফা. পাঠ (درین صورت و قولاع صلح موقوف بر آنست که شیر ان بیشه هیجانیا سلام با نهنگان در یایی ظلم بحدی کار زار کنند که جوئی از خون آنها جریان یافته صله و در آن دریای خون شناوری گرده شمشیر بهمدیگر زنند-بعد از هر که مغلوب شود طالب صلح گردد) "In this circumstances peace will not take place till our soldiers fight you to such an extent that there will flow a river of blood, wherin they shall swim and fight. Afterwards, whoever gets defeated, will ask for peace."

রঘু উত্তর দেন ঃ "প্রায় এক হাজার ক্রোশ পথ অতিক্রম করে একই কাজের জন্য আমি জনাবের উৎকৃষ্ট মানুষগুলির সমীপে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য জনাব একশ ক্রোশও এগিয়ে আসেন নি।"

নবাব এর উত্তরে বলেন ঃ "এখন বর্ষাকাল সমাগত প্রায়। আপনি সুদীর্ঘ পথের অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করে এখানে এসেছেন। কোনো সুবিধাজনক স্থানে আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন, তা-ই সঙ্গত হবে এবং আপনার সৈন্যগণ পথশ্রমের ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কিছু বিশ্রাম গ্রহণ করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। বর্ষাকাল শেষ হলে মহান আল্লাহ্‌র সহায়তায় আমি আপনাকে আপনার রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত অভ্যর্থনা জানিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসব।"

এই বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসারে কাজ করে ও তাঁর উপদেশ মেনে চলা সুবিধাজনক মনে করে[৬] রঘু বীরভূমের নিকটবর্তী এক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। মেদিনীপুর, হিজলী ও বর্ধমান পর্যন্ত সমগ্র কটক রাজ্য তাঁর অধীনে আসে। সেখানে অবস্থানকালে নিহত গোলাম মোস্তফা খানের পুত্র গোলাম মর্তুজা খান এবং বুলন্দ খান ও অন্যান্য আফগান [সরদারের] কাছ থেকে পর পর কয়েকটি পত্র রঘুর নিকট আসে। মর্তুজা খান মাক্রিকোহ্ নামক স্থানে বন্দী ছিলেন। তাঁদের পত্রের মর্ম ছিল এই ঃ "আপনি যদি ঐ দিক থেকে এই অঞ্চলে আগমনের কষ্ট স্বীকার করেন এবং আমরা যারা আপনার মিত্র আছি তাদেরকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেন তবে আমরা কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে আপনার আনুগত্যের চক্রের অংশীদার হব এবং ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করব না।"

কয়েক হাজার আফগান তাঁর অনুগত ও অধীনস্থ হয়ে পড়বে এই আশায় রঘু সেই স্থান ত্যাগ করে অরণ্য পথ দিয়ে আজিমাবাদের দিকে অগ্রসর হন। শীতের প্রারম্ভে নবাব দশ কি বার হাজার সাহসী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য সুপরিচিত পথে আজিমাবাদের দিকে এগিয়ে যান। আজিমাবাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল শেখপুরা, টিকরী প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করে গোলাম মর্তুজা খানকে মুক্ত করার লক্ষ্যে রঘু শোন নদীর অপর তীরবর্তী অঞ্চলে চলে যান। পথের কোনো স্থানে শত্রুপক্ষের সঙ্গে নবাবের সাক্ষাৎ ঘটেনি। আজিমাবাদ নগর অতিক্রম করে নগরের বাইরে পশ্চিমদিকে

৬। মূল ফা. 'ব-নসিহত-ই-নাসিক-ই-মশফিক আমল কারদাহ্ ওয়া সিলাহ্-ই-ওয়াকত দর ইমতিসাল আমর দীদাহ্' (بنصیحت ناصح مشفق عمل کرده صلاح وقت در امتثال دیده) পাঠের অনুবাদ য.না. (১১৫ পৃঃ) দিয়েছেন ঃ "Raghuji listening to this friendly advice and seeing it expedient to consent to this step..." এ অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ। এর সঠিক অনুবাদ হবে "Raghu, acting on the advice of that friendly adviser..." (এ. এস. ৫৭ পৃঃ)।

এবার তাঁর রাজকীয় শিবির স্থাপন করেন। সেখান থেকে কয়েক 'ফারসাঙ'[৭] পথ অতিক্রম করে তিনি মুহির আলীপুরের নিকট শোন নদীর তীরে অবতরণ করেন।

রঘু শোন নদীর অপর তীরে চলে গিয়ে [বন্দী] মর্তুজা খানকে উদ্ধার করে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করেছিলেন। মারাঠা ও আফগানদের মিলিত বাহিনীর প্রায় বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি [নবাবের বিরুদ্ধে] যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। নদীর তীরে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নবাবের সেনাবাহিনীর প্রধানদের মধ্যে প্রত্যেকেই, দৃষ্টান্তস্বরূপ আতাউল্লাহ খান সাবিত জঙ, মীর মোহাম্মদ জাফর খান, হায়দর আলী খান, শমশির খান, সরদার খান, রহম খান প্রমুখ এবং জয়ন-উদ-দীন খান হয়বত জঙ তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধে বীর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। অবশেষে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে রঘু অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে আসেন এবং তুমুল যুদ্ধ হয়।

সেই সময় বন্দুকের একটি গুলি দৈবাৎ তাঁর (রঘু) মুখে এসে লাগে এবং তাঁর একটি দাঁত উৎপাটিত হয়ে যায়। এই আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও রঘু রণভূমি থেকে পলায়নের লজ্জাজনক কাজ করেন নি। [বরং] দৃঢ় সংকল্প ও মর্যাদার সঙ্গে নবাবের বিজয়ী বাহিনীর বিরুদ্ধে [যুদ্ধ করে] শিবির স্থাপন করেন। এই যুদ্ধ প্রথম দিনের মত [সম্মুখ] যুদ্ধ ছিল না এবং সুযোগ পেলেই এক দল অন্য দলকে [অতর্কীতে] আক্রমণ করত।[৮]

ইতোমধ্যে নবাব আলিবর্দীর স্ত্রী 'নবাব বেগম সাহেবা' তকী আলী খান[৯] ও মোজাফফর আলী খানকে [একান্তভাবে] তাঁর নিজের পক্ষ থেকে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে রঘুর নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় হাবিব উল্লাহ খানের মাধ্যমে রঘুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের [আনীত] বার্তা পেশ করেন।[১০] বিজয়ী বাহিনীর কাছ থেকে বারবার আঘাত পেয়ে এবং মাত্রাতিরিক্ত লড়াইয়ের কারণে রঘু শান্তির অনুকূলে ছিলেন। কিন্তু নবাবের সঙ্গে শত্রুতার কারণে হাবিব উল্লাহ্ খান এ

৭। 'ফরসঙ' (فرسنگ) 'a league, a distance of about 12,000 cubits'। ১ ফরসঙ প্রায় ৩.৪ মাইল।

৮। আরবি বচন ঃ 'ফারিক্ কুম মিন্ আল্ জান্নাতে ওয়া ফারিককুমমিন্-আস্-সু'য়ি'রি' (فَرِيقٌ مِّنَ الجَنَّةِ و فَرِيقٌ مِّنَ السَّعِير) = 'one party attacked the other when the opportunity arose'.

৯। এই তকী আলী খান নবাব সরফরাজ খানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও কটকের শাসনকর্তা তকী খান নন। সেই তকী খান ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে কটকে প্রাণত্যাগ করেন। কটকের কদম রসুলে তাঁর সমাধি ছিল। আলোচ্য তকী আলী খান অন্য ব্যক্তি। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

১০। সিয়ারে (সিয়ার-ই ঃ ২য় খণ্ড, ১১-১২ পৃঃ) এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন তবতবায়ি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বলে উল্লেখ আছে। সেখানে মোজাফ্ফর আলী খান ও ফকীর আলী খানের ('Fakyr-aaly-'Qhan, son of Haji Abdulla') উল্লেখ আছে।

প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না। শান্তির প্রস্তাব থেকে রঘুর মনকে সরিয়ে এনে তিনি তাঁকে মুর্শিদাবাদে অভিযান চালাতে এই বলে সম্মত করান যে, নবাব সেই নগর থেকে অনেক দূরে অবস্থানরত ছিলেন বলে এবং সেখানে নগর রক্ষার জন্য কোন শক্তিশালী নেতা না থাকায় রঘুর পক্ষে সেই নগর অধিকার করা সহজ হবে।[১১] রঘু নিজেকে রণবাজ লোক মনে করেন নি এবং নিজে বিধর্মী বলে হাদিস শরীফের 'যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল'[১২] এই বাণী সম্পর্কে জ্ঞাত [এবং সে কারণে] বিশ্বাসী [ও] ছিলেন না। নবাবের সঙ্গে প্রতারণা করে ও মিথ্যা কথা বলে [প্রস্তাবিত] শান্তি চুক্তির উপর নির্ভর না করে হাবিব উল্লাহ্ খানের পরামর্শ মত তিনি মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন।[১৩]

রঘুর পশ্চাদ্ধাবন করে নবাব পরদিন আজিমাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন যুদ্ধকালে রঘু [কর্তৃক] খাদ্য-শস্যাদি বিনষ্ট করা হয়েছিল এবং অন্য কোন স্থান থেকে শস্যাদির সরবরাহ হচ্ছিল না বলে প্রত্যাবর্তনের সময় নবাবের সৈন্যদের কয়েকদিন কষ্টভোগ করে আজিমাবাদে পৌছতে হয়েছিল। কোথাও না থেমে রঘু বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন বলে নবাবকেও তাঁর অনুসরণ করতে হয়েছিল। [নবাব] ভাগলপুর মৌজার চম্পকনগরে পৌছলে সুযোগ বুঝে রঘু নবাবের শিবির আক্রমণ করেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত কিছু লোকের তাঁবু ও মালপত্র লুণ্ঠন করেন এবং জঙ্গলের পথ ধরে বাঙলার দিকে অগ্রসর হন। পরিচিত পথ ধরে নবাব[ও] দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেন এবং তিনি সেখানে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত নগর রক্ষার জন্য শাহাম্মত জঙকে তিনি পত্র লিখেন। নবাবের সেখানে পৌছার একদিন আগে রঘু মুর্শিদাবাদে এসে উপস্থিত হন ও নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত চাঁপাইদহ, জা'ফর খানের বাগান প্রভৃতি স্থানে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন করেন। সেই সময়ে নবাবের বিজয়ী বাহিনী নগরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয়ে রঘু সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র যুদ্ধ না করে সমুদয় মারাঠা বাহিনী নিয়ে ভাগীরথীর অপর তীর দিয়ে নগরের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে চলে যান।

তিন কি চার মঞ্জিল অতিক্রম করে নবাব চাঁপাইদহতে[১৪] এসে উপস্থিত হন এবং জাফর খানের কাটরার পাশ দিয়ে নগরের বাইরে থেকে এগিয়ে গিয়ে মুর্শিদাবাদের অন্যদিকে [অবস্থিত] আমানিগঞ্জে শিবির স্থাপন করেন। কাটোয়ার অপরদিকে রানীর দিঘির কাছে রঘুর সঙ্গে নবাবের আবারও এক প্রচণ্ড লড়াই হয়। এই যুদ্ধে রঘু তাঁর সর্বশক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। যুদ্ধে তাঁর অনেক সৈন্য নিহত হয় এবং জয়ের জন্য

১১। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই ঃ ২য় খণ্ড, ১১ পৃঃ) আছে।

১২। হাদিস ঃ 'আল্ আ'রবুন্ খোদ্ আ'তুন' (العَرُبُخداعَةَ) 'war is strategem.।

১৩। এ ধরনের এবং প্রায় অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই ঃ ২য় খণ্ড, ১২ পৃঃ) আছে।

১৪। মূল ফা. পাঠ 'ঝপাইদহ' (جهپانی ده)= Japaidah

অনেক চেষ্টা করলেও বিজয় ও গৌরবের মূর্তি তাঁর কল্পনা ও ধারণায় আসেনি (অর্থাৎ তিনি বিজয় লাভ করতে সমর্থ হন নি)। প্রতিরোধের ক্ষমতা তাঁর আর নেই দেখে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন। নবাব তাঁর পশ্চাদ্ধাবনে বিরত না হয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন।

রঘুর [সৈন্যদল] বিজয়ী বাহিনীর কাছে বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং সেই সংঘর্ষে তাঁর বহু সৈন্য নিহত হয়। তদুপরি[১৫] তাঁর নিজ রাজ্য থেকে বিদ্রোহের[১৬] সংবাদ তাঁর কাছে আসে। হাবিব উল্লাহ্ খানের কাছে মেদিনীপুরে দুই কি তিন হাজার মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য, গোলাম মর্তুজা খান, বুলন্দ খান ও অন্যান্য আফগান [সেনাপতিদের] ছয় কি সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রেখে রঘু হতাশ চিত্তে ও বিফল মনে[১৭] নিজ রাজ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর বারবার পলায়ন ও বাঙলার সীমানা অতিক্রম করার সংবাদ [তাঁর] 'পবিত্র সান্নিধ্যে[১৮] পৌছলে এবং রণক্লান্ত বিজয়ী বাহিনীকে বিশ্রাম প্রদানের মানসে নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন এবং প্রশাসনের উন্নতি বিধান এবং সেনাবাহিনী ও জনগণের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেন।'

১৫। মূল ফারসিঃ 'ওয়া বেসিয়ারি আয্ সিপাহাশ্ দরইন্ মোআ'রক ব-কতল রাসিদাহ্-ব-আ'লাওয়াহ রাসিদান-ই-আখবার-ই-শুউরশ-ই-মমালিক-ই-খোদাশ হাবিব উল্লাহ্ খানরা বা দু-সেহ্ হাযার সওয়ার-ই-মারহাট্টা ওয়া শশ হফত হাযার....' (وبسیاری از سپاهش درین معارك بقتل رسیده بعلاوه رسیدن (اخبار) سورش ممالك خودش حبیب الله خان را بادوسه هراز سوار مرهته و شش هفت هزار سوار افغانان از غلام مرتضی خان و بلند خان و غیره بمیدنی بود گزشته در کمال پاس و ناکامی رو بمملوك خویش اورد) পাঠের অনুবাদ এ.এস দিয়েছেন (৬০ পৃঃ) "and as many of his soldiers were slain in this battle, in spite of the arrival of the news of disorder in his kingdom, Raghu left Habibullah Khan, along with two or three thousand Maratha horsemen and six or seven thousand cavalry of Gholam Mortuza Khan, Buland Khan and others, in Mednipur and proceeded towoerds his own terriory in great dejection and disappointment." এ..এস. কর্তৃক প্রদত্ত এই অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ এবং তা অর্থহীন বলেও দেখা যাচ্ছে। আরবি 'আ'লাওয়াহ্' (علاوه) শব্দের সঙ্গে ফারসী ব (ب) উপসর্গ যোগে গঠিত (بعلاوه) শব্দের অর্থ এ. এস, কর্তৃক প্রদত্ত 'ইহা সত্ত্বেও' ('inspite of') নয়, এর সঠিক অর্থ হচ্ছে তদুপরি (over and above that)।

১৬। মূল ফা. পাঠ 'সওরশ' (سورش) শব্দের অর্থ 'tumult, confusion'। এখানে বিদ্রোহ অর্থে ব্যবহৃত।

১৭। মূল ফা. পাঠ, 'দর কামাল পাস ও নাকামি' (در کمال پاس و ناکامی) In great dejection and disappointant অনুবাদ মোটামুটিভাবে অর্থবোধক।

১৮। মূল ফা. পাঠ, 'বাআ'রযে আকদ্দস' (بعرض اقدس) 'sacred presence' অর্থাৎ নবাব আলিবর্দী খান।

ষোড়শ অধ্যায়

ইকরাম-উদ-দৌলা ও অন্যান্যের বিবাহের বর্ণনা[১]

এসব বিবাহ এত অধিক ধুমধাম ও জাঁকজমকের[২] সঙ্গে সংঘটিত হয় যে, অতীতে বাঙলার কোনো বিবাহে তা পরিলক্ষিত হয় নি। এই উপলক্ষে নবাব প্রায় এক হাজার বস্ত্র খিলা'ত স্বরূপ প্রদান করেন এবং ইকরাম-উদ-দৌলার বিবাহে শাহামত জঙ্গ[ও] প্রায় দুই হাজার মূল্যবান বস্ত্র 'সম্মানের প্রতীক'[৩] হিসাবে উপহার দেন। এসব বস্ত্রের এক একটির মূল্য একশ' থেকে এক হাজার টাকা এবং কোন কোনটির মূল্য এর চেয়েও বেশি ছিল। এগুলি পরিবারের সব সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী এবং নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। এক মাস কি তারও অধিককাল ব্যাপী এই উভয় নবাবের গৃহে ভোজদানের ব্যবস্থা[৪] করা হয়েছিল। নগরের উঁচু ও

১। মূল ফা. 'যিক্‌র-ই- শাদী-ই-ইকরাম-উদ-দৌলা ওয়ায়রাহ্‌' (ذکر شادی اکرام الدوله وغیره) পাঠের এ, এস-এর অনুবাদ (৬০ পৃঃ) ঃ 'MARRIAGE OF SHAHAMATJANG AND OTHER EVENT'। এই সম্পূর্ণ ভুল ও অর্থহীন অনুবাদ খুব সম্ভব ছাপাখানার দৌলতে। সিয়ারে (সিয়ারে-ইঃ ২য় খণ্ড ১৭ পৃঃ) আছে ঃ 'Aaly-vardy-Qhanc. elebrates the nuptials of his two grandsons Seraj-ed-daulah and Ecram-ed-daula'।

২। মূল ফা. পাঠ ঃ 'দর কমাল তকাল্লুফ ওয়া তয্‌ঈন' (در کمال تکلف و تزئین)-এর অনুবাদ স্যার যদুনাথের (১১৮ পৃঃ) 'Such grand celebration' পাঠকে ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। এ, এস.-এর অনুবাদ (৬০ পৃঃ), 'pomp and splendour' অধিক সঙ্গত।

৩। মূল ফা. পাঠ, 'খিলা'-ই-ফাখিরাহ্‌' (خلاع فاخره) 'honorific robes'।

৪। ইকরাম-উদ্-দৌলার বিবাহের বিশদ বর্ণনা সিয়ারে (সিয়ার-ই ঃ দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭ পৃঃ) আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে আতা-উল্লাহ্‌ খানের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পাকা কথা হয়েছিল। কিন্তু সেই কন্যা বছর দুই/তিন আগে মারা গেলে তার মাতাপিতাকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াসে তার কনিষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইকরাম-উদ-দৌলার বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

করম আলী খান 'মোজাফফরনামা' গ্রন্থে (য. না-৩৫ পৃঃ) এই বিবাহের মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এবং তা নিম্নরূপ "The expenditure on scents, illumination and fire works was twelve lakhs of rupees, besides the cost on the robes presented to the people high and low. For full three months, day and night, one lakh of troopers, one lakh of infantry and *krors*' of the *ryots* enjoyed the festivity and music."

মধ্যবিত্তদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যাঁদের বাড়িতে এসব ভোজ্যদ্রব্য বারবার যায় নি। এসব ভোজ্য দ্রব্যকে সাধারণত 'তোরা' বলা হত এবং এগুলির প্রত্যেকটির মূল্য হবে আনুমানিক পঁচিশ টাকা। এসব তোরা হাজারে হাজারে বিতরণ করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে কোনো কারণেই হোক গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খান সিরাজের উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না বলে মনে হয়। সর্বত্রই তিনি সিরাজের ত্রুটিগুলিই বড় করে দেখেছেন এবং তাঁর কোনো গুণের কথা ভুলেও উল্লেখ করেননি। এখানে দুই ভাইয়ের বিয়ের বর্ণনাতেও দেখা যাচ্ছে যে সিরাজের বিয়ের কোনো বর্ণনাই গ্রন্থকার দেননি এবং খুব সম্ভব ইচ্ছা করেই। এমনকি তাঁর নামের উল্লেখও নেই এবং তাঁকে 'ওঘায়রাহ' (অন্যান্য) বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইকরাম-উদ-দৌলার বিবাহের বর্ণনা অত্যন্ত ফলাও করে দেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভব গ্রন্থকারের কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ ছিল সিরাজের উপর এবং সেই অনুভূতি ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর নিরপেক্ষতাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে বলে দেখা যাচ্ছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

আতাউল্লাহ্ খান ও ইরাজ খানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আতাউল্লাহ্ খান ঃ আতাউল্লাহ্ খানের[১] সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, তিনি বাঙলায় আগমন করলে হাজী আহমদ তাঁর নিজ কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ্ দেন। আলিবর্দী খান রাজমহল থেকে আজিমাবাদের নায়েব-সুবাদারের পদ গ্রহণ করার জন্য [সেখানে] চলে গেলে নবাব শুজা-উদ-দৌলার আদেশে আতাউল্লাহ্ খানকে কারতলব খানের[২] প্রতিনিধি হিসাবে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। [এই] কারতলব খান ছিলেন নবাব শুজা-উদ্-দৌলার চাচার পুত্র এবং উল্লিখিত খানের (আতাউল্লাহ্ খান) আত্মীয়।[৩]

হাজী আহমদ তাঁর উপর প্রসন্ন থাকার কারণে নবাব শুজা-উদ-দৌলার মৃত্যুর [আগ] পর্যন্ত আতাউল্লাহ্ খানের উন্নতি হতে থাকে। নবাব শুজা খানের মৃত্যুর পরে নবাব আলা-উদ-দৌলা (সরফরাজ খান মরহুম) হাজী আহমদের উপর প্রসন্ন ছিলেন না বলে আতাউল্লাহ্ খানকে আকবর নগরের (রাজমহল) ফৌজদারের চাকুরি থেকে পদচ্যুত করেন এবং নিজের আত্মীয় হাসান মোহাম্মদ খানকে সেই পদে নিযুক্তি প্রদান করেন।[৪] এই আদেশ অবগত হওয়ার পর হাজী আহমদ রায়রায়ান আলম চাঁদের মাধ্যমে অবনমিতভাবে ও কাকুতি মিনতি করে আতাউল্লাহ্ খানকে বছর শেষ না হওয়া

১। হাজী আহমদ খানের জামাতা ছাড়া আতাউল্লাহ্ খানের আর যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে তিনি ছিলেন নবাব শুজা খানের গোষ্ঠীভুক্ত আত্মীয়। তাঁর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

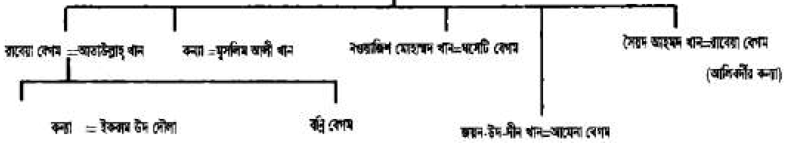

২। কারতলব খান উপাধি ছিল নবাব মুর্শিদ কুলী খানের। আলোচ্য কারতলব খান নবাব মুর্শিদ কুলী খান নন, তিনি ছিলেন নবাব শুজা-উদ-দীন খানের চাচাত ভাই ('বনি-ই-আম্মে শুজা-উদ-দৌলা বুদ'= بنی عم شجاع الدوله بود

৩। মূল. ফা. পাঠ ঃ 'উ'রক-ই-কেরাবতি বা খান-ই-মযকুর দাশ্‌ত্' (عرق قرابتی با خان مذکور داشت) 'Kept relationship with that khan'.

৪। এ সম্বন্ধে সরফরাজ খানের বর্ণনা (পূর্বে উল্লিখিত) দ্রঃ।

পর্যন্ত সেখানে চাকুরিতে বহাল রাখার জন্য নবাব আলা-উদ-দৌলার নিকট আবেদন করেন।[৫] কারণ, হাঁজী আহমদ তাঁর নিজের সাংসারিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁর ভাই (নবাব আলিবর্দী খান)-কে আজিমাবাদ থেকে [মুর্শিদাবাদে] আনয়ন করার জন্য বরাবরই আগ্রহী ছিলেন এবং এটিই ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর চির অধপতনের কারণ। সেই সময় বিহার থেকে বাঙলায় আসার একমাত্র পথ ছিল সিক্রিগলির ভিতর দিয়ে। আলিবর্দী খান সেই পথ দিয়ে বাঙলায় এসে তাঁর উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করেন এবং সেই সব কথা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি [বাঙলার] নবাব হয়ে আতাউল্লাহ খানকে আকবর নগরের ফৌজদার হিসাবে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করেন এবং সেই সঙ্গে ভাগলপুরের [ফৌজদারের] দায়িত্বও তাঁকে প্রদান করা হয়। তাঁকে অতিরিক্ত দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত ও পদচ্যুত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

শাহাম্মত জঙ ও তাঁর বেগম আতাউল্লাহ্ খানের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন থাকার কারণে দিন দিন তাঁর উন্নতি হতে থাকে এবং তিনি সম্রাটের নিকট থেকে ছয় হাজার অশ্বারোহীর মনসবদারি, নওবত ও ঝালর দেওয়া পালকি ব্যবহারের অনুমতি এবং ইজাজ-উদ-দৌলা বাহাদুর সাবিত জঙ উপাধি লাভ করেন। তাঁর পরিণতির কথা] পরে বর্ণিত হবে।

ইরাজ খান[৬] ঃ ইরাজ খানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল। তাঁর পিতামহ মোস্তফা কুলী খান সম্রাট আলমগীরের (১৬৬০-১৭০৭ খ্রিঃ) পুত্র শাহজাদা আজম শাহ্র গৃহের দিওয়ান ছিলেন। পরে শাহ্জাদা গুজরাটের আহ্মদাবাদে অবস্থানকালে তিনি (মোস্তফা কুলী খান) সেই রাজ্যে উঁচু পদে নিযুক্তি লাভ করেন। তাঁর তিন পুত্র ছিল। তাঁরা ছিলেন ইরাজ খানের পিতা আকবর কুলী খান, শাহ্ কুলি খান ও মীর্জা মোহাম্মদ তকী খান। এঁদের প্রত্যেকেই বিশেষ করে প্রথম দু'জন অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। মোস্তফা কুলী খান শাহ্জাদার জীবিতকালেই মৃত্যুবরণ করেন। যুদ্ধের[৭] কিছুদিন আগে শাহ্জাদা শাহ্ কুলি খানকে গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধে তিনি (ও শাহ্জাদা আজম) নিহত হন। শাহ্জাদা মোহাম্মদ

৫। গ্রন্থকার এখানে কিছুটা সত্য কথাই বলেছেন। তবে প্রায় সব দোষ হাজী আহমদের ঘাড়ে চালিয়ে দিয়ে আলিবর্দীর জন্য সাফাই গাওয়ার প্রচেষ্টা আলিবর্দীর অপরাধ ঢাকতে পারেনি।

৬। ইরাজ খানের বংশ তালিকাঃ

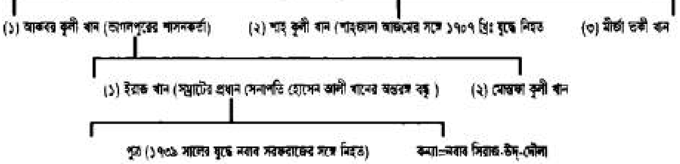

৭। সিংহাসনের দাবি নিয়ে অওরঙ্গজেবের পুত্রদের মধ্যে ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয় এবং যে যুদ্ধে শাহজাদা আজম নিহত হন এখানে সেই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ফররুখ সিয়ারের বাঙলায় অবস্থানকালে আকবর কুলি খান সসম্মানে সেখানে বসবাসরত ছিলেন কিন্তু তখন তিনি কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন সেই সংবাদ গ্রন্থকারের জানা নেই। আকবর কুলি খানের মৃত্যুর পর সম্রাট ফররুখ সিয়ারের রাজত্বকালে (১৭১৩-১৯ খ্রিঃ) ঘয়রত খানের[৮] সঙ্গে ইরাজ খানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এবং তাঁর (ইরাজ খান) দিন বিনা অসুবিধায় অতিবাহিত হয়। সৈয়দ ভাইদের হত্যা ও ফররুখ সিয়ারের রাজত্বের অবসানের পর ইরাজ খান গুজরাটে মোবারেজ-উল-মুলক সরবলন্দ খানের কাছে যান এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপরে সেই বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বাঙলায় চলে আসেন।

নবাব শুজা-উদ-দৌলা মরহুম ইরাজ খানের পূর্ব পুরুষদের খুব ভাল করেই জানতেন। তিনি তাঁকে তাঁর বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের দলভুক্ত করেন। নবাব আলিবর্দী খানের সঙ্গে যুদ্ধে নবাব আলা-উদ-দৌলা (সরফরাজ খান)-র সঙ্গে ইরাজ খানের পুত্র নিহত হন এবং ইরাজ খান নিজেও আহত হন। তিনি কিছুকাল তাঁর নিজের গৃহেই অবস্থান করেন। অতঃপর সেই সময়ের শাসকগণ তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং নবাব আলিবর্দীর সরকারে তাঁর জন্য একটি চাকুরির ব্যবস্থা করেন। আতাউল্লাহ খান ইজাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে ইরাজ খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থাকার কারণে তিনি (ইরাজ খান) অধিকাংশ সময় তাঁর সঙ্গেই অতিবাহিত করতেন। ইতোমধ্যে আতা-উল্লাহ্ খানের যে কন্যার সঙ্গে সিরাজ-উদ-দৌলার বিবাহের বাগ্‌দান কার্য সমাধা হয়েছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। কয়েক পুরুষ ধরে ইরাজ খানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে নবাব আলিবর্দী পরিচিত ছিলেন। তিনি ইরাজ খানের কন্যার সঙ্গে সিরাজ-উদ-দৌলার বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেন।[৯] [এই বিবাহের পরে] নবাব ইরাজ খানকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন এবং বাঙলার কিছু অঞ্চলের দায়িত্ব নবাব তাঁকে দেন।

৮। সম্রাট ফররুখ সিয়ারের প্রধান সেনাপতি ও অতিশয় প্রভাবশালী সৈয়দ হোসেন আলীর (অতি প্রভাবশালী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠজন) চাচাত ভাই ছিলেন ঘয়রত আলী খান।

৯। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার এই পত্নী সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে অতি পরিচিত সিরাজ মহিষী লুৎফুন্নেসা বেগম নন, এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই। গ্রন্থকার এখানে সিরাজের বিবাহের উল্লেখ করলেও একটি অতিরিক্ত কথাও বলেননি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কটক ও বালেশ্বরে মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবাবের অভিযান, রঘুজীর পুত্র জানুজীর কটকে আগমন ও মীর মোহাম্মদ জাফর খানের পলায়ন

বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে রঘুজীর প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সৈন্যদের বিশ্রাম ও আরামের জন্য নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। কিন্তু কটক, বালেশ্বর ও মেদিনীপুরে মারাঠা সৈন্যের অবস্থান তাঁর মনকে পীড়া দিতে থাকে এবং তাদেরকে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় তাঁর অবহেলা ছিল না। আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কটক রাজ্যের সুবাদারির খিলা'ত নবাব সওলত জঙকে প্রদান করা হবে এবং তাঁর নায়েব-নাজিমের পদ দেওয়া হবে মীর মোহাম্মদ জাফর খানকে।[১] এই [সিদ্ধান্ত] অনুসারে মীর মোহাম্মদ জাফর খানকে কটকের নায়েব-সুবাদার, মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদারের খিলা'ত নবাব কর্তৃক প্রদত্ত হয়। তাঁকে মণি-মুক্তা খচিত একটি সরপেচ, মণি মুক্তা, একটি ক্ষুদ্র তরবারি, হস্তী এবং অশ্বও প্রদান করা হয়। এ' সবই ছিল তাঁর বরাবরের চাকুরি বখশিপদের অতিরিক্ত।[২]

নবাব সওলত জঙও তাঁকে দিলেন মণি-মাণিক্য খচিত একটি খিলা'ত। নবাবের সামনেই মীর মোহাম্মদ জাফর খান তাঁর নায়েব বখশির পদ তাঁর আপন চাচার ছেলে মীর ইসমাইলকে[৩] প্রদান করেন এবং সুজান সিংহ[৪] নামক এক ব্যক্তিকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে হিজলীর ফৌজদার হিসাবে প্রেরণ করেন। নবাবের আদেশ অনুসারে সাত

১। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৩ পৃঃ) আছে।

২। মীর মোহাম্মদ জাফর খান আগে থেকেই সেনাবাহিনীর বখশি পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত আছে।

৩। আগে (২ পরিচ্ছেদ) মীর মোহাম্মদ জাফর খানের বংশ তালিকা দ্রঃ। সিয়ার মতে (সিয়ার-ই, ২য় খন্ড, ২৩ পৃঃ) মীর ইসমাইল ছিলেন মীর জা'ফরের আপন মামাত ভাই এবং তিনি তাঁকে নবাবের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন। সেখানে আছে ঃ "These appointments being over, that general deputed Mir Ismail, son to his maternal uncle, to act as his agent at Court, and likewise, as his substitute in the Paymaster, office;"। তবে অন্যত্র তাঁকে মীর জাফরের ভাই ও চাচাত ভাই হিসাবে দেখান হয়েছে। খুব সম্ভব মীর ইসমাইল ছিলেন মীর জা'ফরের চাচাত ভাই।

৪। ফা. পাঠ, 'সুজান সিংহ' (سجان سنگھ) 'Sudjan-sing'।

কি আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও দশ কি বার হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে তিনি কটক রাজ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা ও মারাঠাদের সেখান থেকে উৎখাত করার জন্য অগ্রসর হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করেন। তিনি মেদিনীপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। যেসব মারাঠা ও আফগান সৈন্য সেখানে (মেদিনীপুরে) ছিল তারা দ্রুতবেগে বালেশ্বরের দিকে পলায়ন করে।

মীর মোহাম্মদ জাফর খান মেদিনীপুরে এসে কনসাই[৫] নদীর তীরে শিবির স্থাপনের জন্য আদেশ দেন। তাঁর মেজাজ ছিল আরাম ও আয়েশের দিকে অতি বেশি অনুরক্ত। জনৈক হাকিম বেগের পুত্র গোলাম আলী ও মীর আলী খান সদ্বংশজাত বলে দাবি করলেও তাঁদের চরিত্রগত নীচুতা ছিল এবং জাফর খানের মনের উপর তাঁদের পূর্ণ প্রভাব ছিল এবং [তাঁর সঙ্গে] তাঁরা দিনরাত মদ খেয়ে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে পড়ে থাকতেন। কটক থেকে অগ্রসর হয়ে মারাঠাদের সম্মুখীন হয়ে সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার করার জন্য নবাব বারবার পত্র লিখলেও প্রকৃতপক্ষে জাফর খান তাতে কান দেননি।[৬] [অবশেষে] সংবাদ পাওয়া গেল যে, রঘুজীর পুত্র জানুজী কটকের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। গভীর বিবেচনার পর নবাব বুঝতে পারেন যে, মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানের পক্ষে মারাঠাদের সম্মুখীন হওয়া ও তাদের বিতাড়িত করা সম্ভব হবে না। সুতরাং নবাব নিজেই তাঁর বিজয়ী বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। সেই বাহিনীতে ছিলেন নবাব সওলত জঙ, আতা উল্লাহ খান, হায়দর আলী খান, ফকির উল্লাহ বেগ খান, আফগান সেনাপতিদের মধ্যে শমশির খান, সরদার খান ও ওমর খান প্রমুখ। আতাউল্লাহ খান ইজাজ-উদ-দৌলার আমন্ত্রণে ভারতে আগত জনৈক আলী আসগর কোব্‌রা[৭]ও মহাসম্মানের সঙ্গে [সেখানে] যান। [নবাবের] পতাকা বর্ধমান অভিমুখে যাত্রার জন্য উত্তোলিত হয়।

ইতোমধ্যে জানুজীর অগ্রগামী বাহিনী কনসাই নদীর অপর তীরবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে কয়েকটি হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। সেই সময়ে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য মিলিয়ে মীর মোহাম্মদ জাফর খানের কাছে ষোল কি সতের হাজার সৈন্য ছিল। ঘটনার কারণ সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান না করে এবং প্রকৃত অবস্থা অবগত না হয়ে, তরবারি বা বর্শার ব্যবহার না করে তিনি [সোজা] বর্ধমান অভিমুখে পা বাড়ালেন।[৮] কিকরীতে তাঁর

৫। ফা. পাঠ, 'রুদখানা-ই-কনসাই' (رودخانه کنسای) 'Kehnasa river'।

৬। প্রকৃত পক্ষে মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল এ ধরনেরই। তিনি শুধু বিশ্বাসঘাতকই ছিলেন না, সাহসিকতার অভাবও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল।

৭। এই আলী আসগর কোবরা সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খন্ড, ২৪ পৃঃ) বিশদ বর্ণনা আছে। সেখানে কোবরা, মীর মোহাম্মদ জাফর খান ও আতাউল্লাহ খান যে আলিবর্দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই বর্ণনাও আছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে সেই ষড়যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না।

৮। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

সঙ্গে নবাবের সাক্ষাৎ ঘটে। [তাঁর পলায়নের] সংবাদ পেয়ে নবাব বর্ধমান থেকে সেখানে এসে পৌছেন। তাঁকে প্রদত্ত কর্তব্য পালনে জাফর খান অবহেলা করেছিলেন এবং অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। বিস্তর সৈন্য থাকা সত্ত্বেও শত্রুর আগমনে পলায়ন করার মতো কার্য সাহসিকতার বিচারে ছিল আশ্চর্যজনক ব্যাপার এবং বীরত্বের বিচারে অতিশয় নিম্নস্তরের। নবাব ক্রোধ মিশ্রিত স্বরে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁকে তাঁর শিবিরে ফিরে যেতে অনুমতি প্রদান করেন। এইসব ছিল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক।

'সত্য তিক্ত'[৯] এই বাণী অনুসারে মীর মোহাম্মদ জাফর খান [নবাবের কথায়] ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দরবারে উপস্থিত হওয়ার কর্তব্য থেকে বিরত থাকেন। নবাব তাঁর অন্তর্নিহিত দয়া ও মহানুভবতার কারণে মীর মোহাম্মদ জা'ফরের এক মৃত আত্মীয়ের জন্য 'ফাতেহা' পাঠের অনুষ্ঠানে নিজেই তাঁর (জাফর খানের) তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হন। মীর জাফরের কাছে [তখন] সাত কি আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। তিনি নিজেকে ভ্রান্ত পথে চলতে দেন এবং নবাবকে অভ্যর্থনা করার ব্যাপারে সঠিক আদব-কায়দা পালন করেন নি এবং সেই কাজ তাঁর পক্ষে যথাযথ হয়নি।[১০]

নবাব তাঁর শিবিরে ফিরে এসে মীর জাফরের বোকামি ও ধৃষ্টতা উপলব্ধি করেন। তিনি মীর জাফর খানের হিজলীর সহকারী সুজান সিংহকে ডেকে পাঠান সেখানকার বন্দরের হিসাব দেখাবার জন্য। জাফর খান তাঁকে [নবাবের কাছে] প্রেরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে পাঠালেন যে, এই দায়িত্ব তাঁর নিজের। এই অশোভনীয় উত্তরে নবাব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মীর সৈয়দ মোহাম্মদ ইসাওলকে[১১] কয়েকজন ভৃত্যসহ প্রেরণ করেন সুজান সিংহকে শান্তভাবে বা জোর করে যে কোনো প্রকারেই হোক ধরে আনার জন্য। এই দূত ছিলেন রূঢ় প্রকৃতি ও বদ মেজাজের লোক। তিনি জাফর খানের নিকট গিয়ে কয়েকটি কঠিন বাক্য উচ্চারণ করেন এবং সুজান সিংহের হাত ধরে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।[১২] পরদিন [নবাব] সুবিধার কারণে সুজন সিংহকে হিজলীর ফৌজদারের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করেন এবং বখশীর পদে নিযুক্ত করা হয় নূর উল্লাহ [বেগ] খানকে। নবাব মীর মোহাম্মদ জাফর খানকে পদচ্যুত করে তাঁর সৈন্য দল ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। এই পদচ্যুতি ও নিয়োগাদি জাফর খানের অন্তরে আঘাত হানে। তিনি অবনমিত হন এবং অজানার অন্ধকারে তলিয়ে যান।

৯। আরবি বচন, 'আল্ হাক্কু মুর্‌রুন' اَلحَقُّ مُرٌّ 'Truth is bitter'।

১০। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ) যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে তা এই বর্ণনারই অনুরূপ।

১১। মূল ফা. পাঠ, 'মীর সৈয়দ মোহাম্মদ ইসাওয়াল' میر سید محمد اساول '(Mir Sayyid Muhammad Yasawal')। সিয়ার মতে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৭ পৃঃ) এই ব্যক্তির নাম "Syed mahmed, one on his yessaols or Mace bearers."

১২। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ) বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই দুই বর্ণনা প্রায় একই ধরনের।

সেই সময় বিজয়ী বাহিনীর শিবিরের কছে জানুজীর আগমনের সংবাদ নবাবের নিকট আসে। পরদিন প্রভাতে মারাঠা ও আফগান সৈন্যরা [নবাবের বাহিনীর] সম্মুখীন হওয়া ও [তাদের বিরুদ্ধে] যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। এদিক থেকে নবাব তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সাগরের ঢেউয়ের মতো অগ্রসর হন এবং স্বর্গ ও নরকের দল একে অন্যের সম্মুখীন হয়।[১৩] তীর নিক্ষেপ করে, রক্তপানকারী তরবারি ও প্রাণঘাতী বন্দুকের গুলির আঘাত দিয়ে ইসলামী সৈন্যবাহিনী দাক্ষিণাত্যের সৈন্যদের মগজ থেকে প্রায়ই ধুয়া নির্গত করেছিল।[১৪] এই যুদ্ধে আলী আসগর কোব্‌রা বীরত্বে ও সাহসিকতায় অনেক বীরকে অতিক্রম করেন এবং বহু মারাঠা সৈন্যকে বধ করেন। প্রতিরোধের কোনো ক্ষমতা তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট নেই এবং সেই শক্তি তাঁর কাছ থেকে চলে যাচ্ছে দেখে জানুজী পলায়নের পথ অবলম্বন করেন।

এরপরে যুদ্ধ করার সর্ব ক্ষমতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত এবং যুদ্ধে জঙ্গলের সিংহ সম প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই দেখে লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে জানুজী মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। নবাব এই সংবাদ অবগত হয়ে অতি দ্রুতগতিতে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন[১৫] এবং মুর্শিদাবাদ নগরের অধিবাসীদের কোনো ক্ষতি হতে দেন নি। [বিজয়ী বাহিনীর] বীর সৈন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আঘাতের কথা স্মরণ করে জানুজী এবার মুর্শিদাবাদ নগরের উপকণ্ঠে কিছু আক্রমণ করেন [কিন্তু] নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হন। কোনও প্রকার বিলম্ব বা দ্বিধা না করে এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে নবাব তাঁর শত্রুধ্বংসকারী সেনাবাহিনীসহ তাঁর পিছনে ধাওয়া করেন। [পথে] কোথাও না থেমে জানুজী মেদিনীপুরে পৌঁছেন। বর্ষাকাল সমাগত দেখে এবং তাঁর রণক্লান্ত সৈন্যদের বিশ্রামের প্রয়োজনে শত্রু ধ্বংস সাধনের কার্য পর বছর পর্যন্ত স্থগিত রেখে নবাব বিজয়ী বেশে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩। আরবি বচন, 'ফারিকুম মিনাল জান্নাতে ওয়া ফারিকুম মিনাশ সায়ির'
فَرِيق مِنَ الجَنَّة وَ فَرِيق مِنَ السَّعِير 'the party of Paradise and Hell'.

১৪। মূল ফারসি, 'হামিয়ান-ই-হোযা-ই-ইসলাম বরমে সহাম ওয়া যরব-ই-তিগ-ই-খুন্ আশাম ওয়া বরক আন্দাযান-ই-জানসিতান্ বযাদান-ই-শলক পায়বরপায় দুদ আয্ দিমাগ-ই-ফৌজ-ই-দকন বর আওরদন্দ্'
حمیان حوزۂ اسلام بر می سهام و ضربستیغ خون آشام و برق اندازان جانستان بزدن شلک
پی برپی دود از دماغ فوج دکن براوردند
পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১২১ পৃঃ) ঃ "The Islamic heroes by their blows and rapid masket fire caused smoke to come out of the brains of the Deccani trops." স্যার যদুনাথের এই পাঠকে ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে এবং এতে মূল ফা. পাঠের সঙ্গে সঙ্গতির অভাব লক্ষণীয়। এ. এস.-এর পাঠ, (৬৫ পৃঃ) "The helpers of the Islamic party, by the throwing of the arrows and the striking of the blood.drinking swords and by the firing of the guns by the soul-extracting musketeers, frequently brought out the smokes from the brains of the Deccani troops." এই পাঠ সঙ্গত।

১৫। স্যার যদুনাথ (১২২ পৃঃ) এই বাক্যের অনুবাদ দিয়েছেন, "The Nawab without delay set out in pursuit of him"। এই ভাবানুবাদে মূল ফা. পাঠের সঙ্গে সঙ্গতি নেই।

উপরে উল্লিখিত যুদ্ধে আলী আসগর কোবরা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিলেও তাঁর আচরণে বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন[১৬] প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাঁকে সাহায্য ও সহায়তা দান করতে গিয়ে আতাউল্লাহ্ কতগুলি নিস্ফল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নবাব আলী আসগর কোবরাকে পদচ্যুত ও মুর্শিদাবাদ থেকে বহিষ্কৃত করেন।[১৬] সংক্ষেপে, সেই বছরের বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হলে, 'রাজত্ব করা ও গ্যাফিলতি (অবহেলা করা) এক সঙ্গে চলতে পারে না'[১৭] এই বাক্য স্মরণ করে নবাব তাঁর সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে জানুজীকে বিতাড়িত করার অভিপ্রায়ে মুর্শিদাবাদ থেকে মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হন। উল্লিখিত ব্যক্তি বিজয়ী বাহিনীর হাত থেকে পাওয়া আঘাত এবং তাদের তরবারির আঘাতের ফলে তাঁর (জানুজী) সৈন্যদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মনে মনে এত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে, তিনি যুদ্ধ করার কথা ভাবতেও পারেন নি। মারাঠাদের প্রচলিত রীতি অনুসারে নবাবের আগমনে তিনি বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্যে, যথা বিষ্ণুপুর ও পাচেটে প্রবেশ করেন।

জানুজীর পশ্চাদ্ধাবনে ক্ষান্ত না হয়ে নবাব তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে [সেই] অরণ্যাঞ্চলে প্রবেশ করেন। জানুজী প্রত্যেকটি দিবস এখানে-ওখানে এবং প্রতিটি রজনী অরণ্যে অতিবাহিত করেন। শিবিরে খাদ্যশস্য সরবরাহের অভাব হেতু খাদ্যশস্যের মূল্য এত বৃদ্ধি পায় যে, চাউল ও ঘৃতের মূল্য প্রতি টাকায় এক সের এবং কমপক্ষে প্রতি টাকা দুই সের হয়ে যায় এবং তাও অনেক চেষ্টার পর পাওয়া যেত। ভোজ্য তেল দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল।[১৮] ফলে সেনাবাহিনীর লোকেরা ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে এর পরিবর্তে কিছুদিন গরুর চর্বি ব্যবহার করে।

১৬। এ সম্বন্ধে সিয়ার (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৮ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। আলিবর্দীর বিরুদ্ধে কোবরার ষড়যন্ত্রের কথা সিয়ারে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নবাব তাঁকে মুর্শিদাবাদ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিলে নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান আতাউল্লাহ খানের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সেই আদেশ পালন মূলতবি রাখেন। নবাব মুর্শিদাবাদের কাছে এসে তাঁকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করেন। এ সম্বন্ধে করম আলী খান (য. না.-৪৩ পৃঃ দ্রঃ। আতাউল্লাহ খানের ব্যাপারে গ্রন্থকারের দুর্বলতা ছিল বলে দেখা যায়।

১৭। মূল ফা. পাঠ, 'জাহাঙ্গিরি তোঘাফিল বর নাতবাদ' جهانگیری تغافل برنتابد 'Kingship does not exist with negligence'।

১৮। মূল ফারসী 'ওয়া জানু হর রোজ জায়ে ওয়া হর শব বসেহ্রায বসর মি বোরদ্ ওয়া বসবব্-ই-আ'দম রসিদান গিলাত নব্খ হবুব দর লশকর বমুবতবা-ই-তা'সির গেরেফ্ত্' وجانوهر روز جائی و هر شب بصحرائی بسرمی برد و بسبب عدم رسیدن غلات نرخ حبوب در لشکر بمب تبعهٔ تعسیر گرفت

পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১২২ পৃঃ), "Januji passed every day at a (different) place and every night in the wilderness. As provisions did not reach our army, the price of food stuffs reached famine levels in our camp and rice and ghee of our troops became totally unobtainable." এই ভাবানুবাদ কষ্টকল্পিত। এ. এস.-এর অনুবাদ ঃ "... and because of the absence of the arrival of provisions, the price of grains in the camp rose to isuch a point..." । এই অনুবাদ অর্থবহ ! কিন্তু মূল ফারসি পাঠ পড়ে বোঝার উপায় নেই, আলিবর্দী না মারাঠাদের শিবিরে খাদ্যাভাব ঘটেছিল যদিও বিশদ বর্ণনা দেখে ধারণা করা যায় যে, এই ঘটনা আলিবর্দীর শিবিরেই ঘটেছিল।

. আতাউল্লাহ্ খান, শামশির খান ও সরদার খানের নেতৃত্বে অগ্রগামী বাহিনী অরণ্যাঞ্চলে শত্রুদের অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে কয়েক ক্রোশ এগিয়ে গিয়েছিল। সেখানে অরণ্য এত গভীর ছিল যে, তিন দিন ধরে তাদের সম্পর্কে কোনো সংবাদই নবাব পাননি। [সেই সময়ে] তাদের একদলও অন্য দলের অনুসন্ধানে থাকে। অনেক চিন্তার পর নবাব তাঁর ও নবাব সওলত জঙ্গের বাদ্যকরদের এই মর্মে আদেশ দেন যে, তারা যেন বিভিন্ন স্থান থেকে সজোরে নাকাড়া বাজায় যাতে বাদ্যধ্বনি শুনে তাদের একদল অন্য দলকে খুঁজে পায়। নবাবের গৃহীত কর্মপন্থা সঠিক ছিল এবং এই সাদাসিধা পরিকল্পনা কার্যকরী হয়। অগ্রগামী সেনাবাহিনী খুব দূরে না থাকলেও অরণ্যের গভীরতার জন্য একে অন্যের সন্ধান পায়নি এবং ঢাকের বাদ্যধ্বনি শুনে চতুর্থ দিনে তারা এসে নবাবের খেদমতে লাগার সৌভাগ্য লাভ করে।

অরণ্যে অবস্থানকালে জানুজী নবাবের সৈন্যদের সম্মুখীন হতে চাননি এবং হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় বিষ্ণুপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তিনি বর্ধমানে চলে যান। এই সংবাদ পাওয়ার পর নবাব নিজেও কঠিন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হন। নবাবের আসন্ন আগমন বার্তা জানুজীর শ্রুতিগোচর হলে কোনো যুদ্ধ না করেই তিনি মেদিনীপুরের দিকে এগিয়ে যান। বিজয়ী বাহিনীর সম্মুখীন হতে জানুজীর অক্ষমতা দেখে এবং তাঁর নিজ বাহিনীর সৈন্যদের পথশ্রান্ত দেখে নবাব মুর্শিদাবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জানুজীকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার কাজ পর বছরের জন্যে স্থগিত রাখেন।[১৯]

১৯। নবাবের অক্ষমতাকে ঢাকার প্রচেষ্টা গ্রন্থকারের রচনায় সুস্পষ্ট।

উনবিংশ অধ্যায়

শমশির খান ও অন্যান্য আফগানের বিদ্রোহ, জয়ন-উদ-দীন খানকে হত্যা ও আজিমাবাদ অধিকার এবং নবাবের আজিমাবাদে অভিযান ও বিদ্রোহীদের পতন

এই বিস্তারিত ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল। বিজয়ী বাহিনীর কাছে বারবার পরাজিত ও [তার ফলে] হতাশাগ্রস্ত হয়ে রঘু ভোঁসলা ছলনা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১] শমশির খান ও সরদার খানের দুর্বৃত্ততার আরম্ভ সেখান থেকেই। তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে তিনি (রঘু) প্রস্তাব দেন যে, তাঁদের আনুগত্যের বিনিময়ে আজিমাবাদের সুবাদারের পদ আতাউল্লাহ্ খানকে, শমশির খান ও সরদার খানকে নগদ এক লক্ষ [করে] টাকা এবং জয়ন-উদ-দীন খানকে হত্যা করা ও আজিমাবাদ অধিকারের জন্য আরও দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে তাঁদেরকে দারভাঙ্গা'র ফৌজদারি এবং বার হাজার অশ্বারোহীর চাকুরি দেওয়ার আশ্বাসও প্রদান করা হয়।[২] এ কারণে উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাপারে এগিয়ে আসেন এবং কলহ ও বিদ্রোহের অভিপ্রায়ে [নবাবের] চাকুরি থেকে পদত্যাগ করেন।[৩] নবাব তাঁদেরকে নানাভাবে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে তাঁদেরকে পদচ্যুত করেন।

১। মূল ফা. 'রঘু ভোসলা বা'দ আয্ আন্‌কেহ্ বকেরাত ওয়া মেরাত আয্ যরব্-ই-দস্ত-ই-গাযীয়ান-ই-ফিরোযী নিশান খায়েব ওয়া খাসের গরদেদ দর সদদ-ই-হিলা ওয়া তয্‌ভির কুশিদাহ্' ر گهو بهو سلا بعد از آنکه بکرات و مرات از ضرب دست غازیان فیروزی نشان خائب و خاسر گردید در صدد حیله و تزویر کوشیده পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১২২পৃঃ), "Raghu Bhonsle, after being repeatedly beaten by our troops, took to cunning and deception." এই ভাবানুবাদ অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ।

২। মূল ফারসি 'দর যমন-ই মরাসিলাত বশরত-ই-ইত্তেফাক বআতাউল্লাহ্ খান নিযামত-ই-আযিমাবাদ ওয়া ব-সরদার খান ওয়া শমশির খান লাক রুপিয়াহ্ নকদ ওয়া দুহ্ লাক রুপিয়াহ্ ব-ওয়াদাহ্-ই-কুশতান-ই-যয়ন-উদ-দীন আহমদ খান ওয়া ব-তসরফ আওরদান-ই-আযিমাবাদ যামিয়াহ্-ই-ফৌয্‌দারি-ই-দরভাঙ্গা ওয়ানকরি-ই-দোওয়াযদাহ্ হাযার সওয়ার ওয়াদাহ্ নমুদ' در ضمن مراسلات بشرط اتفاق بعطاء الله خان نظامت عظیم آباد و بسرداد خان و شمشیر خان لک روپیه نقد و دو لک روپیه بوعدهٔ کشتن زین الدین احمد خان و بتصرف آوردن عظیم آباد با ضمیمهٔ فوجداری در بهنگه و نوکری دوازده هزار سوار وعده نمود পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১২২ পৃঃ) দিয়েছেন, "and wrote offering, in return for alliance with him, the governorship of Bihar to 'Ataullah Khan', and one lakh of rupees in cash to Sardar Kh. and Shamsher khan and two lakhas of rupees on condition of Killing Zain- ud -din Ahmed Kh. and seizing the city of Patna, alongwith the faujdari of Darbhanga and the enlistment of /2000 (Afghan) horsmen." এই ভাবানুবাদ মোটামুটিভাবে অর্থবোধক হলেও মূল ফা. পাঠের সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতিবিহীন। ডক্টর এ. এস.-এর অনুবাদ মোটামুটিভাবে ঠিক হলেও আজিমাবাদের গভর্নরের ('নিযামত') স্থলে ডিপুটি গভর্নর (Dy. governor)-এর কথা আছে এবং আতাউল্লাহ খানকে যে সেই পদ দেওয়া হবে সেই উল্লেখ তাতে নেই।

৩। সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১৭ পৃঃ) বলা হয়েছে যে, ১১৫৯ হিজরী (১৭৪৬-৪৭) সনে এই দুই আফগান সেনাপতিকে বরখাস্ত করা হয়।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের (আফগান) সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় কি সাত হাজার এবং দারভাঙ্গাতে তাঁরা বহুকাল ধরে বসবাসরত ছিল এবং সেখানে তাদের বাড়িঘর ছিল। তাঁরা সবাই তাদের বেতন আদায় করে দারভাঙ্গার দিকে অগ্রসর হয়। একজন বর্ণনাকারীর [বিবরণ] থেকে জানা যায় যে, গোলাম মোস্তফা খানের বিদ্রোহ করার সময় শমশির খান ও সরদার খানের নিকট বার্তা প্রেরণ করে তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁদের ঐক্য ও বন্ধুত্ব চেয়েছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় তাঁদের নিজেদের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার কারণে এবং এ ধরনের কার্য রাজদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হতে পারে এই বিবেচনায় তাঁরা গোলাম মোস্তফা খানের সঙ্গে ঐক্যমত নিরর্থক ও লজ্জাজনক বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা নেতিবাচক উত্তর দেন এবং নবাবের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের প্রমাণ নতুন করে দেন এবং বিশ্বস্ততার পথ থেকে তাঁরা পা সরিয়ে আনেননি।[৪]

১১৫৮ হিজরী (১৭৪৫-৪৬ খ্রিঃ) সনে গোলাম মোস্তফা খান নিহত হলে, এবং সে ঘটনা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, শমশির খান ও সরদার খান উপরে উল্লিখিত কারণে নবাবের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং [তাতে] তাঁদের [মনের] ইচ্ছারও পূরণ হয়েছিল অর্থাৎ তাঁদের ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাঁদের [অধীনস্থ] জনবলও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। অতীতের তুলনায় তাঁদের জনবল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে দেখে তাঁদের মনে যেসব পরিকল্পনা ছিল তা কার্যে পরিণত করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হন।

সেই উল্লিখিত বছরের শেষ দিকে যে অবস্থায় বাঙলায় রঘুর আগমন ঘটেছিল সেই কথা বিস্তারিতভাবে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তিনি (রঘুজী) মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠের চারদিকে অবরোধের ব্যবস্থা করেন এবং এর মাধ্যমে যাতে ভগবান গোলা থেকে মুর্শিদাবাদে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য না আসতে পারে তা-ই তিনি চেয়েছিলেন। কারণ, মুর্শিদাবাদ ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এবং গঙ্গা থেকে নির্গত এর উৎসমুখ বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে হাঁটু জলে পরিণত হয় এবং পশ্চিম দিক থেকে কয়েকটি খালের সংযোগ থাকায় নৌ চলাচল ব্যবস্থা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে গঙ্গার অপর তীরবর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত যে সব শস্যাদি সেখান থেকে মুর্শিদাবাদে আসে তা মুর্শিদাবাদ থেকে ছয় কি সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত ভগবান গোলাতে নৌকায় করে আনতে হয়।

নবাব সেই সময়ে আমানিগঞ্জে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি শমশির খান ও সরদার খানকে ভগবান গোলার পথ রক্ষা করা ও মারাঠাদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রেরণ করেন। বাহ্যতঃ নবাবের আদেশ পালন করার জন্য তাঁরা ভগবান গোলার পথে যাত্রা করেন। বাঙলাকে শাসন করার উচ্চাভিলাষ তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের হৃদয়ে পোষণ করছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন

৪। এ সম্পর্কে পূর্বে গোলাম মোস্তফা খানের বর্ণনা (১৪ পরিচ্ছেদ) দ্রঃ।

এবং রঘুকে তাঁদের মিত্ররূপে পাওয়ার পরিকল্পনা করেন। রঘুর সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে তাঁরা তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং তাঁদের অভিসন্ধি এমন পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন যাতে তাঁদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সহজভাবে রঘুর কাছে ধরা পড়তে পারে। এ কারণে তাঁরা ভগবান গোলার পথের প্রহরার কার্য এমন [ইচ্ছাকৃত] ভাবে অবহেলা করেন যে, মারাঠা সৈন্যরা বেশ কয়েকবার সেই পথে চলাকালীন গরু মহিষাদি, শস্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। এইসব সংবাদের প্রতিবিম্ব [নবাবের] দীপ্তিশীল অন্তরের সম্মুখে প্রতিফলিত হলে নবাব শমশির খান ও সরদার খানকে সেই কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সাঈদ আহমদ সওলত জঙের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করেন।[৫]

সংক্ষেপে, পূর্বের বর্ণনা অনুসারে একদল মারাঠা সৈন্য মীর হাবিবের কাছে মেদিনীপুরে রেখে রঘু পরাজিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে দাক্ষিণাত্যের পথে যাত্রা করেছিলেন। শমশির ও সরদার খানের বিরোধিতার চিহ্ন দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং [তাঁদের কৃত কিছু] কর্মে সেই বিরোধিতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই মর্মে এক জোর গুজব রটে যে, তাঁরা ছল-চাতুরির জন্য অপেক্ষারত এবং সময় হলেই তাঁরা নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার আশ্রয় নিবেন। নবাব নিজেও সরকারি কর্মকর্তাদের সাবধান হওয়ার জন্য ইঙ্গিত প্রদান করেন।

তাঁরা নবাবের নিকট এমন [আর্থিক] দাবি পেশ করেন যে, সেই দাবি মিটাবার অক্ষমতার কারণে তিনি বিপদে পড়ে যান। তাঁদেরকে বহিষ্কার করা সুবিধাজনক বিবেচনা করে তিনি তাঁদের অধীনস্থ ছয় কি সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাঁদেরকে পদচ্যুত ও নগর থেকে বহিষ্কার করেন। এই ঘটনার তিন-চার মাস পরে শীতের প্রারম্ভে মেদিনীপুরে অবস্থানরত মারাঠাদেরকে শাস্তি প্রদান ও সেখান থেকে বহিষ্কার করার উদ্দেশ্যে নবাব আমানিগঞ্জে ছাউনি ফেলেন। বোরহান-উল-মুলকের[৬] প্রাক্তন খানসামা ও বর্তমানে হয়বত জঙের সঙ্গে অতিশয় সম্মানের সঙ্গে অবস্থানকারী মীর আবু-উল-মা'লী [হয়বত জঙের] দূত হিসাবে নবাবের নিকট হয়বত জঙের যে বার্তা দেন তা সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

৫। এ সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১৫ পৃঃ) বিশদ বর্ণনা আছে এবং সেই বর্ণনার একাংশ নিম্নরূপ। "It was for these reasons that the Viceroy who remained at Amanygandj on the southern side of the city, appointed the two Afghan officer's to escort the provisions, and to keep the road clear of the enemys incursions; but these precautions did not prevent the provisions and exen from being several times plundered and seired. So many miscarriages having raised a suspicion in the "Viceroy's mind, he appointed his own" nephew, Sayd-ahmed qhan, to take care of the safety of the roads".

৬। বোরহান-উল-মুলক সাদত খান। তিনি ছিলেন দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্‌র প্রধানমন্ত্রী ও অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি।

"শমশির খান ও সরদার খান পদচ্যুতির পর তাঁদের বাসস্থান দারভাঙ্গাতে এসে বসতি স্থাপন করেছেন এবং একদল আফগান সৈন্য তাঁদের সঙ্গে আছে। এই দলকে এখান থেকে বহিষ্কার করা খুব সহজ নয় এবং কোনো চাকুরি ছাড়া তাদের এখানে অবস্থানও অনেক অসুবিধার কারণ হতে পারে। এই অবস্থায় হুজুরের কাছে আমার অনুরোধ, হুজুর যদি আদেশ দেন তবে তাদের মধ্য থেকে দুই কি তিন হাজার ব্যক্তিকে অশ্বারোহী সৈন্য হিসাবে নিযুক্ত করতে পারি। কিন্তু তাদের বেতন দিবার ক্ষমতা এই রাজ্যের ক্ষমতার বাইরে এবং হুজুরের ভৃত্যেরও সেই ক্ষমতা নেই বিধায় আমার বিনীত অনুরোধ হুজুর অনুগ্রহপূর্বক তাঁদের বেতনের অর্থ যেন দেন।"[৭]

নবাব প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত না হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি হয়বত জঙের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়েছে দেখে উপরে উল্লিখিত মীর প্রত্যাবর্তন করেন এবং হয়বত জঙকে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংবাদ দেন।

বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বিবরণ থেকে জানা গেছে যে, এ কাজের পিছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, তাঁদেরকে তাঁর কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করার পরে তিনি [সুবিধাজনক] সময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন যাতে রওশন খানের মত তিনি তাঁদেরকে বিদায় করে দিতে পারেন এবং তাতে শুধু ত্রিহুত জেলা নয়, সমগ্র বিহার রাজ্য তাঁদের উপদ্রব থেকে মুক্ত হবে এবং এর পরে তাঁদের শক্তি নিয়ে তাঁকে আর মাথা ঘামাতে হবে না।

৭। আলিবর্দীর অন্ধ ভক্ত গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খান এ সম্বন্ধে কিছু না বললেও সিয়ার ও মোজাফফর নামা রচয়িতা উভয়েই এই ব্যাপারে জয়ন-উদ-দীন খানের অশুভ উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৯-৩০ পৃঃ) আছে ঃ

"Three months were already elapsed since his departure, and the season of rain was already over, when Zin-eddin-ahmed-qhan conceived the scheme of becoming independent, as had done Mustapha-qhan, and of submitting his two brothers to his own power and influence. In his late journey to Moorshoodabad, he had cast a prying eye on the power and wealth of his two brothers, and on the Court of his uncle and having reflected on the weakness of the two former, and on the old age of the latter he had concluded that he would prove an over match for both. Full of these ideas he sent an agent to his uncle."

এ সম্পর্কে করম আলী খান বলেন (য. না.-৪৩ পৃঃ), 'Haibat Jang, whose brain was filled with foolish ambition, considering them (the Afghans) to be very brave soldiers, invited them to come to him and enter his service. Alivardi....again and again wrote to Haibat Jang that these generals had now turned disloyal and it was pure futility to enlist them. Haji Sahib, too, dissuaded him."

দ্বিতীয়ত, জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জঙ সাংসারিক ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধেয় খুল্লতাতের কাছে শিক্ষা নিলেও যারা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার বেসাতি করে তাঁদের চেয়ে তাঁর মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার ক্ষমতা ছিল বহুলাংশে উন্নততর এবং নিজের মতামতের উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।[৮]

আজিমাবাদে তাঁর নিজের একজন [বিশ্বস্ত] প্রতিনিধি রেখে যাওয়ার কথা তাঁর চিন্তায় আসে। আফগানদের শক্তি ও সহায়তায় তিনি তাঁর সম্মানিত [ও] বৃদ্ধ খুল্লতাতকে অবসর দান করে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় যথা, শাহামত জঙ ও সওলত জঙের বাঙলা শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ রূপে কমিয়ে এনে প্রশাসনিক সব ক্ষমতা নিজেই গ্রহণ করবেন বলে চিন্তা করেন।[৯] কিন্তু গ্রন্থকার হয়বত জঙের বখশি পরলোকগত মেহদী নিসার খানের[১০] মুখে নিজ কানে শুনেছিল যে, হযবত জঙ তাঁর ন্যায় পরায়ণতার কারণে এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন যে, হাজী আহমদের পরামর্শে আলিবর্দী খান তাঁর পরলোকগত প্রভু নবাব আলা- উদ- দৌলার প্রতি যে আচরণ করেছিলেন তিনিও তার শ্রদ্ধেয় খুল্লতাতের প্রতি সেই আচরণই করবেন।[১১] কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য অশুভ ছিল বলে তা কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতির উদ্ভব হয়। "যে নিজের ভাইয়ের জন্য গর্ত খনন করে সে নিজেই সেই গর্তে পতিত হয়।"[১২] এই বাক্যের মর্মানুসারে বিপদ তাঁর জন্যই সঞ্চিত ছিল।

সংক্ষেপে, মীর আবুল মা'লীর প্রত্যাবর্তন ও অভিপ্রেত উত্তর প্রাপ্তির পর হয়বত জঙ আফগানদের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন এবং তাদেরকে চাকুরি দিতে চান। [তাঁর কথায়] তুষ্ট হয়ে এবং [তাঁর কাছ থেকে] শপথ বাক্য আদায় করে তাঁরা চাকুরি গ্রহণ

৮। মূল ফারসি 'ওয়া দু'অম আন্ কেহ্ আয্ আন্‌জা কেহ্ যয়ন-উদ্-দীন আহমদ খান হয়বত জঙ্গ দর সামুরে-ই-দুনিয়াদারি ওয়া ফনুন-ই-রিয়াসাত আগরচেহ্ আখয্ আয্ উম-ই-বুযুরগ্ ওয়ার-ই-খোদ বুদ লেকিন পায়াহ্-ই-তায্‌ভিয্ ওয়া খোদআ'ই খোদ বমোরাত্তব আ'লাতর আয্ সায়ের আরবাব-ই-খোদআ' ওয়া তয্‌বির দানাস্‌তাহ্ বর আসাবত-ই-রায়-ই-খোদ কামাল ই'তিমাদ দাশ্‌ত্' و دوم آنکه از آنجاکه زين الدين احمد خان هيبت جنگ در امور دنيا داری و فنون رياست اگرچه اخز از عم بزرگوار خود بود ليكن پايهٔ تزويز و خدعهٔ خود بمراتب اعلاتر از ساير ارباب خدع و تزوير دانسته بر اصابت رای خود كمال اعتماد داشت.

পাঠের ইংরেজি অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১২৪ পৃঃ) দিয়েছেন ঃ "(2) Zainuddin Ahmad Khan had learnt the act of ruling and management of affairs from his uncle, but he imagined that he was a cleverer man than any in practising deception and fraud and hence had the utmost confidence in the correctness of his own wisdom". এই ভাবানুবাদ মোটামুটিভাবে অর্থবোধক হলেও মূল ফারসি পাঠের সঠিক অনুবাদ নয়। এ. এস.-এর পাঠ (৭০ পৃঃ) মোটামুটি সঠিক ও অধিক গ্রহণযোগ্য।

৯। পূর্বে উল্লিখিত সিয়ারের বর্ণনার সঙ্গে এখানে ইউসুফ আলীর বর্ণনার যথেষ্ট মিল দেখা যাচ্ছে।

১০। তিনি ছিলেন সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবতবায়ির আপন চাচা। তিনি ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ঘনিষ্ঠ সহচর। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা পরে২৫ পরিচ্ছেদে দ্রঃ।

১১। সংবাদটি আশ্চর্যজনক সন্দেহ নেই তবে তা মিথ্যা নাও হতে পারে।

১২। আরবি বচন, 'মান হাফারা বিইরান্ লিআখিহি ফাকাদ ওয়া কআ' ফিহি مَنْ حَفَرَ بِئْرًا لأخيه فقد وَقَعَ فيه 'He who digs a pit for his brother is himself thrown into it'.

করতে সম্মত হয়। শমশির খান ও তাঁর ভগিনীর পুত্র[১৩] মুরাদ শির খান ও সরদার খান দুই কি তিন হাজার লোক নিয়ে হয়বত জঙের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। মহরম মাসের শেষ দিকে দারভাঙ্গা থেকে যাত্রা করে আফগানরা গঙ্গার অপর তীরবর্তী অঞ্চলে এসে অবতরণ করে। আফগানদের আরও [বেশি করে] সন্তুষ্ট করার মানসে পরদিন জয়ন-উদ-দীন খান তাঁর দুই-তিন জন বিশেষ ভৃত্য ও কনিষ্ঠ পুত্র মীর্জা মেহদীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকাযোগে নদীর অপর তীরে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সাক্ষাতের পর আনন্দদায়ক ও নমনীয় কথাবার্তা বলা ও উপহারাদি প্রদানের পর হয়বত জঙ [আজিমাবাদে] প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই মর্মে আদেশ প্রদান করেন যে, আফগানরা তাদের সৈন্য-সামন্তসহ নদী অতিক্রম করে এপারে আসতে পারে।[১৪]

এই [আদেশ] অনুসারে সমুদয় আফগান বাহিনী জা'ফর খানের বাগানের নিকটবর্তী স্থানে নদী অতিক্রম করে [এবং সেখানে আস্তানা গাড়ে]। পরদিন প্রত্যুষে (১৩ই জানুয়ারী, ১৭৪৮ খ্রিঃ) জয়ন-উদ-দীন খানের সঙ্গে আফগানদের সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয় এবং সেদিনই তাঁর জীবনের সায়াহ্ন ছিল বলে দেখা যায়। আফগানদের মনকে শান্ত রাখার লক্ষ্যে,[১৫] হয়বত জঙ এই আদেশ দেন যে, তাঁর কয়েকজন বিশেষ সঙ্গী ছাড়া তাঁর সেনাবাহিনীর অন্য কেউ তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকবে না।[১৫] অবহেলার কারণে ও মৃত্যুর [অমোঘ] আহবানে তিনি নিজ গৃহ থেকে নির্গত হয়ে

১৩। মূল ফারসি, 'হম্ শিরাযাদাহ্ আশ্ মুরাদশর খান' (هم شیره زاده اش مراد شیر خان) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১২৫ পৃঃ) দিয়েছেন, "Murad Sher Khan (the sister's son of Shamsher Khan)"। রিয়াজে (রিয়াজ-বা, ২৭৯ পৃঃ) তাঁকে 'শমসের খানের ভ্রাতুষ্পুত্র' বলা হয়েছে। এ. এস. (৭১ পৃঃ) 'Sister's son of Shamsher Khan'

১৪। সমুদয় ঘটনার বর্ণনা সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৩০-৩১ পৃঃ) অধিক বিস্তারিতভাবে আছে। মোজাফফরনামার বর্ণনা (য. না. ৪৩-৪৪ পৃঃ) খুব সংক্ষিপ্ত হলেও সিয়ার ও বর্তমান গ্রন্থের পাঠের সঙ্গে মূল বিষয়ে তাতে কোনো পার্থক্য নেই। রিয়াজ (রিয়াজ-বা, ২৭৮-৭৯ পৃঃ) ও তা.বা.-র বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সেখানে জয়ন উদ-দীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দূরভিসন্ধির উল্লেখ নেই।

১৫। মূল ফারসি 'হয়বত জঙ ব-জুহত্-ই-ইস্তিইনাস-ই-খাতির-ই-আন্‌হা ফরমান দাদ' (هیبت جنگ بجهت استئناس خاطر آنها فرمان داد) পাঠের অনুবাদ এ. এস. (৭১ পৃঃ) দেননি এবং তাঁর প্রদত্ত সমগ্র বাক্যের অনুবাদ, "In order that none from among his soldiers save a few of the special attendants, should come to the audience (on that day), Haibat-Jang came out of his chamber...."। খুব পরিষ্কার নয়। স্যার যদুনাথ (১২৫ পৃঃ) ভাবানুবাদ দিয়েছেন ঃ "Haibat Jang to reassure the minds of the Afghans, ordered that no soldier of his own except a few khawases should be persent at his darbar." ভাবানুবাদ হলেও এই পাঠ কিছুটা অর্থবোধক।

১৬। 'ই'মারত-ই-চিহিল সিতান' (عمارت چهل ستان) 'the palace built on forty pillars'। চল্লিশটি প্রস্তর স্তম্ভের উপর নির্মিত বলে এই ইমারতের এই নামকরণ।

'চিহিলসিতান'[১৬] ইমারতের দরবার গৃহে এসে 'মসনদে'[১৭] উপবেশন করেন। সেদিন আফগানদের প্রতিটি অশ্বারোহী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত অবস্থায় জা'ফর খানের বাগান থেকে দুর্গের তোরণ পর্যন্ত সমগ্র স্থানে তাঁদের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য স্থান গ্রহণ করে।

প্রথমে সাক্ষাতের জন্য আসেন সরদার খান এবং পারিতোষিকাদি প্রদানের পর শমশির খানকে দ্রুত প্রেরণ করার জন্য সরদার খানকে বিদায় দেওয়া হয়। সেই সময়ে শমশির খানের ভগিনীর পুত্র মুরাদ শিরখান দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হয়বত জঙ কর্তৃক তাঁকে শমশির খান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, "পাছে লোকের ভিড় হয়, সেই আশঙ্কায় শমশির খান প্রথমে সরদার খানকে হুজুরের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং সরদার খানের প্রত্যাবর্তনের পর শমশির খান হুজুরের দরবারে উপস্থিত হবেন।"

জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান তাঁকে পান দিয়ে বিদায় করেন।[১৮] এবং সেই সঙ্গে তাঁর ভাইদের প্রত্যেকের হাতে পান দেন। ইতোমধ্যে তাঁদের মধ্যে একজন জয়ন-উদ-দীন আহমদের পেটে ছুরিকাঘাত করে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।[১৯] অন্যান্য আফগান [ও] এই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তারা তাদের তরবারি কোষমুক্ত করে [হয়বত জঙের] যে ক'জন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল তাদেরকে আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছিল। যাদের মৃত্যু তখনও আসেনি তারা কোনো প্রকারে এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়ে সেই [চরম] সঙ্কট থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে। সরদার খান ও শমশির খান দুর্গের বাইরে

১৭। 'মসনদ', (مسند) শব্দের আভিধানিক অর্থ : 'A throne, a large cushion on which people recline', সিয়ারের ইংরেজি অনুবাদকের টীকা (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ) : "In the most honourable place of the hall is spread a small carpet, about six feet in length, by four in breadth. Over this is a quilted covering of one inch in thickness, and over that, a rich one, either embroidered or brocade, fringed. The man is sitting on this, with his back leaning on a very large thick pillow which is long and round, and very rich likewise, with two couples of small cushions on each side of him, at about his knees, he has before him, but a little to the left, a sabre in a velvet scbbard and a Cattari or some other poniard at his right. Close before him there is some time a combric handkerchief, folded up square, with a small knife used as a pen knife, to rip open letters, occasionally presented. Not seldom there is upon the Masned a pandan or vessel containing Betel, ready-made and a handkerchef."

১৮। মোঘল-পাঠানরা বহিরাগত হলেও পানের বিড়ি দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়ন করার বাঙলার এই প্রাচীন রীতি তাঁরা মেনে চলতেন বলেই দেখা যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃঃ) পাদটীকায় আছে : "A man would think himself in disgrace, or at least slighted, if on a first visit, he chanced to be dismissed without a *Biry* put in is hand."

১৯। এখানে প্রথম আঘাতকারীর নাম নেই। সিয়ারের বর্ণনা মতে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃঃ) আবদুর রসিদ খান নামক জনৈক আফগান প্রথমে জয়ন-উদ্-দীন আহমদকে 'কাটারি' ('cattary') দিয়ে আঘাত করেন। কিন্তু সেই আঘাত তেমন লাগেনি বলে সেই ব্যক্তি তাঁর তরবারি ('sabre') বের করে এক আঘাতে তাঁকে শেষ করেন। সিয়ারে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা অধিক বিস্তারিত।

অশ্বারোহণে ও রণসাজে সজ্জিত হয়ে এবং সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষারত আফগান সৈন্যদের নিয়ে দ্রুতবেগে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের গৃহের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে লুটতরাজ করে নগর অধিকারের অভিপ্রায়ে সেখান থেকে চলে যান।[২০]

এই ভয়ঙ্কর সংবাদ হাজী আহমদের শ্রুতিগোচর হলে প্রথমে তিনি তা বিশ্বাসই করেন নি[২১] এবং পরে [তা বিশ্বাস করে] 'কুৎরুব'[২২]-এর মতো ছটফট করতে থাকেন। সেই সময়ে তাঁর [পলায়নের] সুযোগ ছিল[২৩]। তিনি সেই সময়ে যদি সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণে বাঙলার দিকে অগ্রসর হতেন তবে তিনি তাঁর ভ্রাতার কাছে পৌঁছতে পারতেন। কারণ, সেই সময় থেকে প্রায় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত [পালিয়ে যাওয়ার] সুযোগ ছিল। [তাতে] তিনি যে অপমান ও অসম্মানের শিকার হয়েছিলেন তা থেকে রক্ষা পেতেন। কিন্তু [পাপের] শাস্তির বিধান চলমান[২৪] বিধায় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর লোভ অতিমাত্রায় থাকার কারণে মণি-মুক্তা ও আশরফির চিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে পড়েন। সেই সময়ে শমশির খানের লোকজন তাঁর সন্ধানে এসে পড়ে। তখন তিনি সবকিছু থেকে তাঁর হাত প্রত্যাহার করেন এবং তাঁর [বাড়ির] দেয়ালের উপর থেকে নিজেকে নিচে নিক্ষেপ করে একজন দরিদ্র কারিগরের গৃহে আশ্রয় নেন।[২৫] কিন্তু সন্ধ্যার দিকে শমশির খানের লোকজন তাঁকে বের করে ফেলে ও একটি পশুর[২৬] উপর চড়িয়ে সর্বপ্রকার অসম্মানের সঙ্গে তাঁকে শমশির খানের কাছে নিয়ে যায়।

জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের হত্যার পর শমশির খান দুর্গে অবস্থান না করে এবং নিহত ব্যক্তির গৃহে প্রহরা বসিয়ে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে জাফর খানের বাগানে নিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে তাঁর নিজ তাঁবুর কাছে একটি মামুলি তাঁবুতে থাকতে দেন। হাজী আহমদকে তিনি 'কবচি'[২৭] নামে সাধারণভাবে পরিচিত একটি তাঁবুতে ছায়ার নিচে রাখেন এবং তাঁর জন্য প্রহরী মোতায়েন করেন।

২০। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৩৬-৩৭ পৃঃ) বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

২১। মূল ফারসি 'ওয়া চুন ইন খবর-ই-ওহাশ্‌ত্ আসর ব-হাজী আহমদ রাসিদ আউয়ালান এ'তিবার না কারদাহ্ বা'আদ মহ্‌কক্ক্ শুদান কুৎরব ওয়ার হরকাত মুয্‌তরব দাশ্‌ত্'
(و چون این خبر وحشت اثر بحاجی احمد رسید اولاً اعتبار نکرده بعد محقق شدن قطرب وار حرکات مضطرب داشت)
পাঠের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন, "When this horrible news reached Haji Ahmed, he began to move restlessly like a cutrub.।" বাক্যের প্রথম অংশের অনুবাদ তিনি দেন নি এবং তাঁর প্রদত্ত বাকি অংশের পাঠও খুব ত্রুটিমুক্ত নয়।

২২। 'কুৎরুব' (قطرب) নামক সর্বক্ষণ ঘূর্ণায়মান অতি ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩। এই বাক্যের অনুবাদ এ. এস. (৭২ পৃঃ) দেন নি।

২৪। ফা. 'সিলসিলাহ্-ই-মুকাফ্‌ফাত জারিআস্‌ত্' (سلسله مكافات جاريست) 'The chain of retribution is continuous'।

২৫। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৩৯ পৃঃ) আছে ঃ ".......he escaped by a breach in the wall and went to a neighbouring house where he was found at last."

২৬। মূল. ফারসি পাঠ, 'চওপালাহ্' (چوپله) শব্দের অর্থ, 'A beast' (AS), স্যার যদু নাথ (১২৬ পৃঃ) chaupali।

২৭। 'কবচি' (قبچی) এক ধরনের ছোট তাঁবু।

শমশির খান নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও বাঙলা রাজ্য অধিকার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বদান্যতা ও ঔদার্যের হাত প্রসারিত করে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের সম্পদ সম্বন্ধে সুপরিচিত সূত্র থেকে শোনা যায় যে, নগদ প্রায় তিন লক্ষ টাকা সেখানে পাওয়া গিয়েছিল।[২৮] হাজী আহমদের সম্পদ অধিকার করতে গিয়ে শমশির খান তাঁকে কঠিন চাপ ও যাতনার মধ্যে রাখেন এবং তাঁর প্রতি সর্বপ্রকার অসম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তা ছিল মৌখিক এবং কায়িক [উভয়ই][২৯] সেই অবস্থায় সেই বিষয়ী মানুষটি জীবনের প্রতি [অত্যধিক] মায়াবশত তাঁর মণি-মুক্তা ও ধন সম্পদ দিয়ে দিতে [প্রচুর] ইতস্তত করেন। অত্যাচার ও ভীতি প্রদর্শনের পর তিনি তাঁর ধন-সম্পদের গোপন আস্তানার কথা প্রকাশ করেন এবং কিছু পরে মণি-মুক্তা ছাড়াই ষাট কি সত্তর লক্ষ টাকার নগদ [স্বর্ণ] মুদ্রা তাঁর আস্তানা থেকে পাওয়া যায়।[২৯] টাকা উদ্ধারের জন্য তাঁর উপর এত সব অত্যাচারের কারণে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। অতি সাধারণ একটি কবর খনন করে আফগানরা তাঁকে দাফন করে।

তারপর অর্থ সংগ্রহের জন্য হাত প্রসারিত করে আফগানরা নগরের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার উপর একটি নির্দিষ্ট কর আরোপ করে। তাতে নগরে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং নগরের ভদ্র অধিবাসীদেরকে অসম্মান করা হয়।

মহররম মাসের শেষদিকে আমানিগঞ্জের শিবিরে অবস্থানকালে নবাবের নিকট এই মহাবিপদের সংবাদ পৌঁছে। রাজ্য শাসনে, তাঁর মতে, তাঁর সমকক্ষ তাঁর সন্তানের (জয়ন-উদ-দীন খান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা হলেও তিনি তাঁকে সন্তানের মতই দেখতেন) হত্যা, তাঁর ভ্রাতা,[৩০] কন্যা ও কন্যার সন্তান-সন্তুতি ও পরিবারবর্গের অপমানজনক অবস্থায় বন্দীত্ব, আজিমাবাদ রাজ্যে তাঁর অধিকারচ্যুতি এবং ওমর খান ও রহম খান প্রমুখের মতো শক্তিধর ও ব্যক্তিত্বশালী সেনাপতিসহ তাঁর সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোকের শত্রুপক্ষে যোগদান ইত্যাদির মতো বিপদসঙ্কুল ঘটনাবলি নবাবের

২৮। জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের গৃহে অর্থ প্রাপ্তির প্রায় অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৩৯ পৃঃ) দেখা যায়।

২৯। সিয়ারের মতে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৩৯ পৃঃ) হাজী আহমদের গৃহে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ টাকা এবং অসংখ্য মণি-মুক্তা ইত্যাদি।

মোজাফ্‌ফরনামা (ম. না.-৪৪ পৃঃ) মতে মৃত্যুকালে হাজী আহমদের বয়স ছিল ৯০ বছর সেখানে আছে, "The Afghans searched for Haji Ahmad that old man of ninety set himself to escaping on foot. But the Afghans seized and confined him."

৩০। এতে দেখা যাচ্ছে যে, ১১৩ হিজরি, (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৭৪৮ খ্রিঃ) সনের মহররম মাসের শেষ দিকেও হাজী আহমদের মৃত্যু সংবাদ আলিবর্দীর কাছে আসেনি। এ সম্বন্ধে রিয়াজে (রিয়াজ-বা, ২৭৯-৮০ পৃঃ) কিছু ভিন্ন ধরনের কথা আছে ঃ "শুনে তিনি (নবাব) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং জ্ঞাতিগণ অবর্ণনীয় শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। অতিরিক্ত মনোভঙ্গ ও মনোবেদনার দরুন তিনি শহর বাজার সব মারাঠা দস্যুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে একান্তে চলে যেতে চান। তাঁর সেনাপতিগণ তাঁকে ধৈর্য ধারণের জন্য বহু বাণী আবৃত্তি করে ও সান্ত্বনা দিয়ে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। তখন নওয়াজেশ মুহম্মদ খান শাহামত জঙ সৈন্যদের বেতন দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও নিজ কোষাগার থেকে সৈন্যদের আশি লক্ষ টাকা নগদ দেন ও তাঁদের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে রাজী করান।" সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া তারিখ-ই-বঙ্গালাতে (১৭১-৭৩ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ পাঠই আছে এবং দু'জনের পাঠ দেখে ধারণা হয় যে এঁদের মধ্যে কোনো একজন অন্যজনের রচনা অবলম্বন করে লিখেছিলেন।

মন দুঃখ, হতাশা, উৎকণ্ঠা ও শোকে পূর্ণ করে দিলেও বাহ্যতঃ তিনি কোন হতাশা বা শোকের চিহ্ন প্রকাশ করেননি। বরং পরিপূর্ণ মর্যাদা ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি সৈন্য সংগ্রহের আদেশ প্রদান করেন। সেনাবাহিনী সমবেত হলে তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, বিপদ এসেছে, কঠিন বিপদ! এই অবস্থায় এর প্রতিকার কী?"

তারা সকলে একমত হয়ে বলল, "আমরা বিশ্বস্ত ও অনুগত এবং হুজুরের নির্দেশ পালন করব।"

নবাব বলতে লাগলেন,[৩১] "আমার বীর সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে, আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও আমার ভাই[৩২] দুঃখজনক বন্দি অবস্থায় আছেন। এ ধরনের ঘটনার পর আমার জীবন খুব উপভোগ্য নয়। হত্যা করা বা নিহত হওয়া ব্যতীত আমার আর কোন পথ নেই। আমার উপর আপনাদের বন্ধুত্বের দাবি অনেক অনেক বছরের। আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমাকে সাহায্য করতে চান তাঁদের জন্য আমার জীবন ও সম্পদ ত্যাগ করতে (বলি দিতে) দ্বিধা করব না এবং যাঁরা এই ব্যাপারে অনিচ্ছুক আমি তাঁদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করব না। এই অবস্থায় বেঁচে থাকার চেয়ে মরণকেই আমি শ্রেয় বলে মনে করি। তাই বলে [আমার] মরণের ব্যাপারে আমি কোনো সহায়তা ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।"

উঁচু ও নীচু উপস্থিত সকলে এক বাক্যে এই বলে নিবেদন করল, "হুজুরের প্রতি আমাদের আনুগত্যের কর্তব্য সুস্পষ্ট। [আপনার] বহু দয়া ও দাক্ষিণ্য দ্বারা আমরা সম্মানিত হয়েছি। এখন [আপনার জন্য] আমাদের জীবন উৎসর্গ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বাসনা নেই।"

নবাব বললেন, "আপনারা যা বলেছেন তা যদি অন্তরের কথা হয় এবং আপনারা যদি এই প্রতিজ্ঞা মেনে চলবেন বলে স্থির করে থাকেন তবে আপনারা এই প্রতিজ্ঞা শপথের মাধ্যমে দৃঢ়ীভূত করুন যাতে তা অধিকতর বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সূত্র হতে পারে।

৩১। কথা দ্বারা মানুষের মন জয় করার অসাধারণ ক্ষমতা আলিবর্দীর ছিল। প্রায় অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৪৪-৪৫ পৃঃ) আছে।

৩২। মূল ফারসি ফরযন্দ্-রশীদ-ই-মান কুশতাহ্ শুদাহ্ ওয়া আহ্‌ল্ ওয়া ই'আলওয়া বেরাদর-ই-মান বযলআসির গ্রেফতার আমাদান্দ্ (فرزند رشید من کشته شده و اهل و عیال و برادر من بذل اسر گرفتار آمدند) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১২৭ পৃঃ) দিয়েছেন, "My worthy son has been killed; his wife and children and my brother are in vile captivity." এ পাঠ মোটামুটি অর্থবোধক হলেও সঠিক অনুবাদ নয়।

সেই সময় পবিত্র কোরান শরীফ আনা হল এবং সব সেনাপতি তাঁদের ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করে [কোরান স্পর্শ করে] শপথ গ্রহণ করেন।[৩৩] তখন নবাব বললেন, "আমি আপনাদের কাছে ঋণী। আপনাদের যে বেতন আমার কাছে আছে তা সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে আমি পিছপা হব না এবং বর্তমান অবস্থায় আপনারা যখন নিজেদের জীবনের জন্যও পরোয়া করেন নাই আপনাদের প্রাপ্য পরিশোধ করতে কোন দ্বিধারই প্রশ্ন নেই। তবে আপনাদের নিকট আমার [একান্ত] অনুরোধ আপনাদের প্রাপ্য বেতন অস্তে আস্তে ও ভদ্রভাবে নিন।"

সেনাবাহিনীর সব দল এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং বন্ধুত্বের ব্যাপারে একত্র ও একমত হয়। সৈন্যদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার জন্য নবাব সেই সময়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। সরকারি কোষাগারে সঞ্চিত অর্থ সৈন্যর দাবি পূরণে যথাযথ না হওয়াতে তিনি শাহাম্মত জঙের নিকট থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন, কিছু অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা ও শাহাম্মত জঙের স্ত্রীর কাছ থেকে ও। জগৎশেঠ[৩৪] প্রমুখ ব্যাঙ্ক মালিক এবং অন্যান্য রঈসদের কাছ তেকেও তিনি কিছু অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সৈন্যদের বেতন পরিশোধ করেন। এতসব কিছু সত্ত্বেও সৈনিকদের অনেক বেতনই বকেয়া থেকে যায়। সেই সময়ে রাজধানীর নিকট মারাঠা বাহিনীর আগমন সংবাদ পাওয়া যায়।

মারাঠারা একস্থানে অবস্থান করে যুদ্ধ করেনা এবং তাদের যুদ্ধের রীতি হচ্ছে আক্রমণ করা ও পালিয়ে যাওয়া। তাই মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, না আজিমাবাদ অভিযানে অগ্রসর হবেন এই প্রশ্নে নবাব দ্বিধায় পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আজিমাবাদ অভিযানের দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সেই নগর আক্রমণের বস্তুসমূহ সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমানিগঞ্জে অবস্থান করেই মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন বলে সেখানেই থেকে যাবেন। তিনি সওলত জঙের 'আসবাব' (মালপত্র) ভগবান গোলায় প্রেরণ করেন যাতে সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ শহর

৩৩। পবিত্র কোরান স্পর্শ করিয়ে অন্যকে শপথ করানোর ব্যাপারে আলিবর্দী খুবই সিদ্ধহস্ত ছিলেন কিন্তু নিজের বেলায় তিনি কোরানের নামে ইট স্পর্শ করে শপথ করেছিলেন বলে দেখা যায় (সরফরাজ খানের উদ্দেশে শপথ বাক্য প্রেরণ স্মর্তব্য)।

মূল ফারসি 'আনগাহ্ কোরআন মজিদ হাযের সাখতাহ্ হমাহ্ রওসাহ-ই- দরবাব-ইত্তেফাক ওয়া ইত্তিহাদ কসম ইয়াদ কারদান্দ্'
(آنگاه قرآن مجید حاضر ساخته همه رؤساء درباب اتفاق و اتحاد قسم یاد کردند) পাঠের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন (৭৪ পৃঃ) "At that times all the chiefs brought a copy of the Holy Quran and took oath on it..."। মূল ফা. পাঠের সঙ্গে এই অনুবাদের সঙ্গতি নেই। স্যার যদুনাথ (১২৭ পৃঃ) মূল পাঠের ভাবানুবাদ দিয়েছেন, যথা, "...a copy of the Quran was produced and all chiefs swore"। এ সম্পর্কে সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৪৫ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

৩৪। জগৎ শেঠের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে করম আলী খান বলেন (য. না.-৪৪ পৃঃ) ঃ "So that Jagat Seth. the richest banker of the country...placed a bill of sixty lakhs of rupees in Aliverdi's hands saying. 'At present only so much cash is available in my *Kuthi*.' Alivardi smiled and replied. 'I have this amount in my own treasury and as yet my necessity does not extend to your money'."

পর্যন্ত মারাঠাদের যাতায়াতের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে [মুর্শিদাবাদ নগরে] বিভিন্ন শস্য আমদানির পথ থাকার ফলে সেখানে শস্যের অভাব দেখা না দিতে পারে।[৩৫] মুর্শিদাবাদের অধিবাসীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন,[৩৬] "আজিমাবাদ অভিযানে অগ্রসর হওয়া ও বিশ্বাসঘাতক আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমি সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু মারাঠারা নগরের উপকণ্ঠে উপদ্রব শুরু করেছে। কিন্তু তাদের শাস্তি বিধান ও বহিষ্কার করা [এখন] আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আপনারা যে যেখানে পারেন নিরাপদ স্থানে চলে যান।"

এই [বাক্য] অনুসারে মুর্শিদাবাদ নগরের সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের মধ্যে যাঁদের বাইরে যাওয়ার সঙ্গতি ছিল তাঁরা গঙ্গার অপর তীরবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গমন করে নিজেদের রক্ষা করেন এবং যাঁদের অন্য কোথাও যাওয়ার সঙ্গতি ছিলনা তাঁরা দৈবের উপর নির্ভর করে নিজেদের গৃহেই রয়ে গেলেন।

যুদ্ধের সরঞ্জামাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে[৩৭] এবং সুন্দর বক্তৃতা,[৩৮] দিরহাম ও দিনার দানের মাধ্যমে সৈন্যদের মন জয় করে নবাব পনের-ষোল হাজার অশ্বারোহী ও প্রায় বিশ হাজার বন্দুকধারী[৩৯] সৈন্য নিয়ে রবি-উল-আউয়াল মাসের প্রথমদিকে মহাসমারোহের সঙ্গে অভিযান চালিয়ে আজিমাবাদের নিকট উপস্থিত হন। আমানিগঞ্জ থেকে যাত্রা করে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে তিন ক্রোশ দূরে ও আজিমাবাদের পথে অবস্থিত ঝাপাইদহ নামক স্থানে তাঁর মহান ও মহিমান্বিত শিবির স্থাপন করেন। চার

৩৫। মূল পাঠ বড়ই বিভ্রান্তিকর এবং এ. এস. ও য.না-র অনুবাদও খুব পরিষ্কার নয়। অনেক চেষ্টার পর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটি পাঠ দাঁড় করান হয়েছে যদিও আলিবর্দী কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে সিয়ারের বর্ণনা খুবই পরিষ্কার। সেখানে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃঃ) আছে ঃ "Meanwhile he sent his son -in-law, Sayd ahmed - hqhan, to Bagvangola, with orders to secure the roads in those parts, in such a manner, as that the daily convoys of provisions form thence should not meet with any obstruction from the Marhathas nor the enemy suffered to occasion a dearth in the city."

৩৬। প্রায় অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃঃ) আছে।

৩৭। মূল ফারসি, 'আজ তেহিয়াহ্-ই-আসবাব-ই-ইউরাশ ফারগ্ শুদাহ্' (از تهیهٔ اسباب یورش فارغ شده) পাঠের অনুবাদ এ, এস, দিয়েছেন (৭৫ পৃঃ) 'after providing for the materials of the expedition' এবং স্যার যদুনাথ দিয়েছেন after he had completed the preparations for the campaign'। কোনো অনুবাদই সঠিক নয়।

৩৮। ফা. পাঠ, 'ব-হুসন তকরীর' (بحسن تقریر) এর অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন 'by means of eloquence' এবং যদুনাথ (১২৮ পৃঃ) 'by gifts of money'। এ. এস.-এর পাঠ কিছুটা অর্থবোধক হলেও য. না. র পাঠ ভুল। সঠিক পাঠ সুন্দর বক্তৃতা এবং তা দিয়ে লোকের মন জয় করার অসাধারণ ক্ষমতা আলিবর্দীর ছিল।

৩৯। মূল ফা. পাঠ, 'বরকন্দাজ' (برق انداز) 'masketeers'। আরবি বরক্ (برق) শব্দের সঙ্গে ফারসি 'আন্দাজ' (আন্দাখতান= (انداختن) প্রত্যয় যোগ করে গঠিত শব্দের অর্থ বন্দুকধারী।

কি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ তিনি নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান শাহামত জঙ ও আতাউল্লাহ্ খান সাবিত জঙকে মুর্শিদাবাদে রেখে আসেন। খুব সম্ভব অভিযানে অগ্রসর হওয়ার সময় অথবা এর আগে-গ্রন্থকারের ঠিক মনে নেই-শাহামত জঙের সুপারিশে নবাব নূর-উল্লাহ্ বেগ খানকে পদচ্যুত করে মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানকে দ্বিতীয়বারের মত বখশীর পদে নিয়োজিত করেন তাঁর (জা'ফর খান) মনকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে। কারণ, অতীতে বহু বছর ধরে তিনি (জা'ফর খান) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর সদস্যগণ তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল।

মারাঠারা [তখন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ] নগরের চারদিকে অবস্থানরত ছিল এবং নবাবের মনে এই সন্দেহ ছিল যে, তারা অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করে আজিমাবাদ পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। এই কারণে [স্থলপথে] খাদ্যদ্রব্য ও শস্যাদি যদি সেনাবাহিনীর নিকট না পৌঁছে সেই জন্য নবাব আদেশ দেন যে, সেনাবাহিনীর উত্তম শস্য সরবরাহকারীরা ও সরবরাহ করার ক্ষমতাধারী অন্যেরা শস্য ও খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তার জন্য নৌকাযোগে তা প্রেরণ করবে।[৪০]

সংক্ষেপে, অতি প্রয়োজনীয় ও জরুরি বিষয়াবলির ব্যবস্থা করে নবাব শত্রু দমনের উদ্দেশ্যে ঝাপাইদহ থেকে অগ্রসর হন। নবাবের যাত্রা করার পরে পরিচিত পথ পরিহার ও মুর্শিদাবাদ অধিকারের চেষ্টা পরিত্যাগ করে মারাঠারা অরণ্য পথে আজিমাবাদের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্ণিয়ার ফৌজদার সাঈফ খান নবাবের সাহায্যার্থে শেখ দীন মোহাম্মদ নামক একজন জমা'দারের অধীনে এক হাজার পাঁচশ অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন এবং অসুস্থতার অজুহাতে তিনি (ফৌজদার) নিজে অব্যাহতি নেন।[৪১]

নবাবের বাহিনী এসব স্থান অতিক্রম করার কালে দোস্ত বেগ বদখশী[৪২] নামক নবাবের একজন জমা'দার শমশির খান ও সরদার খানের নিকট লিখিত আতাউল্লাহ্ খানের পত্রসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নবাবের কাছে নিয়ে আসলেন।[৪৩] পত্রে

৪০। মূল ফারসি, 'আয্ ইন্‌কেহ্ মারহাঠা দর হাওয়াল-ই-শহর বুদ ওয়া মুয্‌নাহ্-ই-ইন্-মিশুদ কেহ্ বা'দ-ই-কোচ-দুওর ওয়া হাওয়াল-ই-আরদু-রা গেরেফতা তা আযিমাবাদ বরাওয়ান্দ্ ওয়া ব-ইন জুহ্‌ত আযুকা ওয়া গলাহ্ বলশকর নারেসাদ ফরমান দাদ

(ازینکه مرهته در حوالی شهر بود و مظنهٔ این می شد که بعد کوچ دور و حوالی اردورا گرفته تا عظیم آباد براوند و باین جهت اذوقه و غله بلشکر نرسد فرمان داد . . . بر سفاین بر دارند)

পাঠের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন (৭৫ পৃঃ), "As the Marathas were around the city and it was feared that after his march, they might surround the army till Azimabad and provisions might consequently fail to reach the army, he ordered....' । য. না.-এর পাঠ (১২৮ পৃঃ) .... it was apprehended that as soon as Alivardi would set out his march they would surround his army from a distance all the way to Patna...'। উভয় পাঠই ত্রুটিপূর্ণ।

৪১। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৪৭-৪৮ পৃঃ) আছে। সাইফ খান সম্বন্ধে বর্ণনা পরে পাদটীকায় আছে।

৪২। মূল ফা. পাঠ 'দোস্ত বেগ বদখশী' (دوست بیگ بدخشی) এবং এ. এস. ও স্যার যদুনাথের 'Dost Beg Bakhshi' নয়। সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃঃ) এর নাম 'Dost-nick-behaqhshani')।

৪৩। আতাউল্লাহ্ খান বহুদিন থেকে আলিবর্দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এবার তিনি হাতে নাতে ধরা পড়ে যান।

আতাউল্লাহ্ খান শমশির খান ও সরদার খানকে এই যুদ্ধে তাঁর উৎসাহ ও প্রলোভন দেখান এবং তাতে সাহায্য, সহায়তা, সহৃদয়তা ও ঐক্যের অঙ্গীকার ছিল।[৪৪] বিজয়ী বাহিনী ভাগলপুরে পৌঁছলে মারাঠা বাহিনী সেখানে জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসে ও চম্পানগর নালার মুখে নবাবের বাহিনীর পশ্চাদ্দেশে আক্রমণ করে ও পালিয়ে যায়।[৪৫] পৃথিবী ভ্রমণকারী বাহিনী মুঙ্গের পৌঁছলে টিকারীর জমিদার সুন্দর সিংহ, বিহারের জমিদার কামগার খান[৪৬] প্রমুখ তাঁদের সেনাবাহিনীসহ নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্মানিত হন। সেই সময়ে বিশ্বাসীদের প্রতীক ও গুপ্ত বা ব্যক্ত রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মীর মোহাম্মদ আলী (আল্লাহ্ তাঁর উপর তাঁর দয়ার ছায়া প্রলম্বিত করুন! এসে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মহান সান্নিধ্য দ্বারা নবাবকে সুখী করেন। খাদিম হোসেন খান[৪৭] এবং ইসমাইল খানও[৪৮] এসে উপস্থিত হন।

শমশির খান ও সরদার খান তাঁদের সংগৃহীত চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহকারে অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে জা'ফর খানের বাগান থেকে বার[৪৯] নামক কসবাহ্ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুঙ্গেরের পরে কয়েক স্থানে যাত্রা বিরতির পরে নবাব বিজয়াভিযানে অগ্রসর হন।[৫০] ইতোমধ্যে মীর হাবিব উল্লাহ্, রঘুজী ভোঁসলার পুত্র জানুজীও মারাঠা সেনাবাহিনী নিয়ে আজিমাবাদের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁদের আগমন বার্তা আফগানদের নিকট প্রেরণ করেন। গোড়ার দিকে শমশির খান ও সরদার খান তাঁদের (মারাঠাদের) এই আগমনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং

৪৪। মূল ফা. 'বরআদআ'ই মোরাফিকাত ওয়া মোয়াফিকাত ওয়া এখলাস ওয়া ইত্তিহাদ ওয়া তরগিব ওয়া তাহরিস দর মহারিবাহ্'
(برادعای مر افقت و موافقت و اخلاص واتحاد و ترغیب و تحریص در محاربه) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১২৮ পৃঃ) দিয়েছেন ঃ "....in which he propossed his friendship for them and encouraged them to fight." এই পাঠ ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর।

৪৫। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃঃ) আছে।

৪৬। ফারসি পাঠ 'কামগার খান' (کامگار خان)। সিয়ার (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃঃ), 'Camcar-qhan'.।

৪৭। খাদিম হোসেন খান ছিলেন মীর মোহাম্মদ জা'ফর আলীর বোনের সপত্নী পুত্র। তবে তিনি নিজেকে মীর জা'ফরের আপন ভাগিনা বলেই পরিচয় দিতেন। পরবর্তীকালে তিনি মীর জা'ফর ও তাঁর পুত্র কুখ্যাত মীরনের অনেক দুষ্কর্মের সঙ্গী ছিলেন।

৪৮। মীর ইসমাইল ছিলেন মীর জা'ফরের আপন চাচাত ভাই (২ পরিচ্ছেদে মীর জা'ফরের বংশ তালিকা দ্রঃ)। অন্য মতে তিনি ছিলেন তাঁর মামাত ভাই।

৪৯। 'কসবাহ-ই-বার' (قصبهٔ بار) নামক স্থানের উল্লেখ সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড ৪৯ পৃঃ) আছে কিন্তু পরিচিতি নেই।

৫০। মূল ফা. 'নবাব...পাস আজ চন্দ্ মোকাম আয্ মুঙ্গের করীন ফতেহ্ ওয়া যিফর্ রায়াত-ই-এ'তিলাহ্ বর আফ্‌রাশ্‌ত্'
(نواب . . . پس از چند مقام از مونگیر قرین فتح و ظفر رایت اعتلا بر افراشت) পাঠের অনুবাদ গ্র. এস. দিয়েছেন "The Nawab, after a halt for some time, resumed his victorous march". স্যার যদুনাথ (১২৯ পৃঃ) "Alivardi after a few days halt at Munger, resumed his march."

[এখন] তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মারাঠা শিবিরে যান। মীর হাবিব উল্লাহ্ খান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন বিদ্রোহী[৫১] প্রকৃতির লোক এবং বাঙলা অধিকার ও ধ্বংস করার ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টাকে তিনি অবহেলা করেননি। কিন্তু তাঁর ভাগ্য তাঁকে কোনদিন সাহায্য করেনি। তিনি শমশির খান ও সরদার খানকে মূল্যবান খিলা'ত উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন এবং তাঁদেরকে তাঁর অধীনে চাকুরি দিয়ে বিহারের সুবাদারির পদ প্রদান করে বিদায় নেন।

পরদিন শমশির খান তাঁর নিজ বাসস্থানে মীর হাবিব উল্লাহ খান, মীর্জা মোহাম্মদ সালেহ, মোহন সিংহ প্রমুখ কয়েক ব্যক্তিকে এক ভোজ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেন এবং ভোজন শেষে তাঁদের আরাম-আয়েশ ও নিদ্রার জন্য একটি তাঁবু তাঁদেরকে দেখিয়ে দিয়ে শমশির খান নিজ বাসস্থানে চলে যান। মীর হাবিবের তাঁবুর চারদিকে একদল আফগানকে পাহারা দিবার জন্য তিনি এই বলে প্রেরণ করেন যে, মীর হাবিব তাঁর সেনাবাহিনীর কাছে যেতে চাইলেই এ কাজে বাধা দিয়ে তারা বলবে, "আপনার কথা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা এ কাজে অগ্রসর হয়েছি এবং জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানকে [পৃথিবী থেকে] সরিয়ে ফেলেছি। আমরা চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে মহাবত জঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এই অবস্থায় আজ পর্যন্ত সৈন্যদের বকেয়া বেতনের টাকার হিসাব ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। আপনি এই টাকা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে এখান থেকে যাবেন।[৫২]

বাইরে থেকে মীর্জা মোহাম্মদ সালেহ্র নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি এক ফন্দি আঁটেন। তিনি কয়েকজন মারাঠা সৈন্যকে মন্ত্রণা দিয়ে বললেন, "তোমরা শিবিরের বাইরে চলে যাও এবং দ্রুতগতিতে শমশির খানের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে চিৎকার করে বলতে থাক যে, 'মহাবত জঙ এসে পড়েছেন' এবং এই অবস্থায় তোমরা সবাই আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হও।"[৫৩]

[মারাঠা] সৈনিকেরা এই পরিকল্পনা মতই কাজ করল এবং মহাবত জঙ এসেছেন বলে চিৎকার করে বলল। হাবিব উল্লাহ খান প্রমুখ হতচকিত হয়ে নিজেদের সেনাবাহিনীর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে শমশির খান ও সরদার খান সেখানে উপস্থিত হয়ে টাকা পরিশোধের দাবি জানান। হাবিব উল্লাহ খান বললেন, "এখন বিলম্ব করা বিপদের কারণ হবে। মহাবত জঙ এসে গেছেন। শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে আপনাদের চাহিদামত টাকা দিবার ব্যবস্থা আমি করব। শত্রু এসে পড়ার কারণে [অন্য কোন চিন্তা না করে] একমাত্র যুদ্ধের চিন্তা করাই আপনাদের কর্তব্য।"

৫১। মূল ফারসি পাঠ, 'হকিকত-ই-শওরাশি দর মেযাজ দাশ্‌ত্' (حقیقت شورشی در مزاج داشت) এর অনুবাদ এ. এস. (৭৬ পৃঃ) দিয়েছেন, 'of violent disposition'। ফা.(شورشی) শব্দের অর্থ বিদ্রোহী প্রকৃতি, 'violent' নয়।

৫২। প্রায় অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড ৫০ পৃঃ) আছে

৫৩। ঐ।

অবশেষে অনেক কথাবার্তার পর হাবিব উল্লাহ খান একজন মহাজনকে দুই লক্ষ টাকার জামিন রাখেন। এই টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি তিনি শুরুতেই দিয়েছিলেন। মীর্জা সালেহ্‌র সুন্দর পরিকল্পনার কারণে মীর হাবিব এই ভয়ানক চক্রান্তের হাত থেকে [তখনকার মত] মুক্তি পান।[৫৪]

সংক্ষেপে, পরদিন দুই [যুদ্ধরত] বাহিনী একে অন্যের সম্মুখীন হয় এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব তিন কি চার ক্রোশের বেশি থাকেনি। সেদিন নবাব তাঁবুর বাইরে এসে 'জিনসী'[৫৫] কামান বাহিনীর তদারকি করে সারারাত কাটান। পরদিন প্রত্যূষে[৫৬] নবাব রায়গ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমে রানীর সরাই নামক স্থানে তাঁর সেনাদল মোতায়েন করেন এবং বাহাদুর আলী খানকে জিন্‌সী কামান বাহিনীর প্রধান করে অগ্রগামী বাহিনী অধিনায়ক করা হয়। 'দস্তী'[৫৭] কামান বাহিনীর প্রধান করা হয় হায়দার আলী খানকে এবং রহম খান, মীর মোহাম্মদ কাজিম খান[৫৮] ও দোস্ত মোহাম্মদ খানকে[৫৯] এঁর পিছনে রাখা হয়। ডানদিকে গঙ্গা নদীর তীরে ফকির উল্লাহ্ বেগ খান,[৬০] নূর উল্লাহ্ বেগ খান ও শেখ জাহান ইয়ার খানকে অবস্থান করার জন্য নবাব আদেশ প্রদান করেন। বামদিকে ছিল মারাঠা বাহিনী। সেদিকে তিনি নবাব সওলত জঙ, মোহাম্মদ আল্লাহ্-ইয়ার খান,[৬১] মোহাম্মদ ইরাজ খান,[৬২] রাজা সুন্দর সিংহ,[৬৩] কামগার খান প্রমুখ কয়েকজন আমিরকে মোতায়েন করেন। শেখ দীন মোহাম্মদকে একদল জমা'দারসহ পিছনে অবস্থানরত রেখে নবাব নিজের সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেন।

৫৪। প্রায় অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড ৫০ পৃঃ) আছে।

৫৫। 'জিনসী' (جنسی) কামান খুব সম্ভব বড় ও ভারী কামান অর্থে।

৫৬। মূল ফা. পাঠ, 'বামদাদান কেহ্ তুর্‌ক-ই-ফালাক তিযাহ্-ই-শমা'-ই-আফতাব দর দস্‌ত্ গেরেফ্‌তাহ্ বর দিলানে-শাম তাখতান আউরদ্' (بامدادان که ترك فلک نیزهٔ شماع افتاب در دست گرفته بر دلان شام تاختن آورد) -এর আক্ষরিক অনুবাদ ঃ 'When the Turk of the sky began to throw arrows of its rays on the black-hearted ones of the night' সাদাসিধা অর্থে প্রভাতকাল ('break of the day')।

৫৭। 'দস্তী' (دستی) কামান অর্থে ছোট ও হালকা কামান, যেগুলি হাতে নিয়ে চালান যায়।

৫৮। সেই সময়ে এই নামের একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সিয়ার রচয়িতার আপন ফুফা এবং অন্যজন ছিলেন মীর মোহাম্মদ জাফর খানের সৎ ভাই। আলোচ্য মীর কাজিম বোধ হয় মীর জাফরের ভাই। আর একজন মীর কাজেম ছিলেন আরবের উচ্চবংশীয় সৈয়দ। মীরন তাকে হত্যা করেন মীর জাফরের নবাবী লাভের পর।

৫৯। দোস্ত মোহাম্মদ খান আলিবর্দীর একজন দক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন এবং সিরাজ-উদ-দৌলার সময়েও তিনি কিছুদিন তার সেনাপতি ছিলেন।

৬০। ফকির উল্লাহ্ বেগ খান ও নূর উল্লাহ্ বেগ খান ছিলেন আলিবর্দী খানদের গৃহভৃত্য ('খানাজাদ') জাতীয় লোক। তাঁরা দু'জনেই আলিবর্দীর সঙ্গে দিল্লী থেকে উড়িষ্যায় আসেন আলিবর্দীর পরিবারের সদস্য হিসাবে। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি লাভ করতে করতে তাঁরা সেনাপতি হন।

৬১। আল্লাহ্ ইয়ার খান ছিলেন মীর জা'ফরের সৎ ভাই।

৬২। মোহাম্মদ ইরাজ খান ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলার শ্বশুর। তাঁর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

৬৩। বিহার সুবার টিকারীর জমিদার ছিলেন সুন্দর সিংহ এবং তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। এই প্রভাবশালী সামন্ত নৃপতির রাজ্য ছিল গয়া অঞ্চলে।

শমশির খান এবং সরদার খানও ত্রিশ কি চল্লিশ হাজার আফগান সৈন্য নিয়ে গঠিত তাঁদের সেনাবাহিনী সুসজ্জিত করেন ও যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসেন। দুই গোলন্দাজ বাহিনীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। সুবিচারক আল্লাহ্‌র নির্দেশে জয় ও বিজয়োল্লাস এই বিজয়ী বংশের ভাগ্যে থাকার কারণে যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটি কামানের গোলা সরদার খানের মাথায় আঘাত করে এবং তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সরদার খান অর্ধেক [আফগান বাহিনীর] অধিনায়ক ছিলেন এবং তাঁর চেয়ে যোগ্যতর আর কোন সেনাপতি শমশির খানের দলে ছিল না। তাঁর মৃত্যুতে সেনাবাহিনীর মধ্যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয় এবং সরদার খানের অধীনস্থ হাজার হাজার সৈনিক সপ্তর্ষি মণ্ডলের মত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। শমশির খানের অবশিষ্ট সৈন্য তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ বিজয়ী বাহিনীর পক্ষে বিজয় ও দুষ্ট শমশির খানের পক্ষে পরাজয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে হতাশ হয়ে পড়ে।

ইতোমধ্যে মারাঠারা নবাবের বাহিনীর পিছন দিকে আক্রমণ করে। সিরাজ-উদ-দৌলার হস্তী বিশেষ আরোহী বহনকারী নবাবের হস্তীর নিকট দণ্ডায়মান ছিল। সিরাজ-উদ-দৌলা নিবেদন করেন, "শত্রুরা আমাদের পিছন দিকে আক্রমণ করেছে, এরও প্রতিকার করা আবশ্যক।"

নবাব ক্রোধভরে উত্তর দিলেন, "আমার সম্মুখে যারা দণ্ডায়মান, তারাই আমার শত্রু। মারাঠাদের কাছ থেকে আমাদের [আপাতত] কোনো ভয় নেই। আফগানদের পরাজিত করে আল্লাহ্‌র রহমতে মারাঠাদেরও পরাভূত করব।"

সেদিকে (অর্থাৎ মারাঠাদের দিকে) কোনো মনোযোগ না দিয়ে সেনাবাহিনীর ডান পাশে অবস্থানরত শেখ জাহান ইয়ার খান ও ফকির উল্লাহ্‌ বেগ খানের নিকট তিনি আদেশ পাঠিয়ে বলেন, "এ সময়ে দ্বিধার কোনো অবকাশ নেই। অশ্বারোহণে এক্ষুণি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করুন।"

এ সময়ে রহম খানের অগ্রগামী বাহিনীর একজন অশ্বারোহী নবাবের কাছে এসে বললেন, "বর্তমান অবস্থায় আক্রমণ করাই সুবিধাজনক বিধায় এই নিকৃষ্ট ব্যক্তি শত্রুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি হুজুরের, সহায়তা প্রার্থনা করছি।"

ফকির উল্লাহ বেগ খান ও জাহান ইয়ার বেগ খানকে আক্রমণ করার জন্য বারবার বলা হলেও তা কার্যকরী হচ্ছে না দেখে কয়েকজন সাহসী সৈন্য নিয়ে নবাব নিজের হস্তী ও গাড়িকে ঘুরিয়ে নিয়ে রহম খান ও হায়দর আলী খানের সাহায্যে এগিয়ে গেলেন। সেই সময় বার্তাবাহক শমশির খানের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসে এবং তা ঘটেছিল নিম্নলিখিতভাবে।[৬৪]

৬৪। যুদ্ধের বিশেষ করে আফগানদের শোচনীয় পরাজয়ের প্রায় অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৫২-৫৬ পৃঃ) আছে এবং সেই বর্ণনা আরও বিস্তারিত।

সরদার খানের নিহত হওয়ার পর আফগান সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শমশির খান যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ভিন্ন অবস্থায় দেখতে পান এবং কয়েকজন আফগানকে নিয়ে হস্তী থেকে নেমে আসেন। সেই সময়ে হাবিব বেগ শমশির খানের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর সঙ্গে এক সংঘর্ষের পর হাবিব বেগ তরবারির আঘাতে তাঁকে হত্যা করেন। কাজেম আলী খান তাঁর হাওদা মুরাদ-শির খানের নিকট নিয়ে আসেন। মুরাদ শির খান গুলির আঘাতে অর্ধ মৃত অবস্থায় তাঁর হাতির উপরে পড়েছিলেন। কাজেম আলী খান মুরাদ শির খানের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। তাঁরা এই দুই দুর্বৃত্তের ছিন্ন মস্তক নবাবের নিকট নিয়ে আসেন ও তাঁর হস্তীর পায়ের সামনে নিক্ষেপ করেন।

এই মহান বিজয়ের পর নবাব ভূমিতে পড়ে আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কারণ, [তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, এই বিজয় একমাত্র আল্লাহ্‌র করুণায়ই সাধিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কেউ [এতটা] আশা করেনি। অতঃপর নবাব বিজয়ের আনন্দ-বাদ্য বাজাতে আদেশ দেন। মারাঠা সৈন্যরা বাম দিকে অবস্থানরত ছিল। এই অবস্থা দেখে তারা হতবাক ও দিশাহারা হয়ে গেল এবং সেখানে অবস্থান করার আর কোনো শক্তি রইল না বলে তারা পালিয়ে গেল। নবাব পূর্ণ ভদ্রতার[৬৫] সঙ্গে শত্রুপক্ষের শিবিরের দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে তাঁর নিজের তাঁবু গাড়েন। তাঁর কন্যা ও পরলোকগত জয়ন-উদ্-দীন খানের স্ত্রী (আমেনা বেগম) আফগানদের নিকট বন্দী ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের[৬৬] নিয়ে নবাবের কাছে আসেন এবং তিনি দ্বিতীয় জীবন লাভ করেন। উভয় পক্ষ হাত, জিহবা হৃদয় দিয়ে প্রকৃত কল্যাণকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানান নগরের উঁচু-নীচু সমুদয় অধিবাসী বিপজ্জনক ঘুর্ণিঝড় থেকে রক্ষা পেয়ে নবাবের সামনে ভূমি চুম্বন করে।

কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করে নবাব পরিপূর্ণ আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে আজিমাবাদে উপস্থিত হন। তাঁর এই অবস্থা দুশমনদের মনের জ্বালা ও বন্ধুদের মনে আনন্দের কারণ হয়। তিনি তাঁর করুণা ও দয়ার ছায়া নগরবাসীদের ললাটে ফেলেন। তিনি আবারও করুণা বর্ষণকারীর নিকট শুকুর গুজারি করেন এবং সৈয়দ ও অন্যান্য দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মুসলমানকে উপহার ও দান দিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন।

৬৫। 'মদারা (مدارا) শব্দের অর্থ civility, courtesy, humility; ভদ্রতা, শরাফত ইত্যাদি। এ সম্পর্কে রিয়াজের (রিয়াজ-বা, ২৮৯ পৃঃ) সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আছে, "নওয়াব মহবত জং সুবিবেচনার সাথে আফগান মহিলাদের পাথেয় দিয়ে দ্বারভাঙ্গা যেতে অনুমতি দেন।"

৬৬। তাঁর সন্তানদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক মীর্জা মেহদী যে একজন ছিলেন তা ধারণা করা যায়। সন্তানদের মধ্যে আর কে ছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তাঁর একজন অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাও থাকার কথা।

তিনি একদল বিশ্বাসী লোককে আফগানদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অভিপ্রায়ে দারভাঙ্গা প্রেরণ করেন। আফগানদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ বেতিয়ার জমিদারের তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি এই মর্মে নবাবের নিকট পত্র লিখেন যে, তাদেরকে (আফগানদের পরিবারের সদস্যগণকে) যদি মুক্তি দেওয়া হয় তবে [বিনিময়ে] এই নিকৃষ্ট ব্যক্তি নবাবকে তিন লক্ষ টাকা নজরানা দিবেন। কিন্তু তাঁর এই আবেদন গৃহীত হয়নি এবং তাদেরকে [আজিমাবাদে] আনার জন্য একদল কর্মচারীকে প্রেরণ করা হয়। নগরের কাছে তাদের আগমনের পর [নবাব কর্তৃক] আদেশ দেওয়া হয় যে, পূর্ণ প্রহরা ও 'পর্দার' মধ্যে চৌপালা, রথ ও গাড়িতে চড়িয়ে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়ে যেন তাদেরকে ভিতরে আনা হয় এবং তাদের অবস্থানের জন্য যেন বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৭] নবাবের আদেশ অনুসারে সব কাজ করা হয়।

অভিশপ্ত আফগানরা জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত অসম্মান, অপমান ও দুঃখজনক ব্যবহার করেছিল এবং তা লজ্জার খাতিরে প্রকাশ করা যায় না। তারা এসব করেছিল বহু বছর ধরে নবাবের নিমক খাওয়া সত্ত্বেও।[৬৮] এতসব কিছুর পরেও নবাবের প্রাসাদে আগমনের পর তিনি এই আফগান রমণীদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করেন এবং তাদের যত্ন নেন।[৬৮] প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সিরাজ-উদ-দৌলার চেয়ে প্রিয়তর আর কোন ব্যক্তি নবাবের কাছে ছিল না এবং তাঁর প্রতি নবাবের অপত্য স্নেহ উন্মত্ততার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। তাঁকেও তিনি কঠিন আদেশ দিয়েছিলেন যে, যে মহলে আফগান রমণীরা আছেন এবং পর্দার অন্তরালে আছেন, তিনি (সিরাজ-উদ-দৌলা) সেখানে তাঁদের সংবাদ না দিয়ে এবং তাঁদের অনুমতি ছাড়া যেতে পারবেন না।[৬৯] যেসব উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য, ফল নবাবের অতি প্রিয় বস্তু ছিল, সেগুলির অগ্রভাগ তিনি তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। যখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলা বা তাঁদের কাছে কিছু লিখবার ঘটনা ঘটত তাতে 'বিবি' শব্দের প্রয়োগ থাকতই। কিছুকাল পরে তিনি তাঁদের সবাইকে অনেক উপহার সামগ্রী প্রদান করেন এবং তাঁদের পছন্দমতো স্থানে পাঠিয়ে দেন। এই সময়ে নবাব বিজয় ও সাফল্যের বার্তা বহনকারী একখানা পত্র শাহামত জঙের নিকট লিখেন এবং [আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য] উপহার বিতরণ ও দান-খয়রাত করার কথা বলেন। মীর হাবিবের স্ত্রী ও সন্তানগণ তখন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদেই ছিলেন। বিশ্বাসী লোকের মারফৎ

৬৭। বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, অপরিমিত উচ্চাভিলাষ, লোভ ইত্যাদি যত দোষই আলিবর্দীর চরিত্রে থাক্ না কেন, নারীঘটিত ব্যাপারে তাঁর চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ।

৬৮। এ ঘটনা যদি সত্য হয় (খুব সম্ভব গ্রন্থকার সত্য কথাই বলেছেন) তবে তা ছিল খুবই দুঃখ জনক।

৬৯। এ সম্বন্ধে করম আলী খান (ম.না-৪৬ পৃঃ) বলেন, "As Sirajud-Daula wanted to take the daughter of Shamsher Khan Alivardi called her his own daughter and sent her away to her home under escort of trusty men."

উত্তম বস্ত্রাদি ও প্রচুর পথ খরচ দিয়ে তাঁদেরকে মীর হাবিবের নিকট প্রেরণ করার জন্য নবাব সেই পত্রে নির্দেশ দেন।[৭০] সেই সময়ে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্‌র মৃত্যু ও তাঁর পুত্র আহমদ শাহ্‌র হিন্দুস্তানের সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করার সংবাদ [নবাবের কাছে] আসে।[৭১] আফগানদের অত্যাচার ও তাদের উদ্ধত আচরণের ফলে নগরবাসী জনগণের মনে যে দুঃখ ও বেদনার সঞ্চার হয়েছিল, নবাব নিজেকে তার প্রশমনের মলম বলে প্রমাণ করেন এবং নগরবাসীর দুঃখ মোচনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

শিকারে যাওয়ার ব্যাপারে নবাবের শখ ছিল প্রবল। যুদ্ধ জয়ের প্রথম থেকেই শুধু জনরব নয়, [মানুষের মনে] বিশ্বাসও হয়েছিল যে, আজিমাবাদের শাসনকর্তার পদে সওলত জঙকে নিযুক্ত করা হবে। [এ কারণে] সওলত জঙকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে নগরে রেখে নবাব গঙ্গা নদীর অপর তীরে ভ্রমণ ও শিকারের জন্য গমন করেন। সওলত জঙের এই পদ প্রাপ্তি নগরে অবস্থানরত সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় এবং তিনি এমন সব ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্য করেন যা তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এটিই ছিল তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা, শক্তির প্রকাশ ও অন্যান্য অন্যায় আচরণের প্রারম্ভ।[৭২]

সংক্ষেপে, শিকার ও ভ্রমণ শেষ করে নবাব রজব মাসের শেষ দিকে আজিমাবাদ দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। আজিমাবাদের শাসনকর্তার পদপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় নবাব সওলত জঙ বেশ কয়েকজন 'রইস'-কে তাঁর সহচর হিসাবে গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মেহদী নিসার খান,[৭৩] হেদায়েত আলী খানের পুত্রগণ,[৭৪] খাদেম হোসেন খান ও

৭০। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে আলিবর্দীর মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করে।

৭১। খুব সম্ভব ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট মোহাম্মদ শাহর (১৭১৯-৪৯ খ্রিঃ) মৃত্যু ঘটেছিল।

৭২। সিয়ারেও প্রায় অনুরূপ উক্তি আছে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৬৩ পৃঃ দ্রঃ)।

৭৩। সৈয়দ মেহদী নিসার খান ছিলেন সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খানের আপন চাচা-পরবর্তীকালে সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে তাঁর শখ্যতা গড়ে উঠে এবং তাঁর প্ররোচনায় তিনি ও সিরাজ আজিমাবাদ অধিকার করতে আসলে সেই খণ্ড যুদ্ধে মেহদী নিসার খান প্রাণ হারান। এই ঘটনা পরে ২৫ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

৭৪। সিয়ার রচয়িতার পিতা সৈয়দ হেদায়েত আলী খান আসাদ জঙ ছিলেন সেকালের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর পিতা সৈয়দ আলিম উল্লাহ্‌ তবতবায়ি ১১৬৫ হিজরী (১৭৫২ খ্রিঃ) সনে মদীনা থেকে আজিমাবাদে আসেন এবং সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন এবং সেখানে তাঁর মাজার আছে। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সৈয়দ হেদায়েত আলী খান ছিলেন শাহ্‌জা আলী গওহরের উজির এবং তাঁর নাম ও উপাধি ছিল বখশি-উল-মূলক নাসির-উদ-দৌলা সৈয়দ হেদায়েত আলী খান আসাদ জঙ বাহাদুর। নিম্নে তাঁর বংশ পরিচয় তুলে ধরা হল :

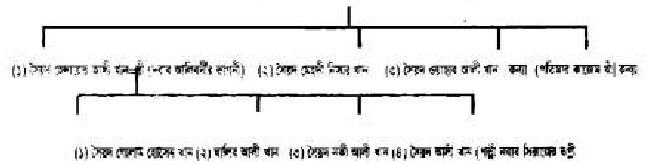

ইজ্জত আলী খান[৭৫] প্রমুখ এবং এর ফলে তাঁর ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নবাব বেগমের[৭৬] মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, [নবাবের অধীনস্থ] সুবাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আজিমাবাদ এবং সওলত জঙকে এই সুবার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলে এখানকার শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া বাঙলার সৈন্যদের গমনাগমন কঠিন হবে এবং সওলত জঙ বেখেয়াল প্রকৃতির মানুষ এবং প্রশাসন ও দুনিয়াদারি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাহীন বিধায় নবাব বেগমের ভয় হল যে, মহাবত জঙের পরে সওলত জঙ নবাব বেগমের কন্যার পুত্র সিরাজ-উদ-দৌলার বড় শত্রু হয়ে পড়বেন।[৭৭] এই কারণে তাঁর অভিমত এই হলো যে, তাঁর নিজের আত্মীয়দের[৭৮] মধ্যে [অন্য] কেউ যেন এই সুবাদারি লাভ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেক চেষ্টার পর সওলত জঙের অপদার্থতা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে তাঁর অযোগ্যতা সম্বন্ধে নবাবের মনে প্রতীতি জন্মাতে সমর্থ হন। [ইতোমধ্যে] তিনি তাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে এই মর্মে মন্ত্রণা দিলেন যে, তিনি (সিরাজ) জনসাধারণ ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সামনে যেন এই ঘোষণা করেন যে, যদি আজিমাবাদ সুবাহ্‌র দায়িত্ব সওলত জঙকে প্রদান করা হয় তবে তিনি (সিরাজ) তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন।[৭৯] নবাব-বেগম নবাবের মনকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত ও আতঙ্কিত করেন যে, নবাব তাঁর পূর্বমত পরিবর্তন করেন।

এই সংবাদ শ্রবণে নবার সওলত জঙ অপমানিত বোধ করেন এবং ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং রাজধানীতে চলে যেতে চান এবং কয়েকদিন দরবারে যাওয়া-আসা থেকে বিরত থাকেন। নবাব নিজেই সওলত জঙের গৃহে যান এবং তাঁর কয়েকটি ভাতা

৭৫। এঁর পরিচয় জানা যায়নি।

৭৬। মূল ফা. পাঠ ঃ 'আহলিয়া-ই-নবাব' (اهلیهٔ نواب) 'the wife of the Nawab'। এখানে বা গ্রন্থের অন্যত্র নবাব বেগমের নামের উল্লেখ নেই। রাজ্য শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বামীর উপরে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে এখানে এবং গ্রন্থের অন্যত্রও দেখা যায়।

৭৭। শুধু আলিবর্দীর নয়, তাঁর বেগমেরও সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি স্নেহ ছিল অপরিসীম এবং তাঁরা দু'জনেই সিরাজের কল্যাণের চেষ্টায়ই সতত রত ছিলেন। কিন্তু মাত্রার অতিরিক্ত স্নেহ দিয়ে তাঁরা তাঁকে অমানুষ করেছিলেন।

৭৮। মূল ফা. পাঠ, 'দর ইন সুরত ব-নহ্‌-ই-সয়ই' বাইয়াদ নমুদকেহ্‌ নিয়াবত-ই-আজিমাবাদ ব-ইয়েক-ই-আজমতুসলান-ই-খো-এশ করারগিরাদ' (در این صورت بنحوی سعی باید نمود که نیابت عظیم آباد بیکی از متوسلان خویش قرار گیرد) এর অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১৩২ পৃঃ) দিয়েছেন, 'So she decided to do her best in order to secure the deputy governorship of Bihar for one of her own partisans." মূল ফারসি পাঠের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে না। এ. এস.-এর পাঠ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ফা. পাঠের (متوسلان) শব্দের অর্থ নিকটবর্তী আত্মীয় এবং সওলত জঙ তাঁর নিজ কন্যার জামাতা হয়েও নিকট আত্মীয় হলেন না কেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

৭৯। এই কুমন্ত্রণা প্রদান নবাব-বেগমের হীন মনোবৃত্তিরও পরিচায়ক এবং এ ধরনের আচরণ সিরাজ-উদ-দৌলাহকে অমানুষে পরিণত করার পথ সুগম করেছিল বলে ধরা যায়।

বৃদ্ধি ও তাঁর সঙ্গে সহৃদয়তা ও বদান্যতার সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনকে শান্ত করেন। বর্ষাকাল আগত প্রায় দেখে আজিমাবাদের কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য নবাব সেখানে কিছুদিন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সিরাজ-উদ-দৌলার স্ত্রীকে মুর্শিদাবাদ থেকে সেখানে আনাবার ব্যবস্থা করেন এবং সেই সঙ্গে রাজা জানকীরামকে সেখানে আনয়ন করার ব্যবস্থা করেন। রাজা জানকী রামের আগমনের পরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে আজিমাবাদের সুবাদার ও রাজা জানকীরামকে তাঁর নায়েব সুবাদারের পদে নিযুক্ত করেন[৮০] এবং রাজা জানকীরামকে 'নওবত' ও ঝালরযুক্ত পালকি ব্যবহারের অনুমতি দেন। সওলত জঙের মনে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি (নবাব) সদরুল হক খানসহ[৮১] রাজা জানকীরামকে সওলত জঙের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। নবাব সওলত জঙের মনে প্রবল অপ্রসন্নতা থাকলেও প্রকাশ্যে তিনি তাঁদের সাথে ভদ্র আচরণ করে বিদায়ের বেলা পান খেতে দেন। বর্ষাকাল[৮২] শেষ হলে রাজা জানকীরামকে নায়েব সুবাদার হিসাবে [আজিমাবাদে] রেখে সওলত জঙ ও সিরাজ-উদ-দৌলাকে সাথে নিয়ে জিলক'দ মাসের শেষ দিকে নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা করেন। পূর্বের শত্রুতাবশত [কিছু] বিঘ্নসৃষ্টিকারী লোক আতাউল্লাহ্ খানের প্রতি নবাবের মনকে বিষিয়ে তুলেছিল।[৮৩] এখন [এ ব্যাপারে] নবাবের সঙ্কল্প দৃঢ় হল। এই কারণে শাহামত জঙের কাছে তিনি এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন আতাউল্লাহ্ খানের কোনো সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও তাঁর কোন ক্ষতি না করে তাঁকে নগর থেকে এমনভাবে বের করে দেওয়া হয় যে, বিজয়ী বাহিনী মুর্শিদাবাদে পৌঁছে তাঁকে যেন অবশ্যই দেখতে না পায়। শাহামত জঙ এই আদেশ পাওয়ার পর তা আতাউল্লাহ্ খানকে দেখিয়ে তাঁকে নগর থেকে চলে যেতে বলেন। প্রতিকারের কোনো উপায় না দেখে আতাউল্লাহ্ খান নিরুপায় হয়ে নিজেকে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর সমর্পণ করেন। বাঙলার প্রশাসন ও ধন সম্পদ থেকে নিজের মনকে

৮০। এ ধরনের উক্তি রিয়াজেও (রিয়াজ-বা, ২৮৯ পৃঃ) আছে। একটু অধিক বিস্তারিত হলেও সিয়ারের বর্ণনাও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড ৬৭-৬৮ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ, অনুরূপ তারিখ-ই-বঙ্গালার বর্ণনাও। তবে রাজা জানকীরামেরও পদলাভ প্রকৃত হলেও সিরাজ-উদ-দৌলার এই পদপ্রাপ্তি অনেকটা কাগুজে ছিল বলেই পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে। কারণ, পরবর্তীকালে সিরাজ আজিমাবাদ অধিকার করতে আসলে জানকীরাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেননি।

৮১। এই ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না।

৮২। বাংলা 'বর্ষাকাল'-কে যে ফারসি ভাষায়ও গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন সেই প্রমাণ আগেও দেখা গেছে।

৮৩। ইউসুফ আলী খানের এই অভিমত পক্ষপাতদুষ্ট। আতাউল্লাহ্ খান যে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন সেই বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৬৮ পৃঃ) আছে। হাতে নাতে ধরা পড়ার পরও আতাউল্লাহ্ খানের জন্য গ্রন্থকারের সাফাই গাওয়া গ্রন্থকারের একদেশদর্শিতারই পরিচায়ক। এ সম্বন্ধে করম আলীর বর্ণনা (য. না, ৪৭ পৃঃ) দ্রঃ।

প্রত্যাহার করে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ও ধন সম্পদ নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে বের হয়ে আসেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল নগদ প্রায় ষাট লক্ষ টাকা এবং ষাট কি সত্তরটি হস্তী।[৮৪] গঙ্গার তীর ধরে অগ্রসর হয়ে তিনি মালদহের নিকট মোহনপুরে জিয়া উল্লাহ্‌র গৃহে থামেন যাতে অবশিষ্ট পথ অতিক্রমের ব্যবস্থা করতে পারেন।

রাজমহল নামেও পরিচিত আকবর নগরে নবাব ঈদ-উল-আজহা পর্ব পালন করে নৌকাতে চড়ে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন এবং সেই মাসের (জিলহজ্জ্) মাঝামাঝি সময়ে ভগবান গোলায় এসে অবতরণ করেন। শাহাম্মত জঙ ও হোসেন কুলী খানসহ নগরের ছোট বড় সব লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য ছুটে আসেন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে নিজেদেরকে সম্মানিত বোধ করেন।[৮৫] সেখানে মনোরম হস্তীর উপর আরোহণ করে স্থল পথে তিনি পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন এবং অতিশয় শুভ মুহূর্তে সেখানে এসে অবতরণ করেন এবং তাঁর দয়া ও দাক্ষিণ্যের ছায়া নগরের সব লোকের উপর ছড়িয়ে দেন তাঁর বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো সৈনিকদেরকে পুরস্কার ও উপযুক্ত (দরিদ্র) লোকদের মধ্যে দান-খয়রাত করেন। আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ ও নত করার জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।

এ সময়ে আজিমাবাদের নবাবের সঙ্গীদের মধ্যে চিরন্তন গোপন বিষয়াবলীর তথ্য উদঘাটনকারী, এবং গুপ্ত ও ব্যক্ত সব তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল জনাব মীর মোহাম্মদ আদামাল্লাহ্ জামাল রাফতাহ্, দাউদ আলী খান, আলী ইবরাহিম খান, নকী কুলী খান ও হাজী মোহাম্মদ খান এবং সেখানে সওলত জঙের সহচরদের মধ্যে মেহদী নিসাব খান, হেদায়েত আলী খানের পুত্রগণ,[৮৬] খাদেম হোসেন খান, ইজ্জত আলী খান, দীন মোহাম্মদ খান, মৌলভী ইয়াসিন খান, মুফ্‌তি মিএ্রা উল্লা খান প্রমুখ এবং অন্য আরও কয়েক ব্যক্তি বাঙলায় আসেন। আজিমাবাদের সুবাদারি না পাওয়া এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহাম্মত জঙের সঙ্গে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব না থাকার কারণে এবং সেই সঙ্গে সিরাজ-উদ-দৌলার ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে সওলত জঙ মুর্শিদাবাদে গিয়ে বসবাস করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে ভগবান গোলাতে থেকে যান। এখানে প্রায় দুই মাস অবস্থান করার পর তাঁর চাচা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনবরত অনুরোধের পর ভগবান গোলা থেকে যাত্রা করে সওলত জঙ নিজের জন্য যে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তাতে গিয়ে উঠেন এবং সেই প্রাসাদ ছিল মুর্শিদাবাদের বিপরীত দিকে ভাগীরথীর তীরে। সেই সময়ে পুর্ণিয়ার ফৌজদার সাইফ খানের মৃত্যু সংবাদ [মুর্শিদাবাদে] এসে পৌছে। এই ঘটনার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

৮৪। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৬৯ পৃঃ) আছে।

৮৫। অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৬৯ পৃঃ) আছে।

৮৬। সৈয়দ হেদায়েত আলী খানের জ্যেষ্ঠপুত্র সিয়ার রচয়িতা গোলাম হোসেন খান সেই সময়েই দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন।

বিংশ অধ্যায়

পুর্ণিয়ার ফৌজদার সাইফ খানের মৃত্যু ও পরবর্তী ঘটনা[১]

উমদাত-উল-মূলক আমির খান[২] আলমগিরীর পুত্র সাইফ খান ত্রিশ বছরেরও অধিককাল ধরে পুর্ণিয়ার ফৌজদার পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন ফখর-উদ-দীন হোসেন খান। তাঁর চরিত্রে বুদ্ধিমত্তা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অভাব দেখে নবাব চিন্তা করেন যে, এই এলাকার প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হলে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।[৩] [তখন] বাঙলায় নবাব সওলত জঙের কোনো ভাল কাজ ছিল না এবং প্রশাসনিক ও রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে সতর্কতা ও সাবধানতার প্রয়োজনীয় গুণাবলী[৪] তাঁর মধ্যে ছিল বলে নবাব তাঁকে এই কাজের যোগ্য বিবেচনা করে তাঁকে মূল্যবান খিলা'ত, মণিমুক্তা খচিত তরবারি ও

১। এ. এস.-এর গ্রন্থে (ফারসি ও ইংরেজি উভয় গ্রন্থ) এখানে কোনো পরিচ্ছেদ ভাগ করা হয়নি এবং পরিচ্ছেদের কোনো শিরোনামও নেই। স্যার যদুনাথ কর্তৃক অনূদিতে গ্রন্থে কোনো শিরোনামা না থাকলেও স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের ('XXII') উল্লেখ আছে (য.না.-১৩৪ পৃঃ)। সুবিধার্থে এখানে বিংশ অধ্যায় ভাগ করা হল।

২। উমদাত-উল-মূলক্ আমির খান আলমগিরী সম্রাট অওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন সাইফ খান। তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে পুর্ণিয়ার ফৌজদার ছিলেন এবং একজন ফৌজদার হলেও তাঁর যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ছিল বলে দেখা যায়। নিম্নে তাঁর বংশ তালিকা প্রদত্ত হল।

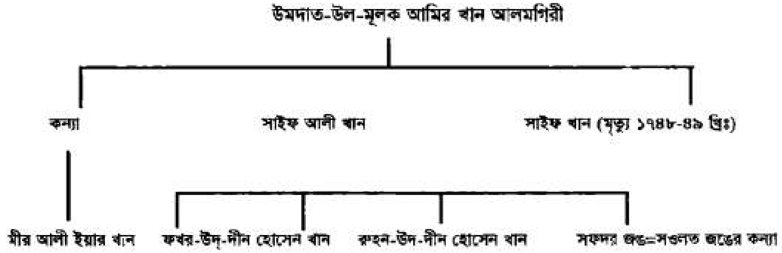

৩। আলিবর্দীর পক্ষে মিথ্যা সাফাই গাইতে গিয়ে গ্রন্থকার সত্যভ্রষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহমদ সওলত জঙকে কোনো উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করার কারণেই আলিবর্দী নানা বাহানার সৃষ্টি করে ফখর-উদ-দীনকে পদচ্যুত করেছিলেন এবং তাঁর সাথে অমানবিক ব্যবহার করেছিলেন।

৪। এর আগে আলিবর্দীর বেগম সওলত জঙ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছিলেন তা স্মর্তব্য।

হাওদাসহ একটি হস্তী প্রদান করে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং পুর্ণিয়ার ফৌজদারির পদ দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। সওলত জঙ হুগলীর ফৌজদারির পদ পরিত্যাগ করলে তা সিরাজ-উদ-দৌলাকে প্রদান করা হয়।[৫]

নবাব সওলত জঙ প্রথমে খাদেম হুসেন খানকে [সৈন্য-সামন্তসহ] অগ্রগামী দল হিসাবে [পুর্ণিয়ায়] প্রেরণ করেন এবং একই বছরের রবি-উল-আউয়াল মাসের শেষ দিকে নিজেই পুর্ণিয়া যাত্রা করেন। আজিমাবাদে তাঁর ভাই হয়বত জঙের যেসব বন্ধু ছিলেন সেই সব রইসদের মধ্যে মেহদী নিসার খান, আকা আবদুল আজিজ, হেদায়েত আলী খানের পুত্রগণ, ইজ্জত আলী খান প্রমুখ তাঁর সঙ্গে পুর্ণিয়া যাওয়ার সঙ্গী হন। নবাবের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় না দেখে[৬] ফখর-উদ-দীন হোসেন খান আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের কথা বলে নবাবের কাছে একখানা পত্র লিখেন। উত্তরে নবাব লিখেন, "আমার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থেকে এখানে এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ আমাকে দিতে পারেন। আল্লাহ্ চাহেন তো আপনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।"[৭]

আনুগত্য প্রকাশ ব্যতীত বিরোধিতা প্রদর্শনের কোনো ক্ষমতা না থাকার কারণে ফখর-উদ-দীন হোসেন খান পুর্ণিয়া পরিত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন।[৮] তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নবাব একদল লোক সেখানে প্রেরণ করেন। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে নবাব তাঁকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং অধিক সম্মান দেখানোর দৃষ্টান্তস্বরূপ [তাঁর আগমন উপলক্ষে] গালিচা বিছানর ব্যবস্থাও করা হয়। এবং ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী তাঁকে আতর, গোলাপ পানি ও পান দেওয়া হয় এবং [এভাবে নবাব] তাঁর প্রতিপূর্ণ বন্ধুত্ব ও ভদ্রতা প্রদর্শন করেন। তাঁর জন্য একটি মহল নির্দিষ্ট করে সেখানে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করে নবাব তাঁর কাছ থেকে বিদায় নে

৫। এ সম্বন্ধে সিয়ারের (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৭৪পৃঃ) বর্ণনা অধিক বিস্তারিত। হুগলীর ফৌজদারের পদ সিরাজ-উদ-দৌলাকে প্রদান করা হলেও প্রকৃতপক্ষে আলিবর্দীর সৎভাই মোহাম্মদ ইয়ার খান ওরফে মীর্জা প্যারনকে সেখানে স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।

৬। মূল ফা. 'চারাহ্-বদউন তৌসিল ররআন জনাব, না দাশ্‌ত্'

(چاره بدون توسل بآجناب نداشت) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১৩৪ পৃঃ) দিয়েছেন "Fakhruddin Husain Kh. knowing himself powerless."। এই পাঠ সঠিক অনুবাদ নয়। এ. এস-এর অনুবাদ, "Who had no alternative to meeting the Nawab" অধিক গ্রহণযোগ্য।

৭। আলিবর্দীর আর এক জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত এখানে দেখা যাচ্ছে। ফখর-উদ-দীনকে সুন্দরভাবে পত্র লিখে মুর্শিদাবাদে এনে তিনি তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখেন এবং পরে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এবং অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নিজের স্বার্থের জন্য আলিবর্দী যে কত নিচে নামতেন তার দৃষ্টান্ত এখানে আছে। নিজের জামাতাকে চাকুরি দিবার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন।

৮। এখানে সিয়ারের বর্ণনা (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ) অধিক বিস্তারিত।

কিছুকাল পরে তাঁর আচরণের মধ্যে বিরোধিতা ও শক্রতার চিহ্ন [এবং সেই সঙ্গে] পাগলামি ও বিষাদ বায়ুর লক্ষণ দেখে তাঁর কাছে ক্ষমতার লাগাম থাকা সুবিধাজনক মনে না করে এবং এমন একজন লোকের কাছে এত অর্থ থাকা নিরাপদ মনে না করে নবাব তাঁর সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারি করেন।[৯] তাঁর বসবাসের জন্য একটি গৃহ নির্ধারিত করে তাঁর নিত্য প্রয়োজনীয় সমুদয় বস্তুর ব্যবস্থা করে তাঁর আবাসে থাকার বন্দোবস্ত করেন এবং তাঁর গৃহে প্রহরার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সম্পর্কে অবশিষ্ট কথা পরে বর্ণিত হবে।

৯। গ্রন্থকারের নির্লজ্জতা সীমা ছাড়িয়ে গেছেন বলে দেখা যাচ্ছে। সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন তবতবায়ী আলিবর্দীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর দোষ স্খালনের ব্যাপারে সচেষ্ট হলেও এখানে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ) বলতে বাধ্য হয়েছেন, "The latter (Alivardi) now became covetous."। শেষ পর্যন্ত আলিবর্দী ফখর-উদ-দীনের সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখেন। অথচ আলিবর্দীর অন্ধ ভক্ত ইউসুফ আলী কল্পিত দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন অসহায় ফখর-উদ-দীনের ঘাড়ে।

একবিংশ অধ্যায়

রঘুর পুত্র জানুজীর অবস্থা ও রায়রায়ান চিন রায়ের মৃত্যু

রঘুর পুত্র জানুজী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ। শমশির খানের নিহত হওয়ার পরে জানুজী রিক্ত ও হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে বাঙলার দিকে অগ্রসর হলে পথিমধ্যে তিনি তাঁর মাতার মৃত্যু সংবাদ পান।[১] মীর হাবিবকে তিনি কয়েক হাজার মারাঠা ও আফগান সৈন্য দিয়ে মেদিনীপুরে প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজে দাক্ষিণাত্যের পথে অগ্রসর হন। [পিতার কাছে] তাঁর [জানুজীর] আগমনের পর রঘু তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নানাজীকে[২] একদল মারাঠা সৈন্যসহ মীর হাবিব উল্লাহ্ খানের নিকট পাঠিয়ে দেন।

নবাবের আজিমাবাদে অবস্থানকালে এই বছরের (১৭৪৯ খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এই যে, রায়রায়ান চিনরায় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৩] তিনি খালিসা [ভূমির] দিওয়ানের পেশকার ছিলেন। সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। [তাঁর মৃত্যুর পর] পেশকার বীরুদত্ত সরকারিভাবে এ কাজে নিযুক্তি না পেলেও প্রায় এক বছর পর্যন্ত দিওয়ানির কাজ চালিয়ে নেন। তার পরে তাঁকে এই পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে রায়রায়ান উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই কর্মকর্তার অবশিষ্ট বর্ণনা যথাস্থানে প্রদত্ত হবে।

১। জানুজীর মাতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির ঘটনাসহ তাঁর সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা সিয়ারেও(সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃঃ) আছে।

২। মূল ফা. পাঠে, 'বেরাদর-ই-কুচাকাশ নানাজী' (برادر کوچکش ناناجی) থাকলেও এ. এস. ইংরেজি অনুবাদে (৮৫ পৃঃ) 'সাবাজী' ('Sabaji) পাঠ দিয়েছেন। সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৭৭ পৃঃ) সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা আছে এবং তা হচ্ছে, "....from whence, Raghodji, his father, sent his younger son Bimba-dji, with a strong body of Marhattah horse to join Mir Habib."

৩। মূল ফা. পাঠ, 'ব-আ'রযা-ই-তপ ব-মকরে আসলি শিতাফ্‌ত্' (بعارضهٔ تپ بمقرا اصلی شتافت) 'hastened to the original place because of fever', অর্থাৎ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। চিনরায় সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃঃ) বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নবাবের মেদিনীপুর অভিযান, মারাঠাদের বহিষ্কার, কটক অধিকার ও অন্যান্য ঘটনা

শমশির খানের বিরুদ্ধে অভিযান ও তাঁর পতনের পর নবাব[১] মনে স্বস্তি লাভ করেন এবং সমগ্র বিহার সুবাহ ঐ অকৃতজ্ঞ মানুষদের অস্তিত্বের কন্টক থেকে মুক্ত হয়। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের জন্য নবাবের সুবিচার, দয়া-দাক্ষিণ্য ও তাঁর করুণার বিশুদ্ধ পানি বিতরণ ইত্যাদি কারণে বাঙলা সুবাহ্ও স্বর্গের কাননের ঈর্ষার বস্তু হয়ে পড়ে।[২] একদল মারাঠা ও আফগান সৈন্য নিয়ে মীর হাবিবের কটক ও মেদিনীপুরের ময়দানে সক্রিয় হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছাড়া অন্য কোথাও বিরোধিতা ও শত্রুতা ছিলনা।[৩] ঐ ক্ষতিকর মানুষগুলিকে[৪] তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা কর্তব্য মনে করে রবি-উস-সানি মাসের শুরুতে (১৩ই মার্চ, ১৭৪৯ খ্রিঃ) নবাব তাঁর বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হন। তাঁর সেনাবাহিনী সমবেত হওয়ার জন্য নবাব দিন কয়েক কাটোয়াতে অবস্থান করেন। বিরাট সেনাবাহিনী জমায়েত হলে তিনি বর্ধমান অভিমুখে অগ্রসর হন। সাত কি আট হাজার পদাতিক সৈন্য ও প্রায় দুই হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনীর দারোগা হায়দর আলী খান কয়েক মাস আগে নবাবের আদেশে [বর্ধমানে] শিবির স্থাপন করেছিলেন যাতে মারাঠারা বর্ধমান ধ্বংস অথবা বাঙলায় প্রবেশ করতে চাইলে তিনি পথ রোধ করে মারাঠাদের প্রতিরোধ করতে পারেন। নবাব বর্ধমানের নিকটবর্তী স্থানে গেলে হায়দর আলী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান এবং নবাব তাঁকে প্রচুর পারিতোষিক প্রদান করেন।

১। ফা. পাঠ, 'খাতির-ই-আশরাফ' (خاطر اشراف) মহান হৃদয় অর্থাৎ নবাব আলিবর্দী খান।

২। মূল ফা. 'ওয়া সুবাহ্-ই-বঙ্গালাহ্ নিয্ আয্ ইমন-ই-মুয়া'দলাত ওয়া বসত-ই-মোকারেমাত ওয়ানশর রিশহাতে-ই-যলাল-ই-আলতাফ-ই-আন্ জনাব বর মফারক-ই-কাফা-ই-সুকানা-ই-আন মমল-কাত আজ রেয়া'য়া ওয়া বরায়া মহ্সুদ রওযা-ই-রিয্ওয়ান বুদ'

(وصوبهٔ بنگاله نیز از یمن معدلت و بسط مکرمت و رنشر رشحات زلال الطاف انجناب بر مفارق کافهٔ سکنهٔ آن مملکت از رعایا و برایا محسود روضهٔ رضوان بود)

পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১৩৫ পৃঃ) দিয়েছেন, "and the province of Bengal, too, was enjoying peace and happiness from the just and kindly rule of Alivardi." এই সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদের সঙ্গে ফা. পাঠের বিশেষ কোন সঙ্গতি নেই। এ. এস.-এর পাঠ (৮৬ পৃঃ) সঠিক।

৩। স্যার যদুনাথ-এর পাঠ (১৩৫ পৃঃ) "Only in the subah of Katak and Midnapur Mir. Habib was plundering with a force of Marathas and Afghans." মন গড়া ও মূল ফারসি পাঠের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন।

৪। মূল ফা. পাঠ ঃ 'আন গুরোহ্-ই-ওখিম আল আ'কেবাত' (آن گروه و خیم العاقبت) এর অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৩৫ পৃঃ), 'a force of Marathas and Afghans'। মূল পাঠের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর নবাব মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হতে চাইলে হায়দর আলী খানের অধীনস্থ তোপখানার আমলারা ও শুল্ক বিভাগের একদল কর্মচারী বকেয়া বেতনের জন্য প্রবল দাবি উথাপন করে অভিযানে অগ্রসর হতে অসম্মতি জানায়। নবাব গ্রন্থকারের মরহুম পিতাকে[৫] মীর্জা হাকিম বেগের সঙ্গে তাদেরকে শান্ত করার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁরা যত কিছু বলেন সবই নিরর্থক হয়। পরদিন নবাব নিজেই হায়দর আলী খানের গৃহে যান এই উত্তেজিত মানুষগুলিকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে। তাদের উত্তেজনাপূর্ণ কথার জবাবে নবাব সহৃদয়তাপূর্ণ উত্তর এবং বকেয়া বেতনের একাংশ তৎক্ষণাৎ পরিশোধ ও বাকি বেতন নবাব শাহাম্মত জঙের মাধ্যমে দিন কয়েকের মধ্যে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনো ফল হয়নি। এই অশিষ্ট আচরণের মানুষগুলি তাদের প্রবল অসহিষ্ণুতা ও শত্রুতাপূর্ণ কপটতার কারণে তাদের দাবিতে অটল থাকে। স্থল শুল্ক বিভাগের প্রধান মীর ফজলে আলীও ছিলেন এই অন্যায়কারী দলের বন্ধু ও তাদের দাবির সমর্থক এবং বিখ্যাত এক প্রতিবেদন মতে তিনি ছিলেন তাদের অন্যায় উদ্দেশ্যের প্ররোচনা ও সাহায্যকারী। নবাব এই নিমকহারামদের সবাইকে পদচ্যুত করে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য শাহাম্মত জঙকে আদেশ দেন।

এই সমস্যা সমাধান করার পর যে পাঁচ কি ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য তাঁর কাছে ছিল নবাব তাদের নিয়ে ও কোরানের এই বাণী "আল্লাহ্‌র নিকট ব্যতীত অন্য কারো হাত থেকে সাহায্য পাওয়া যায় না"[৬] স্মরণ করে শত্রু দমনে অগ্রসর হন। কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর তাঁর বিজয়-পতাকা মেদিনীপুরের নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হলে মীর হাবিব মেদিনীপুর শিবিরের কয়েকজন মারাঠা সৈন্যকে নিয়ে তাদের বাড়িঘর ও বাসস্থান ধ্বংস করে ও পুড়িয়ে ফেলে এবং মনে হয় কোরানের এই বাণী মতে "তারা নিজের হাতে তাদের বাসস্থান ও বাড়িঘর ধ্বংস করে। ওহে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা যাদের চক্ষু আছে"[৭] এবং এর পরে তারা পলায়ন করে। মেদিনীপুরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ও কানসাই নদী অতিক্রম করার পর নবাব তাঁর বিজয়-পতাকা

৫। সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৭৭ পৃঃ) গ্রন্থকারের পিতা গোলাম আলী খানের নামসহ প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে। গ্রন্থকারের পিতা ১৭৬৩-৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদে প্রাণত্যাগ করেন এবং গ্রন্থকার এর কিছুকাল পরে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

৬। কোরানের বাণী ঃ 'ওয়ামায়ান্ নাসরু ইল্লামিন ই'ন্দেল্লাহ্'

(وَمَا النَّصرُ الأَمن عند الله) "and there is no help except from God"।

৭। কোরানের বাণী, 'ওয়া ইউখ রিবুনা বুইউতাহুম [ওয়া আইদিল মু'মিনিনা] ফা'-আতাবিরু ইয়া আউলিল আবসারি

(وَ يُخرِبُونَ بيُو تَهُم [وَ ايدى المُؤمنينَ) فَاعتَبِرُو ايَا أُولى الأَبصَار) 'They destroy their óuses with their own hands; so take lesson, O those have eyes.'

স্থাপন করেন। তখন চর মারফত জানা যায় যে, বিক্ষিপ্ত মারাঠা সৈন্য মেদিনীপুরের জঙ্গলে ঘুরাফিরা করছে। নবাব এই মর্মে আদেশ দেন যে, মীর মোহাম্মদ কাজেম খান, দোস্ত মোহাম্মদ খান প্রমুখ [সেনাপতিগণ] মারাঠা সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন ও ধ্বংস করবেন। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাঁদের পিছনে ধাওয়া করে পথের শেষে এই হতভাগাদের সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করে। অবশেষে নবাবের সৈন্যদের ভাগ্যে বিজয়ের মালা পড়ে। শত্রু পক্ষ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে কটক অভিমুখে পলায়ন করে।

নবাব এগিয়ে চলেন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করে বালেশ্বর বন্দরে এসে উপস্থিত হন। এখানে তিনি পাকা খবর পান যে, মীর হাবিব ও নানাজী[৮] যুদ্ধ করার কোন ক্ষমতা না থাকার কারণে তাঁদের সঙ্গের সৈন্য নিয়ে কটকের অরণ্যে ঘুরাফিরা করছে। একে একে সরু, ভদ্রক ও জাজপুর[৯] অতিক্রম করে নবাব বরোহ্[১০] নামক স্থানে এসে থামেন। এখান থেকে কটকের দূরত্ব আটাশ ক্রোশ। বারবাটি দুর্গ ছিল সৈয়দ নূর, সর আন্দাজ খান ও ধর্মদাস হাজারীর অধিকারে। এখানে নবাব তাঁদের কাছ থেকে পত্রাদি পান এবং তাতে যা লিখিত ছিল তা নিম্নরূপ ঃ "আমরা ভৃত্যগণ হুজুরের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত। হুজুরের বিজয়ী বাহিনী এখানে পৌছলে দুর্গের চাবি আমরা হুজুরের কর্মচারীদের হাতে তুলে দিব এবং নিজেদেরকে হুজুরের খেদমতে হাজির করব।"[১১]

মীর মোহাম্মদ জাফর খান, ফকির উল্লাহ্ বেগ খান ও দোস্ত মোহাম্মদ খান প্রমুখকে তাঁদের অধীনস্থ সমুদয় সৈন্য নিয়ে অরণ্যে ঘুরাফিরারত মীর হাবিবের সৈন্যদের অনুসন্ধানে নবাব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সর আন্দাজ খান প্রমুখের পত্রের মর্ম অবগত হয়ে নবাব তাঁর সঙ্গে যে অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং সর্বসাকল্যে তা দু'হাজারও হবে না তা নিয়েই সেদিন সন্ধ্যায় বারবাটি দুর্গ অধিকারে অগ্রসর হন। তিনি কোথাও না থেমে সারারাত ও পরের অর্ধেক দিন ধরে অনবরত চলতে থাকেন এবং বড়বাটি দুর্গের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত মহানদা[১২] নদী অতিক্রম করার পর দুর্গ পরিদৃষ্ট হলে নবাব সেখানে বিজয়ী পতাকা স্থাপন করেন। অনবরত ছয় প্রহর (আঠার

৮। মূল ফা. পাঠ 'নানাজী' (ناناجی) (তা-ফা. ১১৯ পৃঃ)। এ. এস.-এর অনুবাদ (৮৮ পৃঃ), "Sabaji" (সাবাজী) এবং যদুনাথের (১৩৬ পৃঃ) 'Sabaji' (সাবাজী)। সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৭৯ পৃঃ), 'Manadji' (মানাজী)।

৯। ফা. পাঠ, 'জাজপুর' (جاجپور)। উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত 'জাজনগর' স্থানের উল্লেখ ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে মীনহাজ রচিত তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে (আ. কা.মো. যাকারিয়া কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের ১৪৪, ১৪৫ ও ১৬৫ পৃষ্ঠায় আছে)। এই স্থানই খুব সম্ভব আলোচ্য গ্রন্থের জাজপুর।

১০। মূল ফা. পাঠ, 'বরোহ্' (بروه)। এ. এস. (৮৮ পৃঃ), 'Barwa' (বরওয়া); স্যার যদুনাথ (১৩৬ পৃঃ), 'Barwa' (বরওয়া)।

১১। বারবাটি দুর্গে অভিযান ও পরবর্তী ঘটনাসমূহের বর্ণনা সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৭৯-৮১ পৃঃ) সামান্য একটু ভিন্ন রকমে আছে।

১২। মূল ফা. পাঠ, 'রুদ খানাহ্-ই-মহানদা' (رودخانهٔ مهاندا) 'The river of Mahanada'।

ঘন্টা) পথ চলার কারণে নবাবের সঙ্গে যে প্রায় দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য যাত্রা করেছিল দুর্গের পাদদেশে পৌঁছার সময় তাদের মধ্যে তিন শতের অধিক সৈন্য তাঁর সঙ্গে ছিল না। যদি সেই সময়ে দুর্গের অধিবাসীরা তাদের আক্রমণ করে বসত তবে পথের অত্যধিক ক্লান্তি ও দুর্বলতার কারণে নবাবের সেনাদল সেই আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারত না। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে ও ঐ ভাগ্যবান ব্যক্তির শক্তির কারণে দুর্গবাসীদের মনে ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় এবং আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ ব্যতীত তারা আর কোনো উপায় দেখতে পায়নি। তাঁবু বহনের ব্যাপারে কুলিদের বিলম্ব হেতু শিবিরে যথেষ্ট সংখ্যক তাঁবু ছিল না। তাঁবুর অভাব এবং তদুপরি প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ এত অধিক ছিল যে, তা রোজ কেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দিনান্তে সৈয়দ নূর ও ধর্মদাস নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে যেতে চাইলে পরদিন প্রভাতে সরআন্দাজ খানকে সঙ্গে নিয়ে আসা ও নবাবের নিকট দুর্গ সমর্পণের কথা তাঁদেরকে বলা হয়। শত্রুপক্ষের সঙ্গে এই দুই ব্যক্তির বন্ধুত্ব বরাবরই ছিল এবং তাঁরা বিরোধিতা ও বিবাদ সৃষ্টির কাজ থেকে কোনদিন বিরত হননি এবং তাঁরা বরাবরই বিধর্মীদের পক্ষে ছিলেন। তাঁদের আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করাকে ভয়ের কারণে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বলে নবাব মনে করেন এবং তাঁদের জীবন সূত্র ছিন্ন করা সুবিধাজনক মনে করে পরদিন প্রভাতে তাঁরা আসলে তরবারির আঘাতে তাঁদের জীবনের আলো নির্বাপিত করার জন্য নবাব তাঁর একদল বিশেষ অনুচরকে আদেশ দেন।[১৩] কারণ, সেই আলোক [অতীতে] অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেছিল।

পরদিন প্রবাতে 'পাল' নামে কথিত একটি ক্ষুদ্র তাঁবুতে নবাব বসেছিলেন। সেদিনই ছিল সেই হতভাগাদের জীবন সায়াহ্ন। সিরাজ-উদ-দৌলা কয়েকজন সৈনিকসহ তাঁবুর পর্দার বাইরের প্রাঙ্গণে অপেক্ষারত ছিলেন। ধর্মদাস ও সৈয়দ নূর প্রথমে আসেন এবং তাঁদেরকে খাস মজলিসে আসন গ্রহণ করতে বলা হয়। নবাব তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার কথা বলতে থাকেন এবং তখন সংবাদ পাওয়া যায় যে, সরবুলন্দ খান নিকটেই এসে গেছেন। সরআন্দাজ খান তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ গাড়ি থেকে অবতরণ করতে চাইলে সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর সঙ্গীদের আদেশ দিলেন

১৩। মূল ফারসি 'ব-আয়মরহা-ই-আয্ খোয়াস আরশাদ ফরমুদাহ কেহ্ সুবহি-ফরদা হিন রাসিদান-ই-আঞ্জা শমলাহ্-ই-হায়াত-ই¯শানরা কেহ মওজব¯ই¯ইশ্তিয়া`ল চন্দিন মুফাসদ আসত বা¯ব¯ই¯শমসির এতফা নমায়েন্দ'

(بازمرهای از خواص ارشاد فرموده که صبح فردا حین رسیدن آنها شملهٔ حیات شان را که موجب اشتعال چندین مفاسد است بآب شمشیر اطفاء نمایند) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৩৭ পৃঃ) "and decided as a matter of political necessity to cut the thread of life of such mischief makers; he ordered the party of his personal attendants to kill them with their swords when they would arrive (to interview him) next morning"। এই ভাবানুবাদ কিছুটা অর্থবোধক হালেও মূল ফারসি পাঠের সঙ্গে এর মিলের একান্ত অভাব। এ. এস.-এর অনুবাদ (৮৯ পৃঃ) গ্রহণযোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, আলিবর্দীর এই গর্হিত আচরণের সমর্থনে গ্রন্থকার ইউসুফ আলী যে কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করেছেন তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। 'দূত অবধ্য' এই অতি সাধারণ নীতিমালাও আলিবর্দী মেনে চলেননি। আলিবর্দীর বিশ্বাসঘাতকতার আর এক জঘন্য দৃষ্টান্ত এই নিরস্ত্র ব্যক্তিদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করা।

তাঁদেরকে হত্যা করার জন্য।[১৪] এ কার্যের জন্য সেখানে অপেক্ষারত লোকগুলি সরবুলন্দ খানের দেহ থেকে তাঁর আত্মারূপ আরোহীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং তাঁর জীবনের আলো নির্বাপিত করে দেয়। সেই অবস্থায়ও সরআন্দাজ খান নিজে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে তাঁর সাধ্যমত আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পিছপা হননি।[১৫] সৈয়দ নূর ও ধর্মদাস ছিলেন নবাবের সামনে। সেখান থেকে তাঁরা এই অবস্থা দেখে আতঙ্কিত ও হতাশ হয়ে পড়েন। সেখানে উপস্থিত [নবাবের] লোকজন তাঁদেরকে বন্দী করে ও [নবাবের] আদেশ অনুসারে তাঁদেরকে কিশোয়ার খানের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

দুর্গের অধিবাসীরা ছিল সরআন্দাজ খান ও ধর্মদাসের সঙ্গী ও বন্ধু।[১৬] এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনে তারা দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। দুর্গের পাদদেশে অবস্থান করা সুবিধাজনক মনে না করে এবং এর প্রয়োজনও ছিল না বলে নবাব মীর হাবিবের অনুসরণ থেকে সদ্য প্রত্যাগত মীর মোহাম্মদ জা'ফর আলী খান, ফকির উল্লাহ বেগ খান, রাজা দুর্লভ রাম প্রমুখকে দুর্গ অবরোধ করার আদেশ দেন। তিনি নিজে কটকের প্রাসাদে প্রবেশ করেন। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের অগ্নি পনের দিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকে।[১৭] অবশেষে দুর্গবাসীদের পক্ষে নবাবের-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আর থাকেনি। অধিকন্তু তাদের রসদও ফুরিয়ে গিয়েছিল। তারা মীর মোহাম্মদ জাফর আলী খান ও রাজা দুর্লভ রামের মাধ্যমে [ক্ষমা প্রার্থনা করে] তাদের নিরাপত্তা বিধানের শর্তে দুর্গ সমর্পণের প্রস্তাব দিলে রাজা ও সেই খান নবাবের কাছে তাঁদের আবেদন পেশ করেন। মহানুভবতাবশত নবাব তাদের নীচতাকে ক্ষমা ও উপেক্ষা করেন। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ (ব্যক্তিদ্বয়?) তাদের ক্ষমা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের সংবাদ নিয়ে যান। পরদিন তারা নবাবের লোকের কাছে দুর্গের দ্বার খুলে দিয়ে দ্রুতগতিতে জাফর খান, ওমর খান ও দুর্লভরামের কাছে ছুটে যায়। নবাব দুর্গ পরিদর্শনে গিয়ে বিজয়োল্লাসে তাতে প্রবেশ করেন।

১৪। সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে এ ধরনের অনেক মহৎ কাজ করেছিলেন।

১৫। মূল ফারসি 'দরআন্‌হাল মশার-ই-ইলায়্হে নিয্ বেহাওয়াসি ব-খোদ রাহ্ নাদাদাহ্ বকদর-ই-ইমকান দর মদাফিয়াহ্ ওয়া মকাওয়াহ্ খোদরা মুকাস্‌সের না দাশ্‌ত' (در آن حال مشار اليه نیز بیحواس بخود راه نداده بقدر امکان در مدافعه و مکاوحه خود را مقصر نداشت) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৩৭ পৃঃ) "Sarandaz Kh. without yielding to despair, fought in self defence as long as he could." এবং এ. এস. দিয়েছেন (৯০ পৃঃ). "Sarandaj Khan was out of his senses, and to the best of his capacity, he gave a good fight." এ. এস-এর (بیحواسی بخود راه نداده) পাঠের অনুবাদ 'was out of his senses' শুধু ত্রুটিপূর্ণ নয়, মূল পাঠের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে 'কাণ্ডজ্ঞান না হারিয়ে'। যদুনাথের পাঠ ত্রুটিপূর্ণ হলেও কিছুটা অর্থবোধক।

১৬। মূল ফা. 'মরদম-ই-কিল্লায়হ্' আয্ হমরাহান ওয়া রফাকা-ই-সর আন্দাজ খান.....' (مردم قلعه از همراهان ورفقای اند از خان) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৩৮ পৃঃ); "The garrison of the fort and the followers of Sarandaz Khan, on hearing of it, closed the gates of the fort and made ready for fighting." এ পাঠ ত্রুটিপূর্ণ বিশেষ করে প্রথম অংশে।

১৭। মূল ফারসি 'ওয়া তা পান্‌য্দাহ্ রোয্ আয্ তারফিন আতশ-ই-কতাল ওয়া জুদাল ইশ্‌তিয়া'ল দাশ্‌ত্ (و تا پانزده روز از طرفین آتش قتال و جدال اشتعال داشت) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১৩৯ পৃঃ) দিয়েছেন, "for fifteen days the two sides fought together."। এই পাঠ ত্রুটিপূর্ণ এবং মূল পাঠের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। সঠিক পাঠ উপরে অনুবাদে দেওয়া হয়েছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বারবাটি[১] দুর্গ ও কটক নগরের বর্ণনা

বারবাটি দুর্গ ও কটক নগর প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ দুর্গ ও কটক নগরের বসতিপূর্ণ এলাকা যেখানে অবস্থিত তা মহানদা ও কাটাজুরি নামক দুটি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ স্থানের নদীর উপরের পার্শ্ববর্তী উঁচু ভূমি পাথর বসিয়ে দৃঢ় করা হয়েছে এবং তা 'পোশতাহ্'[২] নামে পরিচিত। বর্ষাকাল ব্যতীত [বছরের] অন্য সময়ে উভয় নদীই হেঁটে পার হওয়া যায়। তখন [বর্ষাকালে] মহানদার প্রশস্ততা হয় প্রায় দুই ক্রোশ এবং কাটাজুরির প্রশস্ততা হয় এর প্রায় অর্ধেক।

বারবাটি দুর্গ মহানদা নদীর তীরে অবস্থিত এবং দুর্গ প্রাচীরের পরিধি হবে প্রায় তিন ক্রোশ। পাথর ও পোড়া ইট দিয়ে এই প্রাচীর নির্মিত। প্রাচীরের চারদিক বেষ্টন করে আছে কঙক্রিটের তৈরি ও জলপূর্ণ পরিখা। কটক নগরীর অধিবাসীরা প্রধানত কাটাজুরি নদীর তীরে বসবাস করে। নগর থেকে দুর্গের দূরত্ব হবে প্রায় দুই ক্রোশ।

বহু বছর ধরে সেনাবাহিনীর গমনাগমনের পথ বলে এবং মারাঠাদের আক্রমণের ফলে কটকের অধিবাসীর সংখ্যা খুব বেশি এবং এর দৃশ্যও খুব মনোরম ছিল না। কাটাজুরি নদীর তীরে অবস্থিত [সরকারি] কর্মকর্তাদের গৃহ ও ইমারতাদি দেখতে খুবই সুন্দর ও বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে কাটতজুরি নদীর তীরে অবস্থিত সমগ্র নগর এই ব্যাপারে অন্যান্য অনেক নগর থেকে উন্নতমানের। কারণ, কাটাজুরি নদীর পাকা বাঁধের উপর নির্মিত গৃহগুলি অত্যন্ত উঁচু এবং এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাঁধের উচ্চতা প্রায় দশ গজ ও এর প্রশস্ততা হবে এর [প্রায়] অর্ধেক। ইমরতাদি মোটামুটি এই বাঁধের উপরই নির্মিত। অধিকাংশ বাড়ির নিচ দিয়ে কাটাজুরি নদীর পানি প্রবাহিত হয় এবং সেই পানি স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ। নদীর অপর তীরে চার কি

১। ফা. পাঠ ঃ 'বারভাটি' (باربهاتی)। রিয়াজের বাংলা অনুবাদে (রিয়াজ-বা, ২৫৭ পৃঃ 'বরাভাটি' কিন্তু পাদটীকায় ৫৫৬ পৃঃ 'বড়ভাটি'। সেখানে বলা আছে ঃ "বড়ভাটি দুর্গ তৈরীর জন্য কয়েকজন রাজার নাম ও বিভিন্ন তারিখ উল্লেখ করা হয়। স্টার্লিং মনে করেন, রাজা অনঙ্গভীম দেব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই দুর্গ তৈরি করেছিলেন। পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগ, আলোক-স্তম্ভ, হাসপাতাল ও রাস্তা তৈরির জন্য দুর্গের পাথর ব্যবহার করেছে। তবে, দুর্গের পরিখা ও প্রবেশদ্বার এখনও বিদ্যমান। .... রাজা মুকুন্দদেব এখানে নয়টি অঙ্গনবিশিষ্ট একটি প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। .... মুসলমান গবর্নরেরা এই প্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং লালবাগে বাস করতে থাকেন। লালবাগ শহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত (বর্তমানে কমিশনারের বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হয়) উইলসনের **Early Annals of the English in Bengal,** ১ম খণ্ড, ৪ পৃঃ দ্রঃ।"

২। ফা. পাঠ ঃ 'পোশ্তাহ্' (پشته) **"A little hill, an embankments".**

পাঁচ ক্রোশ দূরত্বের একটি প্রশস্ত অথচ মনোরম সমতল ভূমি আছে এবং এর সংলগ্ন প্রকাণ্ড বৃক্ষাদিপূর্ণ, পরিচ্ছন্ন ও শ্যামল অরণ্য বিদ্যমান এবং সেই অরণ্যের প্রান্তদেশ থেকে শুরু হয়েছে আকাশ [সম] উঁচু পর্বতসমূহ।[৩] এই তিনটি বস্তু কাটাজুরি নদীর তীরে অবস্থিত ইমারত ও গৃহাদিতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে পড়ে।

সংক্ষেপে, যে ভূমিতে নগরের ইমারতাদি নির্মিত তা বর্ষার আগমনে দুই নদী দ্বারা অবরোধকৃত [হয়ে পড়ে]। যদি সেই বন্যার সময়ে শত্রুপক্ষ স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই স্থান অবরোধ করতে চায় তবে [অন্যান্য] সব স্থান থেকে কটকে শস্যাদি ও অন্যান্য দ্রব্যের আগমন অসম্ভব হয়ে পড়বে, অসম্ভব হয়ে পড়বে সেই সময়ে এই গভীর নদী ও অন্যান্য নদী অতিক্রম করে বাঙলায় পৌছান। কারণ, এগুলি বাঙলায় আসার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করবে।

নবাবের পবিত্র মনে[৪] বর্তমান অবস্থায় ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর চিত্র পরিষ্কাররূপে প্রতিফলিত হলে এখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করা তাঁর কাছে সুবিধাজনক বিবেচিত হয়নি[৫] এবং এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তাকেই লাভজনক বলে তিনি মনে করেন। জনৈক শেখ আবদুস্ সোবহানকে নবাব কটকের নায়েব সুবাদার হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর ইচ্ছার বল্গাকে বাঙলার দিকে ধাবিত করেন।[৬] তাঁর দীপ্তিময় চিত্তে যে সব ঘটনা, সাবধানতা ও সতর্কতা প্রতিফলিত হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঘটেছিল।[৭] কারণ, সেই সময়ে সূর্য যখন মিথুন রাশিতে হিন্দুস্তানের পঞ্জিকার হিসাব মতে চৈত্র মাসের সঙ্গে কয়েক দিনের পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। সেই সময়ে এমন অবিরাম বৃষ্টিপাত হয় যে, রাত ও দিন অবিশ্রান্ত বারিপাতের হাত থেকে রেহাই পায়নি। [ফলে] অভিযানে [আগমনের] সময়ে যে সব নদীতে পানি অতি নিম্নস্তরে ছিল [প্রত্যাবর্তনের সময়] তা এত উঁচু স্তরে

৩। মূল ফারসি 'জবাল-ই-ফলাক আ-সা' (جبال فلک آسا) পাঠের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন (৯২ পৃঃ) **'heaven like'** অর্থাৎ আকাস সম এবং স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৩৯ পৃঃ) **'heaven touching'** এবং তাঁর মতে ফা. পাঠ **'daman-i-jabal'**। ফা. আ-সা' শব্দের অর্থ সম, চুম্বী নয়।

৪। মূল ফারসি 'বর যমির-ই-সফা-ই-তখমির' (برضمیر صبفاتخمیر) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৩৯ পৃঃ), **'Sagacious mind'**। এর আক্ষরিক অনুবাদ **'heart leavened with piety' A. S. (P. 92)**। সাধারণ অর্থে পবিত্র মন।

৫। মূল ফারসি 'দূর আয্ আইন-ই-সওয়াব' (دوراز ائین صواب) পাঠের আক্ষরিক অর্থ, **'far from the rules of expedience' A. S. (Page 92)** স্যার যদুনাথ ঃ **'did not deem it wise'** (১৩৯ পৃঃ)।

৬। মূল ফারসি পাঠ ঃ 'ই'নান-ই-আ'যিমত ব-সামতে বঙ্গালাহ্ মুনআ'তিফ্ সাখ্ত্' (عنان عضیمت بسمت بنگاله منعطف ساخت) **'turned the reins of his intentions towards Bengal.'**।

৭। মূল ফারসি 'ওয়া দর হকিকত মোরাতব-ই-তিকয্ ওয়া ইনতিবাহি কেহ্ বর লুউহ্-ই-যমির আনোয়ার তাফ্তাহ্ বুদ বর সবিল আতম ব-আরসাহ্-ই-যহুর জলুগার শুদ' (و در حقیقت مراتب تیقظ و انتباهی که برلوح ضمیر انور تافته بود بر سبیل اتم بعرصهٔ ظهور جلوگر شد) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৩৯ পৃঃ) "In fact, the hardships and ruin that he had foreseen took place in an extreme form." এই ভাবানুবাদে অনেক শব্দের অর্থ বাদ দেওয়া হয়েছে। এ. এস.-এর পাঠ (৯২ পৃঃ) অধিক গ্রহণযোগ্য।

উঠে যে, নদী অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ [বলা যেতে পারে যে,] বারোয়া, ভদ্রক ও জাজপুরের[৮] নদীগুলি প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল এবং নদীগুলির পানি কোমর ও বুক পর্যন্ত উঠলে অতিকষ্টে সেগুলি অতিক্রম করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নদীতে [প্রবল স্রোতের টানে] বহু মানুষ ও পশু প্রাণ হারিয়েছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মেদিনীপুরের নিকটে অবস্থিত ত্রিমোহিনী খালের[৯] [কথা উল্লেখ করা যেতে পারে]। এই খালের প্রশস্ততা অধিক না হলেও প্রচণ্ড জলস্রোতের কারণে তা অতিক্রম করার জন্য কোনো নৌকা পাওয়া যায়নি এবং অধিকাংশ রসদ ও সরঞ্জামাদিসহ মানুষ উল্টান কলসি, বাতাস ভর্তি মোশক[১০] ও এক সঙ্গে আবদ্ধ (বাঁধা) কলা গাছের (কলা গাছ দিয়ে তৈরী মান্দাস বা ভেলা) সাহায্যে নদী অতিক্রম করে। এই উপায়ে ঘোড়ার পক্ষে নদী অতিক্রম করা কঠিন ছিল এবং সাঁতার কেটে ঘোড়াগুলিকে নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। ফলে শত শত ঘোড়া বিনষ্ট হয়। একটি খেয়া তরীতে সতেরটি ঘোড়া ডুবে যাওয়ার দৃশ্য গ্রন্থকারের[১১] দৃষ্টিতে পড়ে। এই দৃষ্টান্ত থেকেই অন্যান্য খেয়াতরীর অবস্থা অনুধাবন করা যেতে পারে।

মেদিনীপুরের নিকট দিয়ে প্রবাহিত কানসাই নদী [তখন] প্রচণ্ডবেগে বহমান ছিল এবং অতিকষ্টে তা অতিক্রম করা হয়েছিল। কারণ, তিন কি চারটির অধিক নৌকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি এবং এগুলির সাহায্যেই সমুদয় শিবিরের সরঞ্জামাদি পার করা হয়েছিল। যাহোক, কর্দমাক্ত পথ ও প্লাবিত নদী অতিক্রম করতে গিয়ে [নবাবকে] যে যন্ত্রণা ও দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

৮। এগুলির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।
৯। ফা. পাঠ : 'নালাহ্-ই-তির মোহানী' (نالۂ ترمهانی) **'the canal of Trimohani'**।
১০। পানি বহনের জন্য চামড়ার তৈরি আধার (مشک)।
১১। ফ. পাঠ, 'রাকিম' (راقم) গ্রন্থকার।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অন্যান্য ঘটনা-শেখ আবদুস সোবহান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

এখন শেখ আবদুস সোবহান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল। তিনি রাজা দুর্লভ রায়ের বাহিনীতে স্থানীয়দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১] কিন্তু কেউ তাঁর নাম ও পরিচিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না। নবাব তাৎক্ষণিকভাবে কটক পরিত্যাগ করে চলে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কেউ কটকের নায়েব-সুবাদারের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয় নি। কারণ, ইতোমধ্যে মারাঠারা সাত কি আট হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে আশেপাশেই ছিল এবং বাঙলা থেকে অতিরিক্ত [মারাঠা] সৈন্যও আসতেছিল। নবাবের প্রস্তাব শুনে আবদুস্ সোবহান এটিকে মহা সাফল্য বলে মনে করেন এবং এ ধরনের প্রস্তাবের কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। 'রাজত্ব এক মুহূর্তের হলেও অমূল্য বস্তু'[২] এই বাক্য অনুসরণ করে আবদুস্ সোবহান এই পদ গ্রহণ করেন।

নবাবের বাহিনী কটকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর মীর হাবিব কটক নগর অধিকার ও আবদুস্ সোবহানকে বন্দী করার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হন। তিনি [এতদিন] তাঁর মারাঠা বাহিনীসহ কটক থেকে এক কি দুই মঞ্জিল দূরে জঙ্গলের মধ্যে ছিলেন। এত বড় শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও শেখ আবদুস সোবহান তাঁর অধীনস্থ সীমিতসংখ্যক সৈন্য নিয়ে সাহসিকতা ও বিক্রমের সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে রণক্ষেত্রে তিনি তাঁর পক্ষে করণীয় কিছুই বাকি রাখেননি। অবশেষে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে তাঁর এক হাত অকেজো হয়ে যাওয়ার পর তিনি শত্রু হস্তে বন্দী হন। নবাবের নিকট এই দুঃসংবাদ বালেশ্বরে পৌঁছে। প্রতিশোধ গ্রহণের সময় তখন ছিল না বলে তা পরবর্তী বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়।[৩]

১। ফা. পাঠ; 'আয্ জুমলা-ই-মফলুকীন ইনসল্দাত দাশ্ত্' (از جملهٔ مفلوکین اسلاك داشت)। আরবি 'মফলুক' (مفلوك) শব্দের আভিধানিক অর্থ, **'unfortunate; poor, indigent.'**। **Indigent** অর্থ অবলম্বন করে এ. এস. তাঁকে স্থানীয় **'in Raja Durlabh Ram's Contingent, enlisted among the natives'**) বলেছেন (৯৩ পৃঃ) এবং স্যার য. না. (১৪০ পৃঃ) প্রথম অর্থ প্রয়োগে **'a poor soldier'** বলেছেন।

২। ফা. পাঠ, 'সলতানাত গর হমাহ্ ইক লিহ্যা বুয়াদ মুগতনম আস্ত্' (سلطنت گر همه یک لهظه بود مغتنم است)= 'Soverignty even for a moment is a priviledge.' A. S. (৯২ পৃঃ)। স্যার যদুনাথ (১৪০ পৃঃ) ঃ "If I can be a king for even a twinkle, it is a gain." এ পাঠ কষ্ট কল্পিত।

৩। আলিবর্দী সব জেনে শুনেও শেখ আবদুস সোবহানকে তোপের মুখে অসহায় অবস্থায় রেখে এসেছিলেন। বর্ষাকাল সমাগত দেখে আলিবর্দী মারাঠাদের ভয়ে বাঙলায় চলে এসেছিলেন অথচ হতভাগ্য আবদুস সোবহানকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জামও দিয়ে আসেননি এবং তাঁকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছিলেন দেখে মনে হয় নিজের স্বার্থের জন্য নবাব সব কিছু করতে পারতেন।

সংক্ষেপে, এই ঝামেলাপূর্ণ ভ্রমণ শেষে জমাদি-উস-সানি মাসের শেষ দিকে[৪] নবাব কাটোয়া পৌঁছেন এবং নৌকা দ্বারা নির্মিত সেতুর সাহায্যে নদী অতিক্রম করেন। বিজয়ী বাহিনী সেখানে পৌঁছার পূর্বেই এই সেতু নির্মিত হয়েছিল। সেই বছরের রজব মাসের প্রথম দিকে নবাব মতিঝিল প্রাসাদে অবতরণ করেন এবং এই প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সেই সময়েই আরম্ভ হয়েছিল। শাহামত জঙ; হোসেন কুলী খান প্রমুখ নবাবের নিকট এসে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁরা সবাই তাঁদের পদমর্যাদা অনুসারে নবাবের নিকট থেকে পারিতোষিক লাভ করেন।

এই বছর খালিসা সম্পত্তির দিওয়ান রায় রায়ান চিনরায়[৫] মৃত্যু মুখে পতিত হন। তিনি অতিশয় সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁর পেশকার বীরু দত্ত এ কাজে অভিজ্ঞ ছিলেন বলে চিনরায়ের মৃত্যুর পর বীরু দত্তকে খালিসা সম্পত্তির দিওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে রায় রায়ান উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। হায়দর আলী খান তাঁর [অধীনস্থ] সমুদয় আমলা নিয়ে বর্ধমান থেকে মুর্শিদাবাদে আগেই চলে এসেছিলেন এবং এ সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে চক্ষু রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। সিরাজ-উদ-দৌলার কারণে গোলন্দাজ বাহিনীর [উচ্ছৃঙ্খল] লোকগুলি ক্ষমা লাভ করে। তাঁকে গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক করা হয় এবং আতাউল্লাহ খানের বহুদিনের সঙ্গী জিয়া উল্লাহ খানকে তাঁর সহকারী হিসাবে এবং 'দন্তী' তোপখানার দারোগা হিসাবেও নিয়োগ করা হয়।

নবাব সওলত জঙের সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু এই সময়ে খাদেম হোসেন খান মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। কিছুদিন পরে মেহ্‌দী নিসার খান,[৬] হেদায়েত আলী খানের পুত্রগণ ও মর্তুজা খানের পুত্র গোলাম মর্তুজা খান নবাব সওলত জঙের সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর খুল্লতাতের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং এই সব লোক তাঁর পিতার বন্ধু ছিলেন বলে সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁদের মন জয় করার চেষ্টা করেন এবং তাঁদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন। তিনি মেহ্‌দী নিসার খানকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন এবং দিন দিনই তাঁর পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৪। ৫ই জুন, ১৭৪৯ খ্রিঃ।

৫। রায় রায়ান চিন রায় ছিলেন রায়রায়ান দিওয়ান আলম চাঁদের পেশকার। তিনি কর্মদক্ষতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং এসব গুণের জন্য দরবারে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করত। তাঁর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। মেহ্‌দী নিসার খান যে সিয়ার রচয়িতা গোলাম হোসেন খানের আপন চাচা ছিলেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। মূল ফা. পাঠ ঃ 'ওয়া পাস আয্ চন্দি মেহ্‌দী নিসার খান ওয়া পেসেরান-ই-হেদায়েত আলী খান ওয়া গোলাম মর্তুযা খান পেসের-ই-মরতুযা খান ব-কদুওরাত আফ্ পেশ-ই-সওলত জঙ্গ বরখাস্তাহ্ ওয়ারদ-ই-মুর্শিদাবাদ শুদান্দ' (وپس از چندی مهدی نثار خان و پسران هدایت علیخان و غلام مرتضی خانسر مرتضی خان بکدورت از پیش صولت جنگ بر خاسته وارد مرشد ابد شدند) পাঠের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন ঃ **"and after some time, Mahdi Nithar Khan's sons, Ghulam Martuda Khan, son of Martudawi Khan, left Saulatjang in discontent and came to Murshidabad."** । এই পাঠে ভুল আছে। মেহ্‌দী নিসার খানের পুত্রগণ নয়, তিনি নিজেই এসেছিলেন এবং আরও এসেছিলেন হেদায়েত আলী খানের পুত্রগণ। স্যার যদুনাথ-এর অনুবাদ (১৪১ পৃঃ) সঠিক।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আলিবর্দীর পুনরায় মেদিনীপুর গমন ও শিবির স্থাপন, মেহদী নিসার খানের প্ররোচনায় সিরাজের মুর্শিদাবাদ ও আজিমাবাদ গমন ও আজিমাবাদ অধিকারের প্রচেষ্টা

একদল মারাঠা ও আফগান সৈন্য নিয়ে মীর হাবিব মেদিনীপুরে অবস্থানরত ছিলেন বিধায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে [সেখান থেকে] বহিষ্কার করা নবাব কর্তব্য বলে মনে করেন। মহররম মাসের শেষে[১] তিনি বিজয়ী বাহিনীর পতাকা উত্তোলন করে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি শিকারে বের হন। রইস অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিকার করাকে বিভিন্ন কারণে সুফল প্রদায়ক ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হত এবং সুফলগুলি ছিল রাজ্যের ধনী ও দরিদ্র, দুর্দশাগ্রস্ত ও অত্যাচারিত এবং দুর্বল ও [বলশালী] প্রজাদের [অবস্থা] সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ও জ্ঞান লাভ করা।[২]

কবিতা

বাদশাহ্‌দের শিকারের পরিশ্রমে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য,
কারণ শিকারের সঙ্গে অনেক হৃদয় জয় করা যায়।

নবাব মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মেহেরপুরের[৩] দিকে অগ্রসর হন এবং প্রকৃতপক্ষে সেখানে হরিণের প্রাচুর্য এত বেশি ছিল যে, প্রতিদিন শত শত হরিণ শিকারে ধরা পড়ে। সংখ্যার প্রাচুর্য হেতু সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে দলে দলে হরিণ বিভ্রান্ত হয়ে ছাউনির কাছে আসলে মানুষ হাতের লাঠি দ্বারা এগুলিকে মারতে থাকে।

১। ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে।

২। কবিতা (شعر)

(شهان را ضرور است مشق شکار — که آید بی صید دلها بکار)

(শাহানরা যরুর আস্‌ত্ মুশক-ই-শিকার) (কেহ্ আয়াদ বে সৈয়দ দিলহা বকার)

স্যার যদুনাথের (য. না. ১৪১ পৃঃ) অনুবাদ ঃ

"The hardship of hunting is necessary for kings
Because they capture hearts along with their game."

তিনি আরবি 'মুশ্‌ক্' (شعر) শব্দের অনুবাদ দিয়েছেন '**hardship**'। এই অর্থ কিছুটা কষ্টকল্পিত এবং এই শব্দের প্রকৃত অর্থ 'exercise or practice'।

৩। মেহেরপুরের সঠিক অবস্থানের কথা এখানে বলা না হলেও এ স্থান যে মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ পুবেই এবং সেখান থেকে খুব দূরে ছিল না তা উল্লিখিত বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। বর্তমান মেহেরপুর জেলা শহরে নিকটবর্তী আমদহ, বল্লভপুর প্রভৃতি স্থানসমূহ এখনও মোটামুটিভাবে জঙ্গলাকীর্ণ ও বসতিহীন। প্রায় আড়াইশ বছর আগে এ স্থানে যে গভীর জঙ্গল ছিল তা ধারণা করা যায় বর্তমান অবস্থা দেখেই। সে সময়ে এখানে অসংখ্য হরিণ থাকা খুবই সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয়। গ্রন্থকার খুব সম্ভব বর্তমান মেহেরপুরের কথাই বলেছেন।

সংক্ষেপে, শিকার শেষ করার পর নবাব গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করে কাটোয়া এসে উপস্থিত হন। বিজয়ী বাহিনীর সৈন্যগণ একত্র হলে নবাব বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করে সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করে মেদিনীপুরে এসে উপস্থিত হন। শত্রুপক্ষ তাঁর আগমনবার্তা পেয়ে তাঁর বিজয়ী বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে নিজেদেরকে শক্তিহীন মনে করে সঙ্গে সঙ্গে বরাবরের মতো দুর্ভাগ্যের মরুভূমিতে পালিয়ে যায়। মেদিনীপুরে আগমনের পরে বিজয়ী বাহিনী কানসাই নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে। নবাব এইবার এখানে এমনভাবে শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যে, ভবিষ্যতে শত্রুর মনে এ স্থান অধিকারের চিন্তাও যেন না আসতে পারে এবং ভবিষ্যতে এখানে আসার ধৃষ্টতাও যেন তাদের না হয়। এই [সিদ্ধান্ত] অনুসারে তিনি এখানে শিবির স্থাপনের আদেশ দেন এবং এখানে তিনি নিজে অবস্থান করবেন বলে স্থির করেন। তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার বখশি আলী কুলি খান সাফাহানীর উপর মেদিনীপুর ফৌজদারির দায়িত্ব অর্পণ করেন।[৪]

মীর হাবিব ও অন্যান্যরা বালেশ্বরের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং তাঁদের শক্তি এমন ছিল না যে, তাদের বিরুদ্ধে নবাবের নিজের যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি সিরাজ-উদ-দৌলাকে একটি সৈন্য দল দিয়ে [তাদের বিরুদ্ধে] প্রেরণ করেন। সিরাজ-উদ-দৌলা জলেশ্বর[৫] নামক স্থান ও রাজঘাট নামে অধিক পরিচিত সুবর্ণরেখা নদীর ঘাটে[৬] উপস্থিত হন। প্রতিরোধ করা সমীচীন মনে না করে শত্রুপক্ষ বালেশ্বর বন্দর থেকে অরণ্যাঞ্চলে পালিয়ে যায়। সিরাজ-উদ-দৌলা তরবারি বা বর্শা ব্যবহার না করেই বালেশ্বরে প্রবেশ করেন। আর অধিক অগ্রসর হওয়ার আদেশ তাঁর উপর ছিল না বলে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন।

সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি নবাবের স্নেহ এত অধিক ছিল যে, তাঁকে না দেখে এক মুহূর্ত থাকাও তাঁর পক্ষে বেদনাদায়ক ও অস্বস্তিকর ছিল বলে তাঁকে বিদায় দিবার দিন কয়েক পরেই নবাব নিজেকে সংযত রাখতে অপারগ হয়ে মেদিনীপুর থেকে বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন। নারায়ণগড়ে উভয়পক্ষের সাক্ষাৎ ঘটে এবং সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর মাতামহের খেদমতে নিজেকে হাজির করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে উভয়ে মেদিনীপুরে শিবির স্থাপন করেন।

৪। সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৮৭ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ এবং আরও বিশদ বর্ণনা আছে।

৫। মূল ফা. পাঠ ঃ 'জালিস্বর' (جاليسر) অর্থাৎ জলেশ্বর। স্যার যদুনাথ (১৪২ পৃঃ); 'বালেসর' (Balesar)। এই পাঠ ভুল।

৬। মূল ফা. পাঠ ঃ 'সু অর্ণ রেখা' (سورن ريكها) অর্থাৎ সুবর্ণ রেখা। স্যার যদুনাথ (১৪২ পৃঃ) 'সন-রেখা' (**'Son-rekha'**)। এই বাক্যের 'মু'বর' (معبر) শব্দের অর্থ এ. এস. (৯৬ পৃঃ) দিয়েছেন, 'the meeting point of the river'। প্রকৃতপক্ষে معبر শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ 'A pass, ferry, ford'. অর্থাৎ খেয়া বা ফেরিঘাট।

এই সময়ে খাজা আবদুল হাদি নামক নবাবের একজন নিম্নপদস্থ জমা'দার[৭] নবাবের নায়েব হাজীব[৮] মীর সৈয়দ মোহাম্মদ বসাউলের মাধ্যমে অভিযোগ করেন ঃ "হুজুরের সেনাবাহিনীতে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা সব সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং মুৎসুদ্দি ও জমা'দারদের নিকট অন্যায়ভাবে অধিকৃত অর্থের পরিমাণ অতিশয় বেশি। যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা তালিকাতে একশ আছে সেখানে এক চতুর্থাংশও উপস্থিত পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গক্রমে এই নিকৃষ্ট ব্যক্তিই তার নিজের বাহিনীতে যে প্রবঞ্চনা চলছে তাই বলবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধীনকে যদি একবার সৈন্যদের উপস্থিতি পরীক্ষা করার আদেশ প্রদান করা হয় তবে হুজুরের লক্ষ লক্ষ টাকা বেঁচে যাবে।[৯]

খাজা আবদুল হাদির প্রার্থনা অনুসারে নবাব শুল্ক দফতরের বখশি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন খাজা আবদুল হাদির নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের [অধীনস্থ] সৈন্যদের হাজিরা দেন। তাতে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাঁর কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে খাজা আবদুল হাদি ইতর ও ভদ্র, আপন ও পর সকলের ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন। তাতে [এই ফল দেখা যায় যে,] একজন উঁচুমানের কর্মকর্তা যিনি এক হাজার সাতশ' অশ্বারোহী সৈন্যের বেতন নিতেন, সেখানে পরিদর্শনের সময় মাত্র আটজন লোকের উপস্থিতি পাওয়া গেল। এই দৃষ্টান্ত থেকেই সমুদয় সেনাবাহিনীর অবস্থা অনুধাবন করা যেতে পারে এবং যেখানে হাজারের স্থলে মাত্র শ-এর উপস্থিতি পাওয়া গেল সেখানে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা বেঁচে গেল। তাঁর অনুপম কার্যের জন্য খাজা আবদুল হাদিকে অশেষ পারিতোষিক প্রদান কর হয় এবং দিন দিন তাঁর পদোন্নতি হতে থাকে।

এই সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল যে, মারাঠা সৈন্যরা অরণ্যাঞ্চল থেকে নির্গত হয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেছে। নবাবের উদ্দেশ্য, তাঁদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা কিন্তু এই ব্যাপারে মুর্শিদাবাদে রক্ষিত সেনাবাহিনীর উপর তিনি খুব ভরসা করতে পারেননি। তাই তিনি মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। কয়েক মঞ্জিল

৭। মূল ফারসি 'কেহ্ দর ফিরকাহ্-ই-জমা'দরান-ই-কম ব-যা'আতে-ই-মোলাযম-ই-সরকার বুদ' (که در فرکه جمعداران کم بضاعت ملازم سرکار بود) পাঠের অনুবাদ এ.এস. (৯৬ পৃঃ) দিয়েছেন, "the Nawab's employee attached to the famadars"। এ পাঠ ত্রুটিপূর্ণ। যদুনাথ এর পাঠ (১৪২ পৃঃ), "one of the humbler Jama'dars of the Nawab" অধিক অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য।

৮। ফা. পাঠ, 'নায়েব হাজীব' (نایب حاجب) 'the Deputy Chamberlain'।

৯। এ সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৮৮-৯০ পৃঃ) বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

অতিক্রম করার পর বিজয়ী বাহিনীর আগমনের ছায়া বর্ধমানে পতিত হলে নবাব সংবাদ পান যে, তাঁর বাহিনীর আগমন বার্তা পেয়ে মারাঠা ও আফগান বাহিনী মুর্শিদাবাদ[১০] থেকে তাদের পলায়নের লাগাম পশ্চিমের বনাঞ্চলের দিকে ধাবিত করেছে। ফখর-উদ-দীন হোসেন খান নবাবের আদেশে তখন মুর্শিদাবাদে [অন্তরীণ অবস্থায়] বসবাসরত ছিলেন। তাঁর রক্ষীদের অবহেলা দেখে[১১] তিনি মারাঠাদের মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে আগমনের সময় তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং তাঁর জীবনের সমাপ্তি এই ভাবে ঘটে। সারা জীবন ধরে তিনি আরাম-আয়েশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। জীবনে তিনি কোনদিন কোনো কষ্ট বা অসুবিধার মুখ দেখেননি। [মারাঠাদের সঙ্গে] তাঁর এই অভিযানে [একমাত্র] অশ্ব ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বাহন (গাড়ি বা পালকি জাতীয় কিছু) ছিলনা। মারাঠাদের সঙ্গে অভিযানের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। সেখানে পৌছার কিছুদিন পরেই বিকারগ্রস্ত অবস্থায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

সংক্ষেপে, এ সময়ে বনাঞ্চলের জমিদারদের একজন আত্মীয় নবাবের কাছে এসে নিবেদন করেন, "হুজুরের অগ্রগামী বাহিনীর [পথ প্রদর্শনের] দায়িত্ব যদি এই অধমের উপর অর্পিত হয় তবে অতি শীঘ্রই শত্রু বাহিনীর পশ্চাদ্দেশে আক্রমণ করতে সমর্থ হন।"[১২]

১০। মূল ফা. পাঠ ঃ 'ই'নান-ই-ফিরাব ব-সমতে জঙ্গলিস্তান-ই-গরবি ইন-য়ি'তাফ দাদান্দ' (عنان فرار بسمت جنگلستان غربی انعطاف دادند) এর ভাবানুবাদ স্যার যদুনাথ (১৪২-৪৩ পৃঃ) দিয়েছেন, "When he reached Burdwan, he learnt that the Maratha-Afghan army on hearing of the march of the Nawab, had turned aside from Murshidabad towards the western jungle Country." প্রকৃতপক্ষে এই অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার অনুবাদ এ. এস. যা দিয়েছেন 'had turned their reins of flight towards the western forest' তা-ই-সঠিক।

১১। মূল ফা. পাঠ, 'মহাফীযানরা গাফিল নমুদাহ' (محافظانرا اغافل نموده)-এর অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১৪৩ পৃঃ) দিয়েছেন, 'neglected the defence of the city' এবং এ. এস. (৯৮ পৃঃ) দিয়েছেন, 'neglected the defence forces'। এই উভয় অনুবাদই ত্রুটিপূর্ণ এবং এস. পাঠের সঙ্গে সম্পর্কহীন। প্রকৃত পাঠ হবে seeing the negligence of the guards।

এই সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃঃ) আছে, "......either by the neglect or connivance of his guards found means to effect his escape."।

কী করুণ অবস্থায় পতিত হয়ে ফখর-উদ্-দীন হোসেন খান মারাঠাদের সঙ্গে পলায়ন করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। আলিবর্দী নিজের স্বার্থে তাঁকে গৃহবন্দী করে রেখে তাঁর সমুদয় স্বাধীনতা হরণ করেছেলিন।

১২। সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খন্ড, ৯০-৯১ পৃঃ) এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং সেই পথ প্রদর্শক একজন জমিদার ছিলেন বলে বলা হয়েছে।

তাঁর কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে নবাব দ্রুতগতিতে তাঁদের পিছনে ধাওয়া করেন। রাত্রিতে অশ্বারোহণে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দুই কি তিন মঞ্জিল অতিক্রম করার পরে প্রভাতকালে নবাব জানতে পারেন যে, হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট সেই পথ প্রদর্শক ছোরা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করেছেন। ঘটনার তদন্তের জন্য তাঁকে হস্তীপৃষ্ঠে নবাবের নিকট আনয়ন করা হলে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমি ভুল পথে চলছিলাম এবং তাতে করে শত্রুর নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না। হুজুরের ক্রোধের ভয়ে আমি এ কাজ করেছি।"

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই ব্যক্তির কথার উপর নির্ভর করে নবাব কয়েক মঞ্জিলের পথকষ্ট সহ্য করেছিলেন এবং সরকারি পথ প্রদর্শকদের কাছে শত্রুপক্ষের গতিবিধির সঠিক সংবাদ জানা ছিল না। এসব কারণে প্রত্যাগমন করা যুক্তিসহ বিবেচনা করে নবাব বর্ধমানে ফিরে আসেন এবং নগরের সর্বোত্তম স্থান মানিক চাঁদের বাগানে এসে অবতরণ করেন। মানিক চাঁদ ছিলেন বর্ধমানের জমিদারের প্রভাবশালী দিওয়ান। মারাঠাদের গতিবিধি সম্বন্ধে নবাব এখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করেন।

ইতোমধ্যে মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদ থেকে এসে সেই বাগানে নবাবের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি [এতদিন] নবাব শাহামত জঙের কর্তব্য পালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। মারাঠাদের মুর্শিদাবাদে অভিযানকালে মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান [তাদের বিরুদ্ধে] কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি। তদুপরি খাজা আবদুল হাদির সরেজমিনে পরিদর্শনকালে তাঁর সেনাদলে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এসব কারণে ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নবাব তাঁর প্রতি কিছু উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করেন এবং তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে আদেশ প্রদান করেন যে, মীর ইসমাইলের[১৩] পরিবর্তে খাজা আবদুল হাদীকে নায়েব বখশীর পদে নিযুক্ত করতে হবে। মীর জা'ফর প্রথমে তাতে আপত্তি করেন। কিন্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক[১৪] শেষ পর্যন্ত নবাবের ইচ্ছা অনুসারে সেই খাজাকে নিয়ুক্তিপত্র দেন। বর্ধমানে অবস্থান করার পর সংবাদ পাওয়া গেল যে, মারাঠারা বনের পথ ধরে মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর

১৩। মীর ইসমাইল ছিলেন মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানের চাচাত ভাই। তাঁর সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে।

১৪। আরবি বচন : 'শা-আ আম্ আবা' (شَاءَ أَم أَبَى) 'willynilly'। স্যার য. না. (১৪৩ পৃঃ) : "J'afar Kh. at first objected, but as last acted as ordered by the Nawab."

হচ্ছে। নবাব মারাঠাদের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন বলে কালবিলম্ব না করে[১৫] মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হন এবং সিরাজ-উদ-দৌলা মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন।

সিরাজ-উদ-দৌলার এই ইচ্ছার কারণ ছিল নিম্নরূপ। সওলত জঙের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে মেহদী নিসার খান ও অন্যান্য [আমির] মুর্শিদাবাদে ফিরে আসলে তাঁরা সবাই সিরাজ-উদ-দৌলার বন্ধু হয়ে পড়েন। মেহদী নিসার খান অনেক সদগুণের অধিকারী হলেও গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা তাঁর প্রকৃতির মধ্যেই ছিল।[১৬] সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "এখানে আপনি [আর] কতদিন আপনার মাতামহের হুকুমের তাবেদার হয়ে থাকবেন! আপনার চাচা শাহাম্মত জঙ ও সওলত জঙ ক্ষমতাশালী লোক ও সেনাদলের সেনাপতি। আপনার মর্যাদা তাঁদের চেয়ে খাট নয়। মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন ও সেখান থেকে আজিমাবাদে চলে যাওয়াই আপনার পক্ষে অধিক সুবিধাজনক হবে। আজিমাবাদের শাসনকর্তা জানকীরাম একজন সাধারণ হিন্দু কর্মচারীর বেশি কিছুই নন। তাঁর [আচরণের] মধ্যে যদি সহযোগিতা ও আনুগত্যের অভাব দেখা দেয় তবে তাঁকে অপসারিত করে আপনি নিজে আজিমাবাদের শাসনভার গ্রহণ করে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করুন।"[১৭]

নবাব মেদিনীপুরের নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত হলে তাঁর সম্মুখীন হওয়ার সামর্থ্য তাঁদের মধ্যে না থাকার কারণে তাঁদের স্বাভাবিক ও গতানুগতিক অভ্যাস অনুসারে মীর হাবিব ও অন্যান্যরা পলায়ন করেন। নবাব তাঁর পুরাতন ছাউনির স্থানেই অবতরণ

১৫। স্যার যদুনাথ (১৪৩ পৃঃ) ঃ "Alivardi at once began his march to Medinipur" তিনি মূল ফা. পাঠের আগের অংশের অনুবাদ দেন নি।

১৬। মূল ফারসি, 'লেকিন শওরিশ ওয়া হঙ্গামী আরায়ি দর মেযাজ দাশ্‌ত্' (لیکین شورش و هنگامی آرای در مزاج داشت) পাঠের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন (৯৯), "was a man of turbulent temperament."। এই পাঠ ত্রুটিপূর্ণ। ফা. (شورش) (শোরিশ) শব্দের অর্থ, 'confusion, mixture, tumult, rebellion, insurrection etc', এবং 'turbulent nature' নয়। ফা. (هنگامه آرای) শব্দের অর্থ গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী, স্যার যদুনাথ-এর পাঠ (১৪৪ পৃঃ), "has a passion for causing disturbance and trouble" মূল ভাবের প্রকাশক হলেও কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ।

১৭। এই সম্বন্ধে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ৯২-৯৩ পৃঃ) বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সেখানে গ্রন্থকার গোলাম হোসেন তাঁর আপন চাচা মেহ্‌দী নিসার খানের কার্যাবলীকে সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন ও বীরত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। এ সম্বন্ধে করম আলী খান (য. না. ৪৭ পৃঃ) বলেন, "Siraj-ud-daula who had taken to drink, through the influence of Mahdi Nisar Khan, in a short time ruined himself. Alivardi, on hearing of this disgraceful affair forbade Mahdi Nisar Khan to visit Siraj. But Siraj-ud-Daula in the pride of youth and folly of childishness, taking Mahdi Nisar with himself left the Camp of Alivardi without permission and took the road to Patna."

করেন। বর্ষাকাল আগত প্রায় দেখে এবং এবারেই এই লোকদের (মারাঠাদের) সব উপদ্রব এই ভূমি থেকে চিরতরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং [সেই সঙ্গে] তাঁর সঙ্গতির অভাবে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অসামর্থ্য হেতু আলী কুলী বেগের মেদিনীপুরের ফৌজদারি থেকে অব্যাহতি লাভের আকুল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নবাব তাঁর নিজের বসবাসের জন্য এখানে গৃহাদি নির্মাণের আদেশ প্রদান করেন। মুর্শিদাবাদ থেকে পরিবারের মহিলাদের এখানে আনিয়ে এ স্থানে সৈন্যদের নিয়মিত শিবির স্থাপনের জন্য তিনি আদেশ দেন। 'খাস' ও 'আম' (বিশেষ ও সাধারণ) সেনাদলের সব সদস্য এই প্রলম্বিত অভিযানের পর মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবে এই আশায় অস্থির হয়ে পড়েছিল এবং বর্ষাকালের আগমন হেতু বিশ্ব পালনকারীর এই আদেশ তাঁদের আশার বিপরীত হওয়ায় মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে তাঁরা নিরাশ হল [কিন্তু] আনন্দ ও আরামের চিন্তা পরিত্যাগ করে মহিমান্বিত ও সুবিখ্যাত, সাধারণ ও বিশেষ[১৮] সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি লোক নবাবের এই আদেশ পালনে দৃঢ় সংকল্প হল। তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাঁরা নিজেদের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করে সেখানে আরাম উপভোগ করে কিছুদিন এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পরে অদৃশ্যের আবরণ থেকে এমন একটা ঘটনা প্রকাশিত হল যা কোনো মানুষের কল্পনায়ও আসেনি।[১৯] সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

শাহামত জঙের পত্রাদি থেকে নবাব জানতে পারেন যে, ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে সিরাজ-উদ-দৌলা মেহদী নিসার খান ও অন্যান্যের সঙ্গে আজিমাবাদের পথে যাত্রা করেছেন। পত্রে শাহামত জঙ আরও লিখেন, "এই অধম ব্যক্তি এতে বাধা দানে ও বিভিন্ন উপায়ে এই কার্যের অমূলকতা সম্বন্ধে বোঝাতে যত চেষ্টাই করুক না কেন, তাতে তিনি (সিরাজ-উদ-দৌলা) নিরস্ত হননি এবং উত্তরে বলেছিলেন, 'আপনি যদি আমার এখানে অবস্থান করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন তবে আমি আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাব।'"[২০]

১৮। মূল ফা. পাঠের 'খাস ও আ'ম লশকর' (خاص و عام لشکر) শব্দগুলি এ. এস.-এর অনুবাদে (১০০ পৃঃ) নেই।

১৯। মূল ফারসি, 'ওয়া চুন্ আয়াম-ই-চন্দ্ বরইন্ গুজাশ্ত্ আমরে আয্ পরদাহ্-ই-গায়েব বযহুর রাসিদ কেহ্ নক্শ-ই-খিয়াল-ই-আন্ ব-খাতের আহদি নামিগাশ্ত্' (و چون ایامی چند برین گذشت امری از پردهٔ غیب بظهور رسید که نقش خیال آن بخاطر احدی نمی گشت) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৪৪ পৃঃ) "When some days had passed in this way, a most undreamt ofiting happened". এই ভাবানুবাদে মূল ফা. পাঠের সঙ্গে সঙ্গতি নেই। এ.এস.-এর পাঠ (১০০ পৃঃ) অধিক গ্রহণযোগ্য।

২০। এই অনুচ্ছেদের সমুদয় পাঠের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ দিয়েছেন স্যার যদুনাথ (১৪৪ পৃঃ) এবং তা নিম্নরূপ ঃ "The Nawab received a letter from Shahamat Jang stating that Sirajuddaulah after displaying hurt feelings and displeasure had started for Patna with Mahdi Nisar Khan and others and had turned a deaf ear to all the prohibitions and reasoning of Shahamat Jang and even threatened to commit suicide if he pressed him further".

সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি নবাবের সীমাহীন স্নেহ ও ভালবাসা ছিল। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র নবাব অস্থির ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং তাঁর পক্ষে মেদিনীপুরে অবস্থান করা অসম্ভব বলে তিনি মনে করেন। তিনি মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান ও রাজা দুর্লভ রামকে বিভিন্ন দাক্ষিণ্য[২১] ও পারিতোষিক প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন এবং সমগ্র সেনাবাহিনীর দায়িত্ব তাঁদের দু'জনের উপর অর্পণ করে তাঁদেরকে মেদিনীপুরে অবস্থান করতে আদেশ প্রদান করেন। কিছুসংখ্যক লোক সঙ্গে নিয়ে নবাব সেদিনই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। যদিও বর্ষাকাল ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত এবং নদীগুলি প্লাবিত হয়ে পড়েছে তবু মুর্শিদাবাদ না পৌঁছা পর্যন্ত সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি নবাব এগিয়েই চললেন এবং [মাত্র] চারদিনের মধ্যে তিনি আট মঞ্জিল অতিক্রম করেন। মুর্শিদাবাদে একদিনের বেশি অবস্থান অনুচিত মনে করে পরদিনই তিনি আজিমাবাদের পথে যাত্রা করেন এবং সহৃদয়তা ও অনুগ্রহ, স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ একখানা উপদেশমূলক পত্র সিরাজ-উদ-দৌলার কাছে প্রেরণ করে তাঁকে তাঁর মনের অন্যায় উদ্দেশ্য পরিহার করার জন্য অনুরোধ করেন।[২২] ভাগলপুরে অবস্থানকালে সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট এই পত্র পৌঁছে। উত্তরে তিনি লিখেন, "সহৃদয়তা ও অনুগ্রহ, স্নেহ ও ভালবাসার প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও আমার যাঁরা শত্রু হুজুর তাঁদেরকেই প্রতিপালন করে চলেছেন।[২৩] তাঁদের মধ্যে আছেন হোসেন কুলী খান[২৪] তাঁকে আপনি উঁচু পদে নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁর কাছে আমাকে এমনভাবে হেয় করেছেন যে, বর্ধমান থেকে

২১। স্যার যদুনাথ এর পাঠে (১৪৪ পৃঃ) আছে শুধু, **Some favours**।

২২। স্যার যদুনাথ এর পাঠ (১৪৫ পৃঃ) **"Sending a most loving letter to Sirajauddulah to give up his mischievous intention."** মূল ফা. পাঠের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন।

২৩। স্যার যদুনাথ এর পাঠ (১৪৫ পৃঃ) ত্রুটিপূর্ণ।

২৪। হোসেন কুলী খানের প্রতি সিরাজ-উদ-দৌলার প্রচণ্ড ক্রোধের কারণ কোনো সমসাময়িক গ্রন্থকার লিখে যাননি। তবে সিয়ারের ইংরেজি অনুবাদক ও টীকাকার এ সম্বন্ধে প্রচুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। আলিবর্দীর কন্যাদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে এই সমসাময়িক অনুবাদক যা লিখে গেছেন তা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। ঘসেটি বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলী খানের যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পরে সিরাজ জননী আমিনা বেগমের সঙ্গেও তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এ কারণেই সিরাজ হোসেন কুলী খানের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে তাঁকে হত্যা করেছিলেন কিনা, সেকথা কেউ লিখে যাননি। আলিবর্দীর কন্যাদের সম্বন্ধে সিয়ারের অনুবাদক ও টীকাকার মোস্তফা ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে যে মন্তব্য করে গেছেন (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১১৩ পৃঃ) তা নিম্নরূপ ঃ

"This princess (Rabiah-begum, daughter of Hadji Ahmad and consort to Ata-olla-qhan) was sister of Amina-begum (mother of Siraj-ed-daulah) and also of Gahasity-begum, consort to Nevojish-muhamed-qhan, nephew and son-in-law to Aly-vardi-qhan. Rabiah-begum was likewise mother to Banni-begum, deceased some years ago, all names celebrated in the amorous chronicles of Morshidabad for an infinity of curious adventures that need only a Chancer or a Lafontaine or a Bocacio. In general the three daughters of Aaly-vardy-qhan, as well as their female posterity, have been lewd to a proverb."

মুর্শিদাবাদে আমার প্রত্যাবর্তনকালে কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেনি। আপনি শাহামত জঙকে আপনার উত্তরাধিকারীর মর্যাদা দান করেছেন এবং সওলত জঙকে দিয়েছেন পুর্ণিয়ার ফৌজদারি। আমার বেলায় মৌখিক অনুগ্রহ প্রকাশ ছাড়া আপনি আমার প্রতি এমন কোনো অনুগ্রহ দেখান নি, যা আমার জন্য আপনার আমির-ওমারাদের মধ্যে সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব ও ক্ষমতার ভাব আনতে পারে। এখানে না আসার জন্য আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। নইলে আপনার মস্তক আমার বস্ত্রে[২৫] অথবা আমার মস্তক তাদের হস্তীর পদতলে পতিত হবে।"

নবাবের কাছে এই পত্র পৌছলে তিনি মহা আনন্দ ও তৃপ্তি প্রকাশ করেন এবং সিরাজ-উদ-দৌলার কাছে আর একটি পত্র লিখেন এবং তা নিম্নরূপ ঃ "আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, অস্পষ্ট ধারণা ও সাহসের স্বল্পতা হেতু তুমি এমন অশোভন ইচ্ছা ও অভিযোগ প্রকাশ করেছ। আমি এই ইচ্ছা পোষণ করি যে, সমগ্র বিশ্বের শাসনভার ও কর্তৃত্ব আমার এই চোখের আলোর অধিকারে আসুক।"

তিনি স্বহস্তে একটি কবিতা লিখেন ঃ[২৬]

যে বীর যোদ্ধা (গাজী) শাহাদতের জন্য সংগ্রাম করে, সে জানে না প্রেমের শহীদ তাঁর চেয়ে মহৎ।
কেয়ামতের দিন এ'জন অপরজনের সঙ্গে কেমনে রইবে? একজন (গাজী) শত্রুহস্তে নিহত ও অন্যজন বন্ধু দ্বারা।

২৫। মূল ফা. পাঠ ঃ 'সর-ই-শুমা দর দামন-ই-মান, (سر شما در دامن من) = your head in the skirt of mine'।

২৬। ফারসি কবিতা ঃ

غازی که پی شهادت اندر تگ و پوست — غافل که شهید عشق فاضل از وست
(গাযীকেহ্ পেয় শাহাদত আন্দর তগ ওয়া পুস্ত) — (গাফিল কেহ্ শহীদ-ই-ই'শক ফাযিল আয্ ওস্ত)

در روز قیامت این بآن کی ماند — این کشتهٔ دشمن است و آن کشتهٔ دوست
(দর রোয্-ই-কিয়ামত ইন্ ব আন্ ক্যায় মানাদ) — ইন কুশতাহ্-ই-দুশমনআস্ত ওয়া আন্ কুশতাহ্-ই দোস্ত)

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

জানকী রামের সঙ্গে সিরাজ-উদ-দৌলার যুদ্ধ, মেহদী নিসার খানের মৃত্যু, নবাবের আজিমাবাদে আগমন ও সিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নবাবের অসুস্থতা ও মুর্শিদাবাদে প্রস্থানের বর্ণনা[১]

আপাতত[২] নবাবের বর্ণনা স্থগিত রেখে লেখনির লাগামকে[৩] সিরাজ-উদ-দৌলার অবস্থা বর্ণনার জন্য ধাবিত করা হল।[৪] ঔদ্ধত্য ও বিভ্রান্তির উপত্যকায় ভ্রমণকারী [এই ব্যক্তি] আজিমাবাদের নিকটবর্তী এক স্থানে এসে জানকী রামকে এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন, "আপনি যদি নিজের কল্যাণ কামনা করেন তবে আপনি আমার সম্মুকে উপস্থিত হন যাতে আপনি অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। অন্যথায় আজিমাবাদ পরিত্যাগ করে আপনি যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন।"

এই বার্তা পাওয়ার পর বিভ্রান্তি ও ভীতির ধুয়া জানকীরামের মনের ইমারত পর্যন্ত উঠে পড়ল এবং এই মহাসঙ্কট পরিহার করার কী উপায় হতে পারে, সেই চিন্তায় কুত্রিব পাখির মতো অস্থির হয়ে পড়েন।[৫] তিনি যদি আজিমাবাদ পরিত্যাগ করে চলে যান [তবে] সিরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক এই নগর অধিকার করা বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহিতার শামিল হবে।[৬] [সেক্ষেত্রে] তিনি নবাবের নিকট কী কৈফিয়ৎ দিবেন! [আবার] তিনি যদি এর বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করেন তবে যুদ্ধ হতে পারে এবং সেই যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার যদি কোনো বিপদ ঘটে তবে সিরাজের প্রতি নবাবের যে [অপরিমেয়] স্নেহ-ভালবাসা আছে তাতে নিঃসন্দেহে জানকী রামকে হত্যা করা হবে।

১। এই পরিচ্ছেদ বিভাগ এ. এস. বা য.না-এর ইংরেজি অনুবাদে নেই, এ. এস. সম্পাদিত ফারসি পাঠে আছে এবং তাও বন্ধনীতে। তাতে মনে হয় মূল পাণ্ডুলিপিতে এই পরিচ্ছেদ বিভাগ ছিল না।

২। ফা. 'আকনুন' (اکنون) শব্দের অর্থ এখন অর্থাৎ আপাতত।

৩। ফারসি 'ই'নান-ই-কলম রা ব-তরকীম-ই-হালাত-ই-সিরাজ.....' (عنان قلم را بترقیم حالات سراز) 'The reins of the pen are turned towards....'।

৪। এই. বাক্য য. না-এর গ্রন্থে নেই (১৪৫ পৃঃ)।

৫। কুত্রব পাখির উপমা গ্রন্থকার এর আগেও কয়েকবার দিয়েছেন। স্যার যদুনাথ-এর অনুবাদে (১৪৫ পৃঃ) কুত্রব পাখির উল্লেখ নেই এবং তিনি মূল ফারসি পাঠের অনুবাদ না দিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

৬। মূল ফারসি, 'চেহ্ আগর আয্ আযিমাবাদ বরখাস্তা বরাওয়াদ সিরাজ-উদ-দৌলারা তসরুফ-ই-শহর মাইয়াহ্-ই-বগাউত ও তিগিয়ানি মি শওয়াদ, (چه اگر از عظیمآباد برخاسته برود سراز الدوله را تصرف شهر مایهٔ بغاوت و طغیانیمی شود) পাঠের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন (১০২ পৃঃ) "If the Nawab goes away leaving Patna, the occupation of the city by Siraju'd-Daulah would give rise to rebellion and tumult." এই পাঠ ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। এখানে 'নবাব' হবে না, হবে জানকীরাম। 'The occupation etc. would give rise to etc'.. নয়, প্রকৃত পাঠ হবে 'the occupation etc. would tentamount to etc.।

অবশেষে যুদ্ধ করার পক্ষেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দুর্গের দ্বারসমূহ বন্ধ করে ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, বিধাতার পাশা খেলার মঞ্চে জীবনের অস্তিত্ব কোন্ দিকে মোড় নিবে![৭] জানকী রামের ভাগ্য ও অদৃষ্ট পূর্ণ উন্নতির দিকে থাকার কারণে এই সমস্যার সমাধান অত্যন্ত সহজভাবে হয়ে যায়। এই দুষ্কর্মের হোতা মেহ্দী নিসার খান ও একদল অনভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে আজিমাবাদ অধিকারের জন্য সিরাজ-উদ-দৌলা সেখানে পৌছেন এবং দুর্গের তোরণ খোলার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। এদিক (দুর্গের ভিতর) থেকে জানকী রামের লোকেরা বাধা প্রদান করে এবং যুদ্ধ করতে থাকে। এই গণ্ডগোল ও বিরোধের মূল প্ররোচক মেহদী নিসার খান, তাঁর সঙ্গী আরও কয়েকজন দুর্বৃত্তসহ ভীতু ও কাপুরুষ সিরাজ-উদ-দৌলাকে সঙ্গে নিয়ে 'খিড়কীর দ্বার' নামে পরিচিত একটি ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ দিয়ে নগরের ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই বিরোধ ও গণ্ডগোলের মূল মেহ্দী নিসার খান তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ নিহত হন। ভীতি ও কাপুরুষতা সিরাজ-উদ-দৌলার চরিত্রে নিহিত ছিল। মেহ্দী নিসার খান ও অন্যান্যের মৃত্যু দেখে সিরাজ-উদ-দৌলা বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন ও এক দরিদ্র কারিগরের গৃহে আত্মগোপন করেন। তাঁর শ্বশুর মোহাম্মদ ইরাজ খানের ভ্রাতা মীর্জা মোস্তফা কুলি খান কিছু কর্তব্য পালনের কাজে তখন আজিমাবাদে ছিলেন। তিনি (সিরাজ-উদ-দৌলা) তাঁর কাছে একজন লোক পাঠিয়ে তাঁর অবস্থার কথা মোস্তফা কুলি খানকে জানান।[৮] এই সংবাদ পাওয়ার পর তিনি নির্দ্বিধায় সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট চলে আসেন এবং পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে

৭। মূল ফারসি 'দর বিসাত-ই-ওজুদ আয্ নররাদি-কুযাসুরত বাযি-ই-চিতুর-ই-জুলুহ্ গর খাহাদ শুদ' (در بساط وجود از نرادی قضاصورت بازی چطور جلوه گر خواهد شد) 'In the Providence's play, what course will the game take on the dice board of existence (P: A.S. 102). য. না. (১৪৫ পৃঃ) সার সংক্ষেপ দিয়েছেন, "not knowing how the will of God would manifest itself."

৮। এই পরিবার সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (১৭ পরিচ্ছেদ দ্রঃ)। এ সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১০৪-০৫ পৃঃ) বর্ণিত আছে যে, মেহদী নিসার খানের মৃত্যু দেখে সিরাজ নিজেই পায়ে হেঁটে মোস্তফা কুলি খানের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন।

তাঁকে নিজ গৃহে নিয়ে যান। এই সঙ্কটের পর সিরাজ-উদ-দৌলা নিরাপদ ও অক্ষত অবস্থায় মীর্জা মোস্তফা কুলি খানের গৃহে পৌঁছেছেন[৯] এই সংবাদ পেয়ে জানকী রাম এবার দ্বিতীয় জীবন লাভ করেছেন বলে সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানান।[১০]

এই সময়ে নবাব গিয়াসপুরের উপকণ্ঠে বাড় নামে পরিচিত এক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন এবং সেখানে এই ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবগত হন। নবাব আসাদ উল্লাহ্ খান নবাবের সঙ্গী হিসাবে এই অভিযানে মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলাকে সর্বপ্রকারে প্রবোধ দিয়ে তাঁর সব দাবি মেনে নেওয়া ও তাঁকে সহৃদয়তা ও অনুগ্রহ প্রদানের কথা জানিয়ে নবাবের কাছে তাঁকে নিয়া আসার জন্য নবাব তাঁকে সিরাজ-উদ-দৌলার কাছে প্রেরণ করেন। সিরাজ-উদ-দৌলার কাছে গিয়ে তিনি নবাবের বার্তা তাঁকে সঠিকভাবে বোঝাতে সমর্থ হন এবং তাঁর উদ্ভ্রান্ত মনকে বিভিন্ন উপায়ে শান্ত করে তিনি তাঁকে নবাবের কাছে ফিরে আসতে রাজী করান।

সিরাজ-উদ-দৌলা ফিরে আসতে সম্মত হয়েছেন, এই সংবাদ পেয়ে নবাব এত অধিক উৎফুল্ল হয়ে পড়েন যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণাবলী যেমন মর্যাদাবোধ ও গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলেন এবং প্রতি মুহূর্তে তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার নাম উচ্চারণ ও অতিশয় ব্যগ্রভাবে তাঁর আগমনের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকেন। সংবাদ বহনকারীরা তাঁর আগমন বার্তা না দেওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। [ইতোমধ্যে] তিনি তাঁর তাঁবুর সামনের পর্দা তুলে রাখতে আদেশ দেন যাতে দেখার পথে এগুলি কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে পারে এবং দূর থেকে সিরাজ-উদ-দৌলার শকটও যাতে তাঁর দৃষ্টিতে পড়তে পারে। সেই শকট তাঁর নজরে পড়া মাত্র এবং সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁবুর কাছে না আসা পর্যন্ত তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে পড়ে সিজদা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৯। মূল ফারসি 'দর ইন হাদেসাহ্-মোহ্ফুয্ ওয়া মহর্রুস্ মান্দাহ্ দর-খানাহ্-ই..... (درین حادثه محفوظ و محروس مانده درخانهٔ) 'safe and sound after that disaster has reached...' A.S. (P. 102)। যদুনাথ (১৪৬ পৃঃ), 'on hearing of Siraj-ud-daulah being safe'. যদুনাথের পাঠ বরাবরের মতই সার সংক্ষেপ ও ভাবানুবাদ।

১০। এ সম্বন্ধে সিয়ারের বর্ণনা (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড ১০১-০৫ পৃঃ) দ্রঃ। সেই বর্ণনা বেশ বিস্তারিত এবং সৈয়দ গোলাম হোসেন তাঁর চাচা মেহদী নিসারের পক্ষে অনেক কথাই বলেছেন। এ সম্বন্ধে করম আলী (য. না. ৪৮ পৃঃ) বলেন, "On the day when Siraj issued from Murshidabad, that wise and true officer Ghulam Hasan Khan,' arzbegi, wrote to Raja Janaki Ram that Siraj-ud-daulah with Mahadi Nisar Khan was going there without permission and that Mahdi should be arrested in any way possible. The letter reached Janaki Ram two hours before the arrival of Siraj-ud-daula and he had not yet warned the defenders of the fort when Siraj-ud-daula entered the city. Janaki Ram on hearing of this sent Jaswant Nagar to arrest Mahdi Nisar Khan. Meeting the party in the middle of the city, Jaswant slew Mahdi Nisar Khan and his comrades, carried Siraj-ud-daula with all care and honour in the mansion of Haji Sahib and placed Mustafa Quli Khan to attend him..."।

শকট থেকে অবতরণ করে সিরাজ-উদ-দৌলা দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে নবাবের পদ চুম্বন করেন। নবাব তাঁকে অতিশয় আদর ও তাঁর প্রতি শিশুসুলভ ভাব প্রকাশ করে তাঁকে আলিঙ্গন করে বারবার সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁরা দু'জনে এক সঙ্গে বের হয়ে কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করে আজিমাবাদে উপস্থিত হন এবং গঙ্গার তীরে অবস্থিত [মরহুম] জয়ন-উদ-দীন খানের গৃহে অবতরণ করেন। বিগত যুদ্ধের সময় জানকীরাম সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশ করায় সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর উপর রাগান্বিত ছিলেন। নবাব জানকী রামের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁকে ক্ষমা করার জন্য [সিরাজকে] বলেন এবং জানকী রামকে সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট প্রেরণ করেন। সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর মাতামহের কথা স্মরণ রেখে এবং জানকী রামকে তাঁদের একজন কর্মকর্তা ও শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করে তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং অনুগ্রহ ও পারিতোষিক দিয়ে তাঁকে বিদায় করেন।

বিহার সুবাতে তেমন আর কোনো কাজ না থাকায় সেখানে নবাবের উপস্থিতির আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। বরং কটক ও বালেশ্বরে মারাঠাদের অবস্থানের কারণে এবং মেদিনীপুরে অবস্থানরত মীর মোহাম্মদ জাফর খান ও রাজা দুর্লভ রামকে নিয়ে নবাব অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন[১১] বলে তিনি [আজিমাবাদ থেকে] প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজা জানকী রামকে [বিহার সুবার সুবাদারের] শাসন ক্ষমতার খিলা'ত প্রদান করেন এবং সিরাজ-উদ-দৌলাকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন।

সেই সময়ে নবাব দহনকর জ্বরে[১২] আক্রান্ত হন এবং তা (শরীরের উত্তাপ) সাধারণ অবস্থা থেকে অতি উঁচুতে উঠতে থাকে। হাকিম তাজ-উদ-দীন ছাড়া সেই সময়ে আর কোনো ভাল চিকিৎসক আজিমাবাদে বসবাসরত ছিলেন না। নবাবের আহবানে তিনি আসেন এবং নবাবের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। নবাব নৌকায় আরোহণ করে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকেন। পথিমধ্যে তিনি একজন কর্মকর্তাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন সেখান থেকে হাকিম সৈয়দ হাদি খানকে আনয়ন করার জন্য। নবাবের দেহ সম্বন্ধে এই চিকিৎসকের পূর্ণ ধারণা ছিল। সেই চিকিৎসক

১১। মূল ফারসি, 'ওয়া মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান ওয়া রাজা দুর্লভরাম কেহ্দর মিদনীপুর আকামত দাশতান্দ্ তরদীদ দাশ্ত্ আ'যম মুয়া'ওদত জযম্শুদাহ্'

(و میر محمد جعفر خان و راجه درلبه رام که در میدینی پور اقامت داشتند تر دد داشت عزم معاودت جزم شده) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ (১৪৭ পৃঃ) দিয়েছেন, "as Mir Md. J'afar Khan and Raja Durlabh Ram who were in Medinipur felt alarmed in mind, the Nawab decided to return."। এই অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, ম্ব. পাঠ অনুসারে মীর জা'ফর ও দুর্লভ রামকে নিয়ে নবাব উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং তারা নবাবের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন না। এ. এস.-এর পাঠ (১০৩ পৃঃ) সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

১২। ফারসি পাঠ, 'তবি-ই-মহ্রুক' (تبی محرق) '**burning fever**' এবং যদুনাথ (১৪৭ পৃঃ) কর্তৃক উল্লিখিত 'shaking fever (ague)' নয়।

রাজমহলে নবাবের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ করেন। রোগের কষ্ট নিয়ে নবাব মুর্শিদাবাদে পৌছেন এবং সম্পূর্ণরূপে হাকিম হাদি খানের নির্দেশ অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে প্ল্যাটোপ্রতিম[১৩] এই চিকিৎসক [নবাবের ব্যাধির] অলৌকিক নিরাময় সাধন করেন এবং এই রকম ব্যাধির নিরাময়কে মসীহার চিকিৎসার সঙ্গে তুলনা করা যায়।[১৪]

তাঁর চিকিৎসার সুব্যবস্থার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নবাবের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সুস্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়ার পর বিদ্যা ও [অন্যান্য] গুণাবলীর অধিকারী মানুষের সেই পৃষ্ঠপোষক[১৪] হাকিম হাদি খানকে একটি সম্মানসূচক খিলা'ত, মণিমুক্তা খচিত একটি সরপেচ, সুবর্ণ খচিত পর্দা, হাওদাসহ একটি হস্তী ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের জন্য নবাব যথেষ্ট কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি শিবিকারোহণে নবাবের প্রাসাদে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ করেন এবং সেখানে নবাব শাহামত জঙ ও সিরাজ-উদ-দৌলার পালকি থামার স্থান পর্যন্ত তাঁর পালকি আসার অনুমতি প্রদান করা হয়। সেই স্থান ছিল বাদ্যকরদের জন্য নির্মিত উঁচু মেঝের সিঁড়ি পর্যন্ত। উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত আমির-ওমরাদের মধ্যে আর কেউ তাঁর চেয়ে উঁচু আসনের অনুমতি লাভ করেননি। শাহামত জঙ এবং সিরাজ-উদ-দৌলাও তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন।

রোগমুক্তির শেষে [প্রথম] স্নান করার পর নবাব আমির-ওমারাদের মধ্যে পারিতোষিক, সৈয়দদের মধ্যে নজর ও দরিদ্রদের মধ্যে ভিক্ষা দান করেন। বর্ষাকাল তখনও শেষ হয়নি বলে নবাব রাজা দুর্লভ রাম ও মীর মোহাম্মদ জাফর খানের কাছে তাঁর আরোগ্য লাভের সংবাদ, তাঁদের সেখানে অবস্থান করার জন্য প্রশংসা জানিয়ে এবং বর্ষা শেষে তিনি নিজে সেখানে যাবেন বলে সংবাদ দিয়ে পত্রাদি প্রেরণ করেন।

১৩। মূল ফারসি 'ওয়া দর হকিকাত আন্ আফ্লাতুন মনশ এ'জায মসিহা-ই-দর আযালাহ্-ই-চুনিন মরয্ শদিদ রকার বোবদাহ্....'

(و در حقیقتآن افلاطون منش اعجاز مسیحائی در ازالهٔ چنین مرض شدید بقدا برصایه در اندك زمانی مزاج مبارك را با صلح آورد) পাঠের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ যদুনাথ (১০৭ পৃঃ) দিয়েছেন, "This great physician cured him in a short time". এ. এস.-এর পাঠ (১০৮ পৃঃ) "In fact, the Plato like physician wrought a miraculous cure, equalling that of Messiah in his treatment of several illness, and with his well-directed efforts brought the Nawab's health to normalcy within a short time." সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

১৪। অর্থাৎ নবাব আলিবর্দী খান।

এই সময়ে নবাব সওলত জঙ তাঁর খুল্লতাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও তাঁর আরোগ্য লাভের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাতে পুর্ণিয়া থেকে মুর্শিদাবাদে এসে উপস্থিত হন। শাহাম্মত জঙের সঙ্গে প্রয়াত নবাব শুজা-উদ-দৌলার কন্যা নফিসা বেগমের[১৫] প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং শাহাম্মত জঙের নিজের ও তাঁর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ছিল। মরহুম নবাব আলা-উদ-দৌলার সন্তানদের মধ্যে শুকুর উল্লাহ্ উপাধিধারী আকা বাবাকে[১৬] নফিসা বেগম নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তিনি পাগলের মতো ভালবাসতেন। তিনি শাহাম্মত জঙের স্ত্রী বিবি ঘসেটির মাধ্যমে সওলত জঙের কন্যার সঙ্গে আকাবাবার বিবাহের প্রস্তাব দেন। সওলত জঙ প্রথমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু শাহাম্মত জঙ ও তাঁর স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তাতে সম্মতি দান করেন। দিন কয়েক পরে তিনি তাঁর পিতৃব্যের নিকট থেকে অনেক অনুগ্রহ ও পুর্ণিয়াতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করেন। নবাব আলিবর্দী খান ও প্রয়াত নবাব সরফরাজ খানের আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতি ব্যতীত এই বিবাহ অনুষ্ঠান হতে পারে না বিধায় এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষে পুর্ণিয়া যাওয়া সম্ভব হবে না বলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সওলত জঙ এই বিবাহ-অনুষ্ঠান মুর্শিদাবাদে আয়োজন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের পর শুভ সময়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসবেন। এই ঘটনার পরবর্তী বিবরণ আগামী বছরগুলির ঘটনাবলীর মধ্যে স্থান পাবে।

১৫। নবাব শুজা-উদ্-দীনের কন্যা ও নবাব সরফরাজ খানের ভগিনী এই নাফিসা বেগমের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১০৯ পৃঃ) তাঁকে ভুল করে সরফরাজ কানের মাতা বলা হয়েছে। (This unexpected visit furnished Nafissa-begum, mother of late Nawab Ser-affraz qhan....")।

১৬। মরহুম নবাব সরফরাজ খান যেদিন আলিবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন ঠিক সেদিনই (১৫ই এপ্রিল, ১৭৪০ খ্রিঃ) তাঁর এক উপপত্নীর গর্ভে নবাবের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নবাবের ভগিনী ও সৈয়দ রাজি খানের পত্নী নাফিসা বেগম সেই শিশুটিকে পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন ও তাঁকে বড় করেন। তাঁর নাম রাখা হয় শুকুর উল্লাহ্ খান ওরফে আকাবাবা। আলোচ্য সময়ে (১৭৫২-৫৩ খ্রিঃ) আকাবাবার বয়স বার কি তের বছরের অধিক ছিলনা বলে দেখা যায়। এতে দেখা যাচ্ছে সেই সময়ে অতি অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেবার রীতি প্রচলিত ছিল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

নবাব ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধি, অযোধ্যায় আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে আতাউল্লাহ্ খানের মৃত্যুবরণ এবং সেই সঙ্গে নউল রায়ের মৃত্যুর বর্ণনা

মীর মোহাম্মদ জাফর খান ও রাজা দুর্লভ রামের অধীনে মেদিনীপুরে যে সৈন্য মোতায়েন ছিল, মারাঠা বাহিনীর মোকাবিলা ও তাদেরকে বালেশ্বর ও কটক থেকে বিতাড়িত করার শক্তি তাদের ছিল। কিন্তু তারা ও তাদের নেতারা কোনো কারণে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করে নি। এগুলির মধ্যে একটি কারণ ছিল, সাম্প্রতিককালে নবাবের সংকটজনক অসুস্থতার সংবাদ এবং তা বহুল প্রচারের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ থেকে যেসব সংবাদ ও পত্রাদি প্রেরিত হয়েছিল তা সবই ছিল জাল ও মিথ্যা বর্ণনাভিত্তিক। অতএব মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাঁর নিজেরই যুদ্ধ করা কর্তব্য বলে নবাব মনে করেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়স[১] এবং অসুস্থতার কারণে দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি ১১৬৪ হিজরী (ডিসেম্বর, ১৭৫০ খ্রিঃ) সনে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিনি মুর্শিদাবাদে অগ্রসর হন। তাঁর [এই] অভিযানের সংবাদ পেয়ে রাজা দুর্লভ রাম ও মীর মোহাম্মদ জাফর খান তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য মেদিনীপুর থেকে বের হয়ে আসেন এবং বিজয়ী বাহিনী বর্ধমান থেকে নির্গত হওয়ার পর নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্মান তাঁরা লাভ করেন।

১। আলিবর্দী খান যে হাজী মোহাম্মদের চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন সেই বর্ণনার সমর্থন প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। করম আলী খানের বর্ণনায় (য. না. ৪৪ পৃঃ) আছে, "The Afghans Searched for Haji Sahib. The old man of ninety..." । এ ঘটনা ঘটেছিল ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। সেই হিসাবে আলিবর্দীর বয়স ছিল তখন ৮০ বছর। কিন্তু এক সূত্রে বলা হয়েছে যে, ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে বাঙলার সিংহাসন অধিকার করার সময় আলিবর্দীর বয়স ছিল ৬০ বছর এবং ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল তারিখে তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ৮২ বছর। এসব পরস্পর বিরোধী বর্ণনা থেকে আলিবর্দীর সঠিক বয়স নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স যে প্রায় ৭৫ বছর ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আলোচ্য সময়ে তাঁর বয়স যে প্রায় ৭০ বছর ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মেদিনীপুর থেকে তাঁদের বাইরে যাওয়ার জন্য এবং সেই সঙ্গে নবাবের অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে[২] মীর হাবিব ও মারাঠা বাহিনী দুঃসাহসিকতা ও ধৃষ্টতার পথ প্রসারিত করা ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করার সাহস পান এবং নিজেদের অবস্থানস্থল থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। নিজস্ব বাহিনী ও অতিরিক্ত সেনাদল নিয়ে মারাঠাদের প্রতিহত করার জন্য নবাব মেদিনীপুরের দিকে এগিয়ে আসেন এবং উক্ত শহরের নিকটবর্তী স্থানে আলো ও অন্ধকার একে অন্যের সম্মুখীন হয়[৩] এবং দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তাদের চিরাচরিত ও প্রচলিত প্রথা অনুসারে নবাবের সিংহ-পরাজয়কারী বীর সৈন্যদের আঘাত সইতে না পেরে দাক্ষিণাত্যের সৈন্যগণ পশ্চিম বাঙলার অরণ্যাঞ্চলের দিকে পলায়নপর হয়। এই দুর্বৃত্তদের বাঙলার মাটি থেকে উচ্ছেদ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে নবাব অরণ্যাঞ্চলে এই পরাজিত সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এই ভগ্নোৎসাহ [মারাঠা] সৈন্যরা বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে সেই বাহিনী আসার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলের তারকাগুলির মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন করে। বিজয়ী বাহিনীর বীর যোদ্ধারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে এক এক মুহূর্তের বিশ্রাম ও আরামের সুযোগ দেয়নি।[৪]

হতাশাগ্রস্ত [মারাঠা] সৈন্যরা তাদের সম্মুখের স্থান অতিশয় সংকীর্ণ দেখে পার্বত্য পথে কটকের দিকে চলে যায়। নবাব বিজয়োল্লাসে[৫] মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের জন্য পতাকা উত্তোলন করেন। মারাঠাদের [কটক থেকে] বিতাড়িত করার কাজ পর বছর পর্যন্ত স্থগিত রেখে নবাব কাটোয়া এসে অবতরণ করেন।

২। মূল ফারসি 'ওয়া আয্ বরখাস্তান-ই-ইনহা আয্ মেদিনীপুর ব-অ'লাওয়াহ্ শহ্রত-ই-শিদ্দত-ই-আ'র্যাহ্-ই-হোসেমানি-ই-নওয়াব মা'লি আলকাব মীর হবিব ওয়া ফৌজ-ই-মারহাট্টা পা-ই-হেরাত ওয়া জেসারত দরাজ কারদাহ্'

(و از بر خاستن اینها از میدینی پور بعلاوهٔ شهرت شدت عارضهٔ جسمانی نواب معلی القاب میر جبیب و فوج مرهته پای حرات و جسارت دراز گرده) পাঠের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন (১০৬ পৃঃ) "Due to their departure from Medinipur inspite of the celebrity which the Nawab's severe physical illness gained, Mir Habib and his Maratha troops stretched, the feet of audacity and defence." এই পাঠ অর্থহীন। তিনি بلاوه এর শব্দের অনুবাদ করেছেন 'inspite of'। প্রকৃত পক্ষে এর অনুবাদ হবে 'in addition to' এবং এই বাক্যাংশের সঠিক অনুবাদ হবে 'in addition to the publicity (not celebrity as said by A.S.) of the severe physical illness of the Nawab'.।

৩। মুসলিম বাহিনী ও মারাঠাদেরকে যথাক্রমে আলো ও অন্ধকার এখানে এবং পূর্বেও বলা হয়েছে।

৪। গ্রন্থকার নবাবের যতই প্রশংসা করুন না কেন, তাঁর বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, নবাব মারাঠাদের বিরুদ্ধে মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি।

৫। মারাঠাদের বিরুদ্ধে কিছু না করতে পেরে আলিবর্দী মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে কাটোয়াতে ফিরে এসেছেন আর চাটুকার গ্রন্থকার নির্লজ্জের মতো সেটিকেই বিজয় বলেছেন।

মীর হাবিব ও মারাঠা বাহিনী বহু বছর ধরে বিভিন্ন অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করেছে এবং সর্বদা ইসলামের বীর সৈনিকদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে। তারা নিদ্রা ও বিশ্রামের সুযোগ পায়নি। যদি সম্ভব হয় তবে শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় কিনা, এই চিন্তা তাদের মনে উদয় হয়। কটক ও অন্যান্য স্থান থেকে তাদের পক্ষে সরে যাওয়া এবং এসব অঞ্চল থেকে তাদের যে লাভ হচ্ছে তা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয় বলে [মারাঠারা চিন্তা করে]। তদুপরি বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে হঠাৎ করে সৈন্য সরিয়ে নিলে তাঁর আমিরদের কাছে তাঁর অসম্মানের কথাও [তিনি চিন্তা করেন]। এইসব কারণে নবাবের নিকট কিছু শর্ত পালনের জন্য প্রস্তাব দিবার পক্ষে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এই ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে মীর হাবিব তাঁর কিছু বিশ্বস্ত লোককে মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি (জাফর খান) তাঁদের এই অনুরোধ উপযুক্তভাবে ও সুবিধাজনক সময়ে নবাবের খেদমতে পেশ করেন। তাঁর অতি উঁচু আত্মসম্মানবোধের কারণে নবাবের পক্ষে তাঁদের এই শর্ত মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু অনেক কিছু বিবেচনার পর তিনি এই শান্তির প্রস্তাবে সম্মত হন। এগুলির মধ্যে প্রধানত ছিল জনসাধারণের কল্যাণ ও শান্তির চিন্তা। কারণ, বিগত কয়েক বছর ধরে যে সংগ্রাম ছিল তাতে বিজয় ছিল নবাবেরই এবং সেই সব নীচ প্রকৃতির লোকগুলি যতবারই এদেশে এসেছে ততবারই বিজয়ী বাহিনীর সৈন্যদের নিকট থেকে আঘাত পেয়ে তাদেরকে পলায়ন করতে হয়েছে। কিন্তু [এই সব যুদ্ধের ফলে] জনসাধারণের দুঃখের সীমা থাকেনি।[৬]

দ্বিতীয়ত, বার্ধক্য ও ব্যাধিজনিত শারীরিক দুর্বলতার কারণে পথশ্রম ও অভিযানের কষ্ট সহ্য করার মতো দৈহিক শক্তি নবাবের [আর] ছিলনা। কারণ, তখন তাঁর বয়স

৬। ইউসুফ আলীর এই মন্তব্যকে মোটামুটি সত্য ভাষণ বলা যেতে পারে। মারাঠারা কোনো সম্মুখ যুদ্ধে আলিবর্দীকে পরাজিত করতে পারেননি এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বারবারই তাদেরকে পালিয়ে যেতে হয়েছে কিন্তু পঙ্গপালের মতো তারা বারবার বাঙলায় এসে এখানকার মানুষের ধন সম্পদ লুট করেছে এবং গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছে। ফলে জনগণের দুর্দশার সীমা থাকেনি। বর্গী নামে পরিচিত মারাঠাদের বাঙলায় বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলায় অত্যাচারের কাহিনী জনপ্রবাদ রূপে আজও প্রচলিত। আজও শিশুদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে তদানীন্তন বাঙলার দুর্দশার কাহিনীর যে ছড়া বলা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজানা দিব কিসে।
ধান ফুরাল পাট ফুরাল
খাজানার উপায় কি
আর ক'টা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।

সত্তর বছর[৭] অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং "আমার উদ্দেশ্য অকার্যকর হওয়া থেকেই আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে জানি"[৮] এই বাক্য স্মরণ করে তিনি এই প্রস্তাবে এমনভাবে সম্মত হন যে, ছোট ও বড় কেউ যেন এই প্রস্তাব গ্রহণ করাকে বিজয়ী বাহিনীর দুর্বলতা বলে মনে না করতে পারে।[৯]

তাঁর নিজের পক্ষ থেকে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে শান্তি আলোচনার ব্যবস্থার জন্য মীর হাবিবের নিকট প্রেরণ করার জন্য মীর মোহাম্মদ জাফর খানকে [নবাব কর্তৃক] অনুমতি প্রদান করা হয়। মীর মোহাম্মদ জাফর খান মীর হাসান আলী ও মীর ইওয়াজ আলীকে উপরে উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী সন্ধিপত্র সম্পন্ন করার জন্য মীর হাবিবের নিকট প্রেরণ করেন। এই দুইজন কর্মকর্তা মীর হাবিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্ব নির্দেশমত সন্ধির শর্তাবলীর কথা তাঁকে জানিয়ে দেন। মীর হাবিব সন্ধির সম্ভাবনার কথা চিন্তাও করেননি। এই অভাবিত সুসংবাদ শ্রবণ করে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং নবাব কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেন।[১০] মীর হাবিব তাঁর প্রতিনিধি মীর্জ সালেহ্কে মীর ইওয়াজ আলী ও মীর হাসান আলীর সঙ্গে মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানের নিকট প্রেরণ করেন যাতে মীর্জা সালেহ্ মীর মোহাম্মদ জাফর খানের মাধ্যমে নবাবের নিকট উপস্থিত হয়ে মীর হাবিবের পক্ষ থেকে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করতে পারেন। অতএব বিজয়ী বাহিনীর অরণ্যাঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কাটোয়াতে অবস্থানকালে এই দল মীর মোহাম্মদ জাফর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁর মাধ্যমে তাঁরা নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও মুর্শিদাবাদে তাঁর শুভ সান্নিধ্যে আসেন।

আলাপ-আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হয় যে, মীর হাবিব নবাবের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করলে তাঁকে কটকের নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করা হবে এবং এই স্থানের রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ রঘুর সৈন্যদের বেতনের জন্য প্রদান করা হবে। তদুপরি প্রতি

৭। করম আলীর মোজাফফরনামা মতে আলিবর্দীর বয়স তখন ৮২ বছর হওয়ার কথা। কিন্তু ইউসুফ আলীর মতে এখানে আলিবর্দীর বয়স প্রায় ১২ বছর কম দেখা যাচ্ছে। সিয়ার মতে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১১১ পৃঃ) তাঁর বয়স তখন ৭৫ বছর ছিল বলে বলা হয়েছে। খুব সম্ভব শেষোক্ত এই বয়সই (৭৫ বছর) তখন আলিবর্দীর ছিল।

৮। আরবি বচন ঃ 'আ'রাফতু রাব্বি বিফাসাখিল আ'যাআইম' (عَرَفْتُ رَبِّی بِفَسْخِ الْعَزَائم) =I know my God by the annulment of my aims'.।

৯। মূল ফা.. 'লেকিন বনুহুয়ে কেহ্ আয্ তস্ওয়ার-ই-সগিরিয়া ও কবিরি নতিজাহ্-ই-সোলেহ্ কেহ্ মহ্বুল বর যউ'ফ-ই-লশ্কর-ই-যফর আসর বাশাদ হাসিল না সাওয়াদ' (لیکن بنحویکه از تصور سغری و کبری نتیجاهٔ صلح که محبول بر ضعف لشکر ظفر اثر باشد حاصل نشود) পাঠের অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৪৯ পৃঃ), "But in order that the public high and low might not attribute the peace to the weakness of the Nawab's army."। এই অনুবাদ কিছুটা মনগড়া ও ফারসি পাঠের যথাযথ অনুবাদ নয়। এ. এস.-এর অনুবাদ (তা-ই, ১০৭ পৃঃ) মোটামুটি সন্তোষজনক।

১০। সিয়ারেও (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

বছর বার লক্ষ করে টাকা বারাণসীতে রঘুর প্রতিনিধির হস্তে নবাবের কর্মকর্তা কর্তৃক এই শর্তে প্রদান করা হবে যে, রঘুর লোক আর কোনোদিন নবাবের রাজ্যে পদার্পণ করবে না এবং মারাঠা সেনাবাহিনী বালেশ্বরের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত সুবর্ণ রেখা নদীকে নিজেদের সীমারেখা বলে মেনে নিয়ে অতিক্রম করার জন্য এই নদীতে কোনোদিন আসবে না। এইভাবে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং মীর্জা সালেহকে পারিতোষিক প্রদান করার পর মীর হাবিবের নিকট প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়।[১১]

উক্ত চুক্তি[১২] সম্পাদনের পর মারাঠাদের ব্যাপারে নবাব নিশ্চিন্ত হন এবং অন্য কোন বিরোধী [বা শত্রু] পক্ষ না থাকার কারণে নবাব সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করেন এবং আগে [রাজ্যে] যেসব সমস্যা ছিল সেগুলি সমাধানে সচেষ্ট হন। প্রজা সাধারণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সার্বিক অবস্থার উন্নতি বিধানের সংকল্প গ্রহণের পর এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। চুক্তি অনুসারে মেদিনীপুর তাঁর রাজ্যভুক্ত হওয়ার কারণে [সেই স্থান] মারাঠাদের অত্যাচার থেকে

১১। মূল ফা. পাঠ : بعد سوال و جواب قرار بر آن گرفت که میر حبیب نوکری نواب معلی القاب را اختیار نموده از قبل آن جناب بتفویض نیابت نظامت کتک سرفراز شود و وجوه محاصل آنجا را بتنخواه فوج رگهو دهد و ماورای این دوازده لک روپیه دیگر بوکلای رگهو بشرط آنکه قدم در قلم وی حکومت آنجناب نگذارند متصدیان سرکار در بفارس عایدشا عاید شان سازند و فوج مرهته رودخانهٔ سورن ریکها را که کنار جالیر واقع است حد خود دانسته بقصد عبود پا در رود خانهٔ مذکور نگذارند باین طریق بنای مصالحه قرار گرفته و میرزا صالح مشمول عنایت رخصت انصر اف پیش مرجیب یافت.

এই সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খন্ড, ১১২ পৃঃ) আছে : "That Mir habib, deemed henceforward to be in the service of the Majestuous in battles, should be invested by him with the honourable office of Deputy to His Highness in the Nizamit or Military Government of the province of Oressa. That as Deputy Governor, he should reccieve orders to appropriate the revenues of that province to the payment of the arears due to Raghodji-bhoslar's troops. That over and above that assignment, the sum of twelve lacs of rupees should be paid to Ragho-dji's agents yearly, under condition that the Marhathas would never set their foot again within the dominions of His Highness. Lastly, that the Mootsuddhis and the Accomptant-office of Bengal would pay yearly the above sum.

"That the river Sonamo kit which runs by Ballisser-bander should henceforward be reputed to be the wall and boundary between the two dominnions, and that Marhatta armies would never offer to cross it, or to put a foot in its waters."

১২। গ্রন্থকার ফলাও করে এই চুক্তির কথা বললেও প্রকৃত পক্ষে এতে আলিবর্দীর ক্ষতি ছাড়া কোন লাভই হয়নি। তিনি যে উড়িষ্যা রাজ্য অধিকারের জন্য সরফরাজ খানের ভগ্নীপতিকে পথের ভিখারী করেছিলেন সেই রাজ্য তিনি চিরতরে হারান এবং তদুপরি বার্ষিক বার লক্ষ টাকা মারাঠাদের দিতে বাধ্য থাকেন।

রেহাই পায়। রাজা রামকে এই স্থানের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। এর আগে তিনি হরকরা বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। এই পদে এখন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ সিংহকে নিযুক্ত করা হয়।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আতাউল্লাহ খান সাবিত জঙের বাঙলা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ও তাঁর পরিবারের মহিলা সদস্যদের [মুর্শিদাবাদে] প্রত্যাবর্তনের ঘটনা পরবর্তী বছরের ঘটনাবলীর বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। কারণ তখনই তাঁর হত্যার ঘটনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আগমন এখানে ঘটে। এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল।[১৩]

আতাউল্লাহ খান সাবিত জঙ বাঙলা থেকে এসে অযোধ্যা সুবাতে পৌঁছেন এবং তিনি নবাব সফদর জঙ কর্তৃক নিযুক্ত অযোধ্যার শাসনকর্তা নউল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। নউল রায় ছিলেন একজন কর্তৃত্বব্যঞ্জক (ব্যক্তিত্বসম্পন্ন) শাসনকর্তা ও আতাউল্লাহ খানের প্রবল সমর্থক। নউল রায় নিজেও এই সাক্ষাতের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সাক্ষাতের সময় তাঁর সঙ্গে অতি উৎকৃষ্ট আচরণ করেন। আতাউল্লাহ খান সাবিত জঙ সফদর জঙের উপর নউল রায়ের প্রভাব দেখে আশা করেন যে, তিনি (আতাউল্লাহ খান) সফদর জঙের ব্যাপারে নউল রায়কে সাহায্য ও সহায়তা করবেন এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ স্থানসমূহে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে তিনি নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের সোপান প্রতিষ্ঠা করবেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁর মত সাহসিকতা ও শাসনকার্যে প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং প্রভূত অর্থ ও সম্পদের অধিকারী একজন নেতা সেই স্থানে ছিল না। কিন্তু বিরুদ্ধ নিয়তি তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করার ফলে তাঁর কল্পনার ছবি তাঁর মনের আয়নাতে প্রতিফলিত হয়নি এবং সেই সময়েই সাবিত জঙ এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

সেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ। [সম্রাট] আহমদ শাহর রাজত্বকালে (১৭৪৯-৫৪খ্রিঃ) নবাব বাহাদুর নামে পরিচিত জাভেদ খান খোজা শাসনকার্যের ব্যাপারে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সেই সময় উজির সফদর জঙের প্ররোচনায় আলী মোহাম্মদ রোহিলার পুত্র সা'দ উল্লাহ খান বেরিলীর আমিল আজমত উল্লাহ খানকে

১৩। আতাউল্লাহ খানের মৃত্যু সম্বন্ধে এখানে মোটামুটি দীর্ঘ বর্ণনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সিয়ারের (সিয়ার-ই, ২য় খন্ড, ১১৪ পৃঃ) বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। রিয়াজে (রিয়াজ বা, ২৮১ পৃঃ) তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ "মহব্বত জং যখন শমশের খানের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে সিরাজ-উদ-দৌলা হাজী আহমদের জামাতা আকবর নগরের (রাজ মহল) ফৌজদার আতাউল্লাহ খান সাবিত জঙের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁকে ধ্বংস করার মতলব করেন। আতাউল্লাহ সম্বন্ধে আলিবর্দীর মনে তিনি সন্দেহ সৃষ্টি করেন এবং আতাউল্লাহ খানকে দেশ ত্যাগ করতে অথবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিতে মহব্বত জঙকে প্ররোচিত করেন।"আতাউল্লাহ সম্বন্ধে রিয়াজের এই বর্ণনা নির্ভারযোগ্য বলে মনে হয় না। সিরাজ যখন বালক মাত্র তখন আতাউল্লাহ খানের ষড়যন্ত্র আলিবর্দীর নিকট ধরা পড়ে যখন কোবরার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি আলিবর্দীকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং সিরাজ-উদ-দৌলাকে তাঁর ব্যাপারে দায়ী করা সঙ্গত মনে হয় না। সিয়ারেও আতাউল্লাহ সম্পর্কে ভাল কথা বলা হয়নি।

হত্যা করেন। মোহাম্মদ খান বিঙ্গাসের পুত্র কায়েম খান সেই সময়ে জাভেদ খানের নিকট থেকে নিরাপত্তা পেতেন এবং তিনি সফদর জঙের বিরোধী ছিলেন। সা'দ উল্লাহ খানকে স্থানচ্যুত করার জন্য কায়েম খানের নিকট জাভেদ খান [পত্র] লিখেন যাতে সাদউল্লাহ খানের স্থান তাঁকে (কায়েম খানকে) দেওয়া যেতে পারে। কায়েম খানের মনে বরাবরই এই ইচ্ছা ছিল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে তিনি সাদউল্লাহ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যান। এই কাজ সফদর জঙের পছন্দসই হয় নি বলে তিনি [সম্রাট] আহমদ শাহকে সাদউল্লাহ খানের নির্দোষিতার কথা বলেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য সম্রাটের সঙ্গে রাজধানীর বাইরে আসেন। ইতোমধ্যে কায়েম খানের নিহত ও সা'দ উল্লাহ খানের বিজয়ী হওয়ার সংবাদ পৌঁছে গেলে সফদর জঙ সম্রাটকে রাজধানীতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই ফররুখাবাদে চলে যান সেখানকার আফগান রাজ্যের বিষয়াদির ব্যবস্থা এবং তাদের সম্পদ ও মালপত্র হস্তগত করার অভিপ্রায়ে। সেখানে গিয়ে তিনি অবশিষ্ট আফগান নেতাদের হত্যা বা বন্দী করেন। মোহাম্মদ খান বিঙ্গাশের কয়েকজন বংশধরের হত্যা এবং অপর কয়েকজনকে কারারুদ্ধ করে তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন। তাঁর নিজের পক্ষ থেকে ফররুখাবাদে একজন কোতোয়াল নিযুক্ত করে এবং সেই রাজ্যের শাসনভার নউল রায়ের হাতে দিয়ে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। নউল রায় সর্বক্ষণ আফগানদের উপর অতিশয় কর্তৃত্বপূর্ণ আদেশ ও বহন করার অসাধ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যে, তাদের পক্ষে জীবিকা উপার্জনের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এই সময় মোহাম্মদ খান বিঙ্গাসের পুত্র আহমদ খান [বিঙ্গাস] তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে বিবাদ ও শত্রুতা হেতু সফদর জঙের কাছে চলে যান এবং সফদর জঙ তাঁকে একটি ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন এবং কায়েম খানের নিহত হওয়ার পর সফদর জঙের অনুমতি নিয়ে আহমদ খান বিঙ্গাস ফররুখাবাদে ফিরে আসেন। নউল রায়ের অত্যাচার ও উৎপীড়নে আফগানদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। মোহাম্মদ খান ও কায়েম খানের সময়ের রুস্তম খান নামক একজন বিশ্বস্ত নেতা ছিলন। আফগানদের বিভিন্ন সরদারকে একত্র করে তিনি বলেন, "নউল রায়ের অভিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন গোত্রের কোন আফগান যেন জীবিত না থাকে। তিনি তাদের ব্যাপারে সীমাহীন অপমান, ঔদ্ধত্য, প্রকাশ্য অপমান ও ঘোর দৌরাত্ম্যপূর্ণ কাজ করে চলেছেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা যদি নিজেদের বিক্ষিপ্ত মানুষগুলিকে একত্র করে শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। তা নাহলে যুদ্ধ করে মৃত্যুকে বরণ করা এই লজ্জা ও আপমানের হাজার জীবন থেকে শ্রেয়।"

আফগানরা সর্বসম্মতিক্রমে রুস্তম খানের প্রস্তাব মেনে নিয়ে এখানে সদ্য প্রত্যাগত আহমদ খানকে তাঁদের নেতা মনোনীত করেন এবং দল সংঘবদ্ধ করা ও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই সংবাদ নউল রায়ের গোচরীভূত হলে তিনি এতে কোন বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে সফদর জঙের নিকট এই বার্তা পৌঁছিয়ে দেন। সফদর জঙ তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি ইসমাইল খানকে নউল রায়ের সাহায্যে প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে আফগানরা তাদের বিক্ষিপ্ত সেনাদলকে একত্র করে প্রকাশ্যে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ফররুখাবাদ থেকে নির্গত হয়। তাঁর [নিজস্ব] যে সৈন্য ছিল তা নিয়ে নউল রায় নিজেও শত্রুর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন এবং দুই পক্ষ একে অন্যের মুখোমুখী হয়। ইসমাইল খানও ইতোমধ্যে এসে পড়েন এবং নউল রায়ের অবস্থান থেকে এক মঞ্জিল দূরে এসে উপস্থিত হন। নউল রায় ছিলেন একজন নির্ভীক ও মর্যাদা সম্পন্ন হিন্দু। তিনি অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে [যুদ্ধ করতে] চাননি। আফগানদের প্রতিহত করার অভিপ্রায়ে তিনি অনতিবিলম্বে অগ্রসর হন। আফগানরা তাঁদের দিক থেকে সব সরঞ্জাম ও সৈন্য নিয়ে শত্রুর দিকে এগিয়ে যায়। যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পরাজয় নিয়তির বিধান ছিল বলে নউলবায়ের সেনাবহিনী পরাজিত হয়। সেনাবাহিনীর পরাজয় সত্ত্বেও নির্ভীক রায় তাঁর সম্মান ও মর্যাদার পা-কে অস্থির হতে দেননি এবং মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করে যান। [নউল রায়ের সঙ্গে] বন্ধুত্বের এবং তাঁর নিজের সাহস ও নির্ভীকতার কারণে আতাউল্লাহ খান সাবিত জঙ এমনভাবে যুদ্ধ করেন যে, তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হন। এবার সফদর জঙ অতীতের সব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে আফগানদের শাস্তি দিতে রাজধানী থেকে নির্গত হন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পরাজয় বরণ করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্ণ প্রস্তুতি ও শক্তি নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারে এসে তাদের সবার মূলোৎপাটন করেন। এইখানে সে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রাসঙ্গিক নয় এবং এই বর্ণনা দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়ার ভয়ে এখানে তা সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

সংক্ষেপে, সাবিতজঙ্গ যুদ্ধে যে সহযোগিতা প্রদর্শন করেন এবং নবাব আলিবর্দী খানের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সফদর জঙ সাবিতজঙের পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে প্রচুর উপহার প্রদান করেন এবং তাঁদের সম্পদে হাত না দিয়ে তাঁদেরকে বাঙলায় চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। সেই সম্পদ নগদ অর্থে ও অন্যান্য বস্তুতে লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যের ছিল এবং সফদর জঙের সবই জানা ছিল। রাবেয়া বেগম[১৪] তার সন্তান সন্ততি ও সম্পদ নিয়ে নিরাপদে বাঙলায় চলে আসেন এবং সেখানে তাঁর চাচার [আলিবর্দী খান] সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হেফাজতে ও সহায়তায় সুখে বাস করেন।

১৪। এই সম্বন্ধে সিয়ারের সংক্ষিপ্ত বর্ণণায় (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১১৩-১৪ পৃঃ) আছে,

"This Princess (Rabiah Begam) on her husband being banished from Aaly verdy Khan's dominions, had thought proper to follow her lord's fortunes as far as Lucknow but the latter having been slain in a battle in which he fought for Nevol ray against Ahmed-qhan-bangash, the Princess availed herself so well of her being a niece to Aaly-verdy-Khan, and she placed so appositely several rich presents, which she distributed to the Grandees of Lucknow, and to the Zaminders of those parts, that she found means to retreat from that dangerous country, and to repair to Azimabad with all her fortune, riches, furnitures, children, family, and dependents, great and small. From Azimabad she went down to Moorshidabad."

অষ্টবিংশ অধ্যায়

রায়রায়ান বীরু দত্তের প্রয়াণ, কীরাত চাঁদ বাঙলার দিওয়ান নিযুক্ত, তাঁর মৃত্যুর পর উমিদ রামের নিযুক্তি এবং জানকী রামের মৃত্যুর পর রাম নারায়ণ আজিমাবাদের নায়েব নাজিম নিযুক্ত

এইসব বছরে বাঙলার দিওয়ান রায় রায়ান বীরু দত্ত শোথ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই পদে নিযুক্তি লাভ না করেও নবাবের আদেশে বীরুদত্তের পেশকার উমিদরাম বাঙলার দিওয়ানির কার্য পরিচালনা করেন। এরপরে রায় রায়ান আলম চাঁদের পুত্র কীরাত রায়কে বাঙলার দিওয়ান ও উমিদ রামকে তাঁর পেশকার নিযুক্ত করা হয়। নবাব শুজা-উদ-দৌলার রাজত্বকালে রায় রায়ান আলম চাঁদ বাঙলার দিওয়ান ছিলেন। কীরাত চাঁদ নিজেও জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জঙ্গের অধীনে কয়েক বছর বিহার সুবার দিওয়ান ছিলেন এবং হয়বত জঙ্গ নিহত হওয়ার পর কীরাত চাঁদ বারাণসীতে বসবাসরত ছিলেন।

তাঁর দিওয়ানিকালে রাজা কীরাত চাঁদ বর্ধমান চাকলার স্থায়ী রাজস্ব ছাড়াও সেখান থেকে এক কোটি টাকারও অধিক রাজস্ব আদায় করে সরকারি রাজকোষে জমা দেন। এ কারণে নবাব তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ও প্রীত হন। প্রায় দুই বছর দিওয়ানি কার্য পরিচালনার পর অর্শ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন।[১] পেশকারি করার সময় উমিদ রাম তাঁর সুন্দর কাজ, সততা ও কর্মদক্ষতা দ্বারা নবাবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন বলে নবাব তাঁকে দিওয়ানির সম্মানসূচক খিলাত প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে রায়রায়ান উপাধিও।

এই সময়ের মধ্যে নবাবের অধীনস্থ বিহারের নায়েব সুবাদার [রাজা] জানকীরাম পরলোক গমন করেন[২]। তাঁর পুত্র রাজা দুর্লভ রাম ছিলেন নবাবের বিশ্বস্ত আমিরদের অন্যতম এবং নবাবের ফৌজি দফতরের দিওয়ানির সঙ্গে যুক্ত। নবাব তাঁকে ও তাঁর তিন ভ্রাতাকে শোকের খিলাত ও অন্যান্য উপহার দ্রব্য প্রেরণ করেন। রাজা জানকী রামের মৃত্যুর পর বিহারের নায়েব নাজিমের পদ রাজা রাম নারায়ণকে প্রদান করা হয়। এবং সেই সঙ্গে মণিমুক্তা খচিত একটি সরপেচ, একটি তরবারি এবং একটি হস্তীও দেওয়া হয়। রাজা দুর্লভ রামকে এই সুবার রাজস্ব দাবি, প্রয়োজনীয় বিষয়াদি, কার্যাদি ও ব্যবস্থাদির জন্য নবাবের দরবারে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়।

১। মূর ফা. পাঠ 'কেহ ব-আরযাহ-ই-মরয ব- ওয়াসির আয্ মখমসাহ-ই-আ'লমদার ওয়া গীর ইনজা রাস্তাহ-ই- মতওয়াজাহা রফে খসুমাত লা ইয়ািযালি-ই-আনজা হনে শুদ' (که بعارضه بواسیر از مخمصهٔ عالمدار و گیر اینجار سته متوجه رفع خصومات لایز الی انجهان شد) Through the disease of ples, he got relief from the dissficulty of the world of tumult and turnd towards ending the eternal disputes of this world." A.S. (P.112. Foot not 2) । য. না. (১৫২ পৃঃ) এর অনুবাদ দিয়েছেনস, "he diea of piles.

২। ফা. পাঠ ঃ বহলুল-ই-আজল তাবীয়ি' দর গুজাশত' (بحلول اجل طبیعی در گزشت) EPassed into the transmigration of the physical death'.

নবমবিংশ অধ্যায়

শুকুর উল্লাহ্ খানের বিবাহ ও ইকরাম-উদ-দৌলার মৃত্যু

এই বছরগুলির ঘটনাবলীর মধ্যে আছে শুকুব উল্লাহ খানের বিবাহ ও ইকরাম-উদ-দৌলার মৃত্যুর ঘটনা। এই দু'টির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ। বিবাহের সমুদয় সরঞ্জাম ও আনুষ্ঠানিকতাসহ সওলত জঙ শুকুর উল্লাহ্ খানের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের জন্য পুর্ণিয়া থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন। নফিসা বেগম নিজেও অতিশয় জাঁকজমকের সঙ্গে 'সাচক'[১] অনুষ্ঠান পালনের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। শুভ মুহূর্ত ও সেই কার্য সম্পাদনের জন্য সবাই যখন সাগ্রহে অপেক্ষারত তখন [মরহুম] জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জঙের এক কন্যা অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[২] কন্যাটি নবাবের দৌহিত্রী ছিলেন বিধায় এই দুর্ঘটনা [তাঁর] আত্মীয়-স্বজনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। নবাব সওলত জঙের মতে এই বিবাহনুষ্ঠান এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা উচিত এবং

১। 'সাচক' (ساچق) শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ'a rite observed at nuptials; presents sent to the bride' এ সম্বন্ধে স্যার যদুনাথ (১৫২ পৃঃ) পাদটীকায় বলেন, "Sachaq, the plant henna (Lawsonia inermis) which yields a red dye when squeezed, presented to a bride for colouring her fingers and toes on the day of marriage. It is accompanied by wedding gifts of various kinds, Hindustani, hennabandi; in Bengali turmeric (Halud) paste."

এ সম্বন্ধে এ এস পাদটীকায় (১১৩ পৃঃ) বলেন, "Sachaq is a Turkish word meaning `Trousseau'. It is also the name of the ceremony of sending henna with fruits; sweeteats, dresses and other articles of bridal toiles to bride, home one day before marriage."

এদেশে 'গায়ে হলুদ' নামক অনুষ্ঠানে মিষ্টি, বস্ত্রাদি, হলুদ বাটা ও মেহেদি বাটাসহ বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্য ইত্যাদি বর ও কনের গৃহে বিয়ের আগে প্রেরণের যে প্রথা মুসলিম সমাজে বিশেষ করে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজে প্রচলিত তার সূচনা কোথায় তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। খুব সম্ভবত হিন্দু সমাজের 'গায়ে হলুদ' ও মুসলিম সমাজের 'সাচক' অনুষ্ঠানের মিলিত রূপ এটি। গ্রাম বাঙলায় মুসলিম সমাজে বিয়ের আগে কনের জন্য বস্ত্রসহ 'তেলাই'-এর সরঞ্জামাদি প্রেরণের প্রথা বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল।

২। মূল ফা. পাঠ 'ব-মরয-উল-মউত মুবতিলাহ্ গাশতাহ্ রাহ্-ই-আ'দম গেরেফত, (بمرض الموت مبتلاء گشته راه عدم گرفت) =contracted a fatal disease and took to the path of non existence. জয়ন-উদ-দীনের বংশ তালিকা

জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান= আমেনা বেগম

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা (১৭২৮-৫৭) | ইকরাম-উদ-দৌলা (মৃত্যু ১৭৫২) | মীর্জা মেহেদী (নিহত ১৭৫৭) | কন্যা (মৃত্যু ১৭৫২) | কন্যা=সৈফ আলী খান)

তিনি পুর্নিয়া চলে যাবেন [বলে স্থির করেন]। কিন্তু নবাবের আর সব আত্মীয়-স্বজন, আমির-ওমরা ও নবাবের পরিবারের পুরুষ ও নারী সকলের বিশেষ করে নবাব শাহামত জঙ ও বিবি ঘসেটির উপর নফিসা বেগমের মতামতের যথেষ্ট মূল্য ছিল বিধায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের কন্যার মৃত্যুর তারিখের চল্লিশ দিন পরে সাচক অনুষ্ঠান করা হবে। সেই কারণে সওলত জঙ পুর্নিয়া যাওয়া থেকে বিরত এবং নির্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষারত থাকেন। হয়বত জঙের কন্যাটির মৃত্যুর প্রায় পর একমাস অতিক্রান্ত হয়ে উভয় পক্ষই যখন {অনুষ্ঠানের] প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন এরচেয়েও বড় এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে।

এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ ইকরাম-উদ-দৌলা ছিলেন নবাবের দৌহিত্র ও [মরহুম] জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের [দ্বিতীয়] পুত্র। নবাব শাহামত জঙ তাঁকে নিজের দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে এত স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন যে, তিনি (ইকরাম) এক মুহূর্ত কাছে না থাকলে এবং ফিরে না আসা পযন্ত নবাব শাহামত জঙের মনে শান্তি ও স্বস্তি থাকত না। তাঁর নিজের সঙ্গে হোক বা অন্য কারোর সঙ্গে হোক, শাহামত জঙ ইকরাম-উদ-দৌলার সব রকম অন্যায় আচরণ ও উচ্ছৃঙ্খলতা সহ্য করতেন এবং এইসবের বর্ণনা দিতে গেলে অসংখ্য পুস্তকের প্রয়োজন হবে। ইকরাম-উদ-দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই সময়ে সওলত জঙ যে তারিখ নির্দিষ্ট করেছিলেন সেই শুভ দিন আগত প্রায় দেখে উভয়পক্ষ সাচক অনুষ্ঠান পালনের জন্য ভোজ ও আনন্দ-উপভোগে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ইকরাম-উদ-দৌলার ব্যাধি দিন দিন অবনতির দিকে চলতে থাকে এবং সেই কথা সংক্ষেপে পূর্বেই বলা হয়েছে। নফিসা বেগম সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা, বিবাহের নির্ধারিত তারিখ যেন কোনো মতেই পরিবর্তিত না হয়। এই অনুসারে তাঁরা এই ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেই চললেন।[৩]

৩। মূল ফা. পাঠ ঃ 'মযু'হ্যা বনাবর পাস খাতির-ই-নফিসা বেগম কেহ বেসিয়ার আ'যিয় মি খোয়াসত কেহ ব-হর তরিক ইনসায়ত তকরির গেরেফতাহ শাদি বরহম না খোরদ'। (معهذا بنا بر پاس خاطر نفیسه بیگم که بسیار عزیز میخواست که بهر طریق این ساعت تقرر گرفته شادی برهم نخورد) এই অসমাপ্ত ও কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ বাক্যের অনুবাদ এ. এস. দিয়েছেন (১১৪ পৃঃ) "Besides, in consideration of the wishes of Nafisa Begum, who was very much endeared and who desired that the appointed time of marriage should not lapse, they continued with the preparation." স্যার যদুনাথ (১৫২ পৃঃ) সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ দিয়েছেন এবং তা নিম্নরূপ ঃ "But in order to please Nafisa Begam, who wished with all her heart to utilize the chosen auspicious day by every possible means and not let the marriage lapse, (they pushed on their preparations)."

কিন্তু নিয়তির বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার নেই এবং 'নিয়তি সুচিন্তিত কার্যক্রমকে নিয়ে কৌতুক করে'। [৪] সাচক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি চলছিল এবং এর মধ্যে ছিল অতিশয় জাঁকজমকের সঙ্গে সজ্জিত এক হাজার প্রদীপ কনের বাড়িতে প্রেরণ করা। সেইগুলি সওলত জঙের গৃহে প্রেরণ করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং এই পক্ষ থেকে কয়েকজন মহিলা সওলত জঙের বাড়িতে পৌঁছেও গেছেন এবং নবাব আলিবর্দী, শাহামত জঙ ও অন্যান্যদের কনের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য শকটও প্রেরণ করা হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে বসন্ত রোগে আক্রান্ত নবম দিনের রাত্রিকালে ইকরাম-উদ-দৌলার অবস্থা অতিশয় কাহিল হয়ে পড়ে এবং তখনই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। এই মহা দুঃখজনক ঘটনার ফলে পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং হরিষ বিষাদে এবং ভোজনের উৎসব দুঃখে পরিণত হয় এবং উঁচু ও নিচু সকলের শোকের দীর্ঘশ্বাস এবং তরুণ ও বৃদ্ধদের শোক প্রকাশের শব্দ আকাশে পৌঁছে যায়।[৫]

শাহামত জঙ্গ ধৈর্য ও সহ্যের আবরণ ছিন্ন করে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে থাকেন। অতীব যত্ন ও আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে সাচক অনুষ্ঠানের যে সব দ্রব্য বরের গৃহে প্রেরণের উদ্দেশ্যে রাস্তার উপরে ও বাজারে রাখা হয়েছিল চোখের নিমিষে ভবঘুরে লোক, গুন্ডা ও দুর্বৃত্তেরা তা লুট করে নিয়ে যায়।[৬] সংক্ষেপে এই ঘটনার পর সওলত জঙ পূর্ণ হতাশা ও বিষণ্নতা নিয়ে পূর্ণিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৪। আরবি বচন ঃ 'ইয়াযহাকুত তাকদিরু আলাত তদবিরি' (يَضحكُ التَقديرُ عَلَى التَدبير) "Fate makes fun of deliberations"। স্যার যদুনাথ এই বচনের অনুবাদ দেননি (১৫৩ পৃঃ)।

৫। স্যার যদুনাথ (১৫৩ পৃঃ) এই অনুচ্ছেদের অংশবিশেষের পাঠ যা দিয়েছেন তা ভাবানুবাদ ও মোটামুটি সংক্ষিপ্ত। শেষের দিকের পাঠের সঙ্গে মূল ফারসী পাঠের সঙ্গতি নেই বললেও চলে যেমন, "...The condition of Akramuddaula suddenly turned worse, and on the ninth day of the appearance of the pox, suffering extreme agony from the length of illness, he began to scratch the postules, and died at once. Extreme grief of all rejoicings was turned into mourning.

৬। প্রায় অনুরূপ বর্ণনা মোজাফফর নামাতেও (য.না-৬০ পৃঃ) আছে ঃ "The marriage was postponed, festivity was turned into mourning. A lakh of rupees worth of things prepared for the marriage were looted [by the order] of the bazar people." তাতে দেখা যাচ্ছে যে, মুর্শিদাবাদ নগরীতে আলিবর্দীর সময়ে আইনের শাসন মোটেই শক্ত ছিল না।

ত্রিংশ অধ্যায়

এই বছরে সিরাজ-উদ-দৌলা ও হোসেন কুলী খানের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি

এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও এই শত্রুতা সৃষ্টির কারণ নিম্নরূপ ঃ পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, হোসেন কুলী খান শাহামত জঙের সঙ্গে পূর্ণ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বন্ধুত্ব ভোগ করতেন। তাঁর কার্যব্যবস্থা, বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কৌশলভিত্তিক ছিল বলে অধিকাংশ লোকের আস্থা ও একাত্মতা[১] তাঁর প্রতি ছিল। রাজ্য শাসন ও সরকার পরিচালনার ব্যাপারে শাহামত জঙের কোন দক্ষতা ছিল না বলে ভবিষ্যতে হোসেন কুলী খান রাজ্যের অধিকারী হতে পারেন বলে বিজ্ঞ লোকের মনের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[২]। সিরাজ-উদ-দৌলা নবাব আলিবর্দী খানের পরে নিজেকে রাজ্য ও সম্পদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। এবং শাহামত জঙের জন্য তাঁর কোন দুঃশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু উপরে উল্লিখিত কারণের জন্য হোসেন কুলী খানের ব্যাপারে তাঁর মন উদ্বিগ্নতা মুক্ত ছিল না বলে তাঁকে বহিষ্কার করার সুযোগের অনুসন্ধানে তিনি ছিলেন।[৩] প্রত্যেক বারই তিনি যখন তাঁর প্রতি হোসেন কুলী খানের বিরোধিতার কথা প্রকাশ করতেন এবং যেভাবে প্রকাশ করতেন প্রকৃতপক্ষে কোনো মতেই তা সঠিক ছিল না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এক নওরোজ উৎসবের কথা [বলা যেতে পারে]। সেদিন সিরাজ-উদ-দৌলা নিজ গৃহ থেকে নবাবের প্রাসাদে যাচ্ছিলেন। হোসেন কুলী খানের গৃহের কাছাকাছি স্থানে গেলে কয়েকটি কামান দাগার শব্দ তাঁর কানে পৌঁছে। এবং

১। মূল ফা. পাঠ, 'মোওয়াফিকাত' (موافقت) শব্দের অর্থ এ. এস. (১১৫ পৃঃ) দিয়েছেন friendship (বন্ধুত্ব) কিন্তু এই শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে একাত্মতা, বন্ধুত্ব নয়।

২। আলিবর্দীর মনেও যে এই ধারণা জন্মে ছিল এবং তিনিও যে হোসেন কুলী খানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সেই বিস্তারিত বর্ণনা আলিবার্দীর আত্মীয় ও আশ্রিত করম আলী খানের মোজাফ্‌ফরনামায় (য. না.-৫৫ পৃঃ) আছে।

৩। এই কারণ অবশ্য ছিল। সেই সঙ্গে আরও একটি কারণ ছিল তাঁর জননীর সঙ্গে হোসেন কুলী খানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এ সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার ই, ২য় খণ্ড ১২৩-২৪ পৃঃ) ইঙ্গিত আছে। শালিনতার খাতিরে সিয়ার রচয়িতা এ ব্যাপারে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা নিম্নরূপঃ "but at that time there had happened a little misunderstanding between her (Ghascti Bibi) and Hossain. cooly-qhan for an in considerable subject which it would be improper to mention. কিন্তু সিয়ারের টীকাকার এ সম্বন্ধে বলেন, What the author calls an inconsiderable subject, is by no means an inconsiderable one for ladies. Hossain-colly-qhan .. had quitted this princess, for her younger sister, Amina-begum of amorous memory, mother to Ser-aj-ud-doulah.

সেগুলো তাঁর নির্দেশ মতই দাগা হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাগতভাবে তাঁর মাতামহের নিকট উপস্থিত হন এবং এই ব্যাপারে নবাবের নিকট অভিযোগ করেন। তাঁর ক্রোধ ও দুঃখের মাত্রাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যান যে, তিনি [বলেন যে,] এই রাজ্য (বাঙলা) পরিত্যাগ করে তিনি দিল্লীতে সম্রাটের নিকট চলে যাবেন। নবাব নিজে ব্যাপারটাকে ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখে সিরাজ-উদ-দৌলার মন শান্ত করা প্রয়াস পান। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব বর্ণিত কারণের জন্য নবাব নিজেও হোসেন কুলী খানের ব্যাপারে খুব মুক্তমনা ছিলেন না। কিন্তু বিবি ঘষেটি তাঁর (হোসেনকুলী খান) সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিলেন বলে কেউ তাঁর বিরোধিতা করতে সাহস পায় নি।[৪]

মোটকথা, শাহামত জঙ হোসেন কুলী খানের পক্ষ থেকে [সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি] আনুগত্যের শপথ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।[৫] নবাবের কাছে ঘষেটি বিবি ও শাহামতজঙের স্নেহ-মমতার মূল্য ছিল। তিনিও সিরাজ-উদ-দৌলার বিবাদ মিটাতে সহায়ক হন এবং সিরাজ-উদ-দৌলাকে প্রকাশ্যে এই শত্রুতার কথা প্রচার করতে নিষেধ করে বিরোধ দূর করেন।[৬] এ ধরনের কাজ প্রায়ই সিরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক করা হত। শেষ পর্যন্ত পুণ্যাহর দিন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে।

বাঙলায় পুণ্যাহর দিন থেকে নববর্ষের রাজস্ব আদায় শুরু হয়। ভারতীয় মাসের হিসাবে পুন্যাহ চৈত্র মাসে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয়। সূর্য তখন মেষ রাশিতে তার আবর্তন শেষ করে বৃষ রাশিতে তা আরম্ভ করে। সেই দিন বিগত বছরের অনাদায়কৃত রাজস্বের মধ্যে ছয় কি সাত লক্ষ টাকা তোড়া ভর্তি করে নবাবের খেদমতে পেশ করা হয়। বাঙলার অনাদায়ী রাজস্বের ব্যাপারে জমিদার ও আমলাদের কাছে যদি কিছু বকেয়া থাকে তবে সুবার সবচেয়ে বড় মহাজন জগৎশেঠ নবাব সরকারে সেই অর্থ প্রাপ্তির রসিদসহ তা পরিশোধের লিখিত অঙ্গীকারপত্র দাখিল করেন। সেদিন সব নেতৃস্থানীয় জমিদার, অধিকাংশ কর্মচারী, হিসাব রক্ষকগণ প্রভৃতি মিলে প্রায় চারশ এমনকি তার চেয়েও বেশি লোককে তাঁদের পদমর্যাদা অনুসারে সম্মানসূচক খিলাত প্রদান করা হয়। সেদিন এক মহাভোজ ও মহাজনসমাগমের অনুষ্ঠান হয়।

৪। শেষ পর্যন্ত ঘাসেটি বিবিও যে হোসেন কুলী খানের পক্ষ আগ করেছিলেন সেই বর্ণনা সিয়ার ও মোজাফ্ফরনামাতে আছে।

৫। শেষ পর্যন্ত এই মীমাংসা যে টিকে থাকেনি আগের পৃষ্ঠার টীকাতেই সে কথা বলা হয়েছে।

৬। ঘসেটি বিবি, শাহামত জঙ ও হোসেন কুলী খান সম্বন্ধে সিয়ারের টীকাকারের মন্তব্য (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃঃ) প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, The stout man (Husain coolykhan) had the talent of fencing with either hand; and whilst actually in intrigue with Gohassity-biby, the wife, he had a great deal of business to transact with the husband who was an impotent man adicted to feminine joys, ... and he had more than once serious quarrels with his consort about the ambidexter nobleman."

হোসেন কুলী খানেরে প্রতি তাঁর প্রকৃত মনোভাব যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সে জন্যই বোধ হয় আলিবার্দী এ চেষ্টা করতেন।

সংক্ষেপে, একদিন নবাবের প্রাসাদে এমন একটি পুণ্যাহ্‌র আয়োজন করা হয়েছিল। সোনালী স্তম্ভের উপরে ন্যস্ত সোনালী সুতায় সেলাই করা চাঁদোয়ার নিচে নবাব সমুদয় আনুষ্ঠানিকতাসহ মসনদে আসীন ছিলেন।[৭] এবং সেই মসনদ ছিল সোনার কাজ করা সোনালী বালিশ দ্বারা সুশোভিত।[৮] শাহামত জঙ, হোসেনকুলী খান এবং অন্যান্য আমির-ওমারা তাঁদের নিজ নিজ আসনে সমাসীন ছিলেন। ইতোমধ্যে লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ ও হিন্দুস্তানে 'বেকতার' নামে পরিচিত লৌহনির্মিত বর্ম পরিধান করে কয়েকজন বন্ধুসহ সিরাজ-উদ-দৌলা সেখানে উপস্থিত হয়ে হোসেন কুলী খানের কাছাকাছি স্থানে আসন গ্রহণ করেন। অল্পক্ষণ পরেই যেসব বন্দুকধারী সৈনিক তাঁর শকটের সঙ্গে বাইরের তোরণ পর্যন্ত এসেছিল তারা তাদের বন্দুকের 'ম্যাচলক' জ্বালিয়ে দুই-দুই ও চার-চার জন করে ভিতরে প্রবেশ করতে গেল। বরখোরদার বেগ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপারে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করতেন। তিনি সশস্ত্র হয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে দরবারে এসেছিলেন। তিনি অকস্মাৎ দন্ডায়মান হয়ে নবাবের কাছে এসে নিবেদন করলেন," হুজুরের আদেশ কি?" নবাব প্রকৃত ব্যাপার[৮] কিছুই জানতেন না বলে উত্তর দিলেন," কি বিষয়ে?"

বরখোরদার খান আবার বললেন, "যে আদেশ দেওয়া হয়েছে আমি তা পালন করব।"

এ সময়ে গোলাম হোসেন খান পূর্ণ সাহস প্রদর্শন করে নবাবের কাছে নিবেদন করেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার, বন্ধুকধারী সৈন্যরা তাদের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।

বরখোরদার বেগ আবার বললেন, "যে আদেশ দেওয়া হয়েছে আমি তা পালন করব।"

৭। ফা. পাঠঃ "নওয়াব ওলা জনাব যের-ই-শামিয়ানাহ্ ই কুলাবতুন রোয কেহ্ বসতুন হাই তলা বরপা কারদাহ্ ওয়া মসনদ দর কমাল তকাললুফ বা তকিয়াহ ই তলাই ই ওয়া আওসাফাই যরি মফরুশ শাখতাহ বুদান্দ" و نواب ولا جناب زیر شامیانهٔ کلابتون روز که بسطونهای طلا برپا کرده) مسند در کمال تکلف با تکیهٔ طلائی و اوسفه زوی مفروش ساخته بودند) এর অনুবাদ স্যার যদুনাথ দিয়েছেন (১৫৫পৃঃ) the Nawab was seated under a canopy of gold embroidered cloth supported by gold plated (talayer) poles. এই তলাইয়ার (طلایر) পাঠ সঠিক নয়। প্রকৃত পাঠ হচ্ছে (طلابر پا کرده) (তলা বর পা করাদাহ)

৮। আলিবার্দী প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানতেন না গ্রন্থকারের এই মন্তব্য মোটেই যে সত্য নয় তা আলিবদীর এই পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদ বর্ণিত উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এখানে গ্রন্থকার অযথা আলিবর্দীর জন্য মিথ্যা সাফাই গেয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে আলিবার্দী যে হোসেন কুলী খানকে কৌশলে হত্যা করতে চেয়েছিলেন সেই বর্ণনা সিয়ার ও মোজাফফর নামাতে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত আছে এবং সেই সমস্যা আগের পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে গ্রন্থকারের বর্ণনা অত্যন্ত খাপ ছাড়া ও অসম্পূর্ণ। হোসেন কুলী খানকে হত্যা করার প্রচেষ্টা এখানে করা হয়েছিল গ্রন্থকার এইকথা সরাসরিভাবে না বলে অযথা গোলমাল পাকিয়েছেন। নিচে ১০ পাদটীকা দ্রঃ।

দরবারের অন্যরূপ ধারণ করছে দেখে নবাব গোলাম হোসেন খানকে আদেশ দিলেন, "কোন বন্দুকধারী ব্যক্তিকে প্রসাদের ভিতরে আসতে দিবেন না এবং যারা এসে গেছে তাদের বহিষ্কার করা আবশ্যক।"

তিনি (নবাব) বরখোরদার বেগকে এই বলে আদেশ দিলেন, "আপনাকে কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আপনি কিসের আদেশ চাইলেন?"

সেখানে অবস্থান করা তাঁর পক্ষে আর সুবিধাজনক হবে না দেখে বরখোরদার খান সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েন এব গোপন স্থানে চলে গেলেন। এরপর সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতারণাপূর্ণ আচরণ[৯] প্রকাশিত হয়ে পড়ে। শাহাম্মত জঙ ও হোসেন কুলী খান অভিযোগ উত্থাপন করেন। সিরাজ-উদ-দৌলাকে নবাব প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করেন কিন্তু গোপনে বলেন, যারা বিরোধী পক্ষকে বিনষ্ট করার জন্য ঐ ধরনের ব্যবস্থা করে তারা এই প্রকৃতির নয়। এ সবই তোমার অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে হয়েছে। কারণ 'এভাবে হোসেনকুলী খানকে হত্যা করলে জনগণের মধ্যে হট্টগোল হতই। তাতে আমার ও দরবারের ক্ষতি হত এবং সমুদয় সম্পদ লুট হয়ে যেত। যা হোক, এই ধরনের যে কাজ ছাড়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না তা না করাই উচিত। [১০]

৯। এখানে সিরাজ-উদ-দৌলার কপটতাপূর্ণ আচরণকে গ্রন্থকার নিন্দার চোখে দেখেছেন অথচ আলিবর্দীর কপটতাপূর্ণ আচরণের বিপক্ষে একটি কথাও বলেননি।

১০। এই ঘটনা সম্পর্কে করম আলী খান যে বর্ণনা দিয়েছেন (য. না. ৫২পৃঃ) তা নিম্নরূপঃ
Also, in this year (1754 A.D.) a thoughtless act was done by Sirajuddaula, which became the cause of a secret counsel being divulged to the public. He ordered a man named Barkhurdar Beg to murder Hasan Quli Khan on the day of the *Panya* celebration. In the midst of the busy work when the revenue officers *(amil)* Zamindars, traders and clerks, were assembled that idiot in fear of Alivardi Khan asked him, "If you order it, I shall send him across the river." Alivardi pretending not to have heard these words, continued to be busy in receiving the *nazars* and did not turn to Barkhurdar as he thought that (by such a movement) he would be understood to have given the permission, according to the proverb, 'Sillence is half consent.' But when the fool put the same question a second time the Nawab, seeing that his plot has been divulged but the work not done, looked at Barkhurdar Beg with angry eyes and shouted, "Get out of the darbar." He addressed a few sweet and eloquent words to the men present at court in such a way that every one imagined that this step had been meant for himself, and no enquiry happened to be made.

একত্রিংশ অধ্যায়

১১৬৮[1] সনের অন্যান্য ঘটনা–খাজা আব্দুল হাদি অবমানিত–ফয়াজ আলী খান খোরাসানীর বখশি পদ লাভ

এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল। খাজা আব্দুল হাদির উন্নতির বর্ণনা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা সমূহে প্রদত্ত হয়েছে এবং তাঁর অবমাননার বর্ণনা এখানে দেওয়া হল। বখশি হিসাবে খাজা আব্দুর হাদি প্রভূত ক্ষমতা ও প্রভূত্বের অধিকারী হন। কিন্তু ধৈর্যের অভাবে[2] তাঁর মধ্যে গর্ব ও ঔদ্ধত্বের লক্ষণ[3] এমনভাবে প্রকট হয় যে, নবাবের সঙ্গে কথা বলার সময়েও তিনি শৃঙ্খলাবোধের অতি অল্প ধারই ধারতেন। একদিন নবাব দরবারে বললেন, "একটি পবিত্র হাদিসে বলা আছে, শীঘ্রই আমার অনুসারীগণ তেত্রিশটি দলে[4] বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং একটি ছাড়া অবশিষ্ট সব ক'টাই বাতিল। এখন সুন্নিদের মধ্যে বিখ্যাত চার ইমামের অনুসারীরা সবাই নিজেদেরকে 'নাজী' (মুক্তিপ্রাপ্ত) বলে মনে করেন।

নবাব শিয়া মতবাদের অনুসারী ছিলেন। সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে খাজা আব্দুল হাদি নির্দ্বিধায় বললেন, "এই চার বিভাগ প্রকৃতপক্ষে একটিই এবং এগুলি ছাড়া বাকি সব ক'টাই বাতিল হবে।"

এই উত্তরে নবাব রাগান্বিত হন কিন্তু সেখানে নিজেকে নীরব রাখেন। এর আগে অন্য আর একদিন নবাবের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় খাজা আব্দুল হাদি নবাবকে বলেছিলেন "হুজুর আপনার বিনীত ভৃত্য।[5]

১। ১১৬৮ হিজরী (=১৮ই অক্টোবর, ১৭৫৪–৬ই অক্টোবর ১৭৫৫ খ্রিঃ) সন।

২। মূল ফারসি 'কমহৃসল্গি' (کم حو صلگی) শব্দের অনুবাদ এ. এস. (১১৮পৃ.) দিয়েছেন "meanness', এবং সার যদুনাথ দিয়েছেন (১৫৬ পৃঃ) meanness of spirit'। আরবি (حوصلة)('হৌসলত') শব্দের আভিধানিক অর্থ; 'The stomach, mawor crop; capacity; spirit; ambition; desire; courage; patience'। এখানে এশব্দ খুব সম্ভব শেষোক্ত (অর্থাৎ **patience**) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আরবি (حوصلة) শব্দের অন্তে ফারসি (گی)প্রত্যয় ও পূর্বে (کم) বিশেষণ যোগ করে খুব সম্ভব 'ধৈর্যের অভাবহেতু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যের পাঠ দেখে ও এই ধারণাই হয়। 'meanness' অর্থাৎ নীচতার কোনো প্রকাশ এখানে দেখা যাচ্ছেনা।

৩। মূল ফারসি পাঠ 'আসার-ই-রয়ু'-নাত ও আনানিয়ত' (اثار رعــونت و انانیت) । 'haughtiness and arrogance'।

৪। মুল ফারসি পাঠ 'ফিরকাহ' (فرقه) অর্থাৎ দল বা সম্প্রদায় (sects)।

৫। এখানে হঠাৎ করে আলিবর্দী সম্পর্কে বর্ণনার ইতি দেখা যাচ্ছে। এই শেষোক্ত ঘটনা কোন সময় কোন মাসে ঘটেছিল তা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছেনা। তবে এটি যে ১৭৫৪-৫৫ সনের ঘটনা তা পরিচ্ছেদের শিরোনামাতেই আছে। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে আলিবর্দী খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। আলীবর্দী সম্পর্কে পরবর্তী কয়েক মাসের বর্ণনা আলোচ্য গ্রন্থে নেই। তবে করম আলী রচিত মোজাফ্ফরনামা ও গোলাম হোসেন রচিত সিয়ারে আছে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

বাঙলার সিংহাসনে সিরাজ-উদ-দৌলার আরোহণ-তাঁর রাজত্বকালের ঘটনাবলী

১১৭০ হিজরী সনের ১০ই রজব[১] পরলোকগত [নবাব] মহাবত জঙের[২] মৃত্যুর পর সিরাজ-উদ-দৌলা বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরলোকগত নবাবের কন্যা বিবি ঘসেটি তাঁর স্বামী নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর তাঁর পিতার সহায়তায় বাঙলার দিওয়ানির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। পরলোকগত নবাব প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকার কালে সিরাজ-উদ-দৌলার ভয়ে বিবি ঘসেটি মতিঝিল মহলে এসে বসবাস করেন। কারণ, সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁকে উৎখাত করার ফন্দিতে ছিলেন। বিবি ঘসেটি উপহারাদি প্রদান ও বদান্যতার হস্ত প্রসারিত এবং মীর কুদরত উল্লাহ্, মীর শরফ-উদ-দীন ও মীর গোলাম আলী প্রমুখের মত তাঁর সমুদয় বন্ধুকে বিশ লক্ষ টাকারও অধিক, চৌষট্টিটি হস্তী ও দুই শ অশ্ব এবং অন্যান্য উপঢৌকন প্রদান করেন। এই সবই তিনি দিয়েছিলেন এই আশায় যে, তাঁর আপন বোনের পুত্রকে প্রতিহত করার ব্যাপারে তাঁরা তাঁর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করবেন। মতিঝিল প্রাসাদের চারদিকে পরিখা কেটে তিনি [আত্মরক্ষামূলক] যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তাঁর লজ্জাজনক আচরণ ও লজ্জাজনক কার্যে মানুষ তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। সিরাজ-উদ-দৌলাকে সুদৃঢ়ভাবে সিংহাসনে অধিরূঢ় এবং তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনকারী ও আপোসমূলক কূটনীতি দেখে মানুষ বিবি ঘসেটির পক্ষ পরিত্যাগ করে সিরাজ-উদ-দৌলার পক্ষ সমর্থন করেন।[৩]

সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভের আশায় বঞ্চিত হয়ে বিবি ঘসেটি হতাশ হয়ে নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেন। সেই সময়ে সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশে মতিঝিল প্রাসাদ ত্যাগ করে তিনি মুর্শিদাবাদে আসেন এবং তাঁর নিজ গৃহ কোণে এসে বসবাস

১। সঠিক তারিখ ১০ই রজব ১১৬৯ হিজরী (=৯ই এপ্রিল, ১৭৫৬ খ্রিঃ)।

২। নবাব আলিবর্দী খানের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাধি ছিল 'মহাবত জঙ' (مهابت جنگ) সংগ্রামে ভয়ঙ্কর। ধ্বনিগতভাবে এই 'মহাবত' শব্দের সঙ্গে 'মহব্বত' (محبت) স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা শব্দের কিছু মিল থাকলেও শব্দ দু'টির অর্থগত পার্থক্য বিস্তর। অনেকে ভুল করে আলিবর্দীকে 'মহাবত জঙ' না বলে 'মহব্বত জঙ' বলে থাকেন বলে মুদ্রিত গ্রন্থেও দেখা গেছে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থের প্রথমেই পাদটীকায় আলোচনা করা হয়েছে।

৩। এর আগে গ্রন্থকার সিরাজ-উদ-দৌলার সমালোচনা বেশ কঠিন ভাষায়ই করেছেন। কিন্তু সিংহাসন লাভের পর সিরাজ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের এই মন্তব্য দেখে মনে হচ্ছে যে, তাঁর (সিরাজ) মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছিল এবং তা ছিল ভালর দিকে।

করেন। অন্য একদিন সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর ও [মরহুম নবাব] শুজা-উদ-দৌলার কন্যা নফিসা বেগমের[৪] সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেন। এই দুই বাড়ির নগদ অর্থ, অন্যান্য সম্পদ, স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তিই সিরাজ-উদ-দৌলার হস্তগত হয় এবং নাফিসা বেগমকে [মরহুম নবাব]। আ'লা-উদ-দৌলার পুত্র ও আকাবাবা নামে পরিচিত শুকুর-উল্লাহ সহ জাহাঙ্গীর নগরে প্রেরণ করা হয়। জানকী রামের বিদ্রোহ[৫] দমন করে সেই বছরের শা'বান মাসে অন্যান্য চাকুরির পদচ্যুতি ও নিয়োগের প্রতি মনোযোগ না দিয়েই তিনি আকবর নগরের দিকে যাত্রা করেন।

সেই সময়ে তিনি সংবাদ পান যে, ইংরেজদের যে দলটি কলকাতায় বসবাসরত ছিল, তারা সেখানে দুর্গ[৬] নির্মাণ ও তাদের কারখানার চারদিকে পরিখা খনন করছিল এবং তারা রাজা রাজবল্লভের পুত্রকে আশ্রয় দিয়েছে। রাজা রাজবল্লভের এই পুত্র ছিলেন বিবি ঘসেটির প্রবল সমর্থক এবং তিনি [বিগত] কয়েক বছর ধরে জাহাঙ্গীর নগরে কর্মকর্তা ছিলেন।[৭] ইংরেজদের শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে সিরাজ-উদ-দৌলা রাজমহল নামে [অধিক] পরিচিত আকবর নগর থেকে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে ইংরেজদের উকিলরা অবশ্য সিরাজ-উদ-দৌলার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সুপারিশের মাধ্যমে এর মীমাংসা চান এবং [নিজেরাও] নম্রতা প্রকাশ ও বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর কাছে বিনয় প্রদর্শন ও মিনতির মাধ্যমে আবেদন করেন। কিন্তু সিরাজ-উদ-দৌলার লোলুপ দৃষ্টি [ইংরেজদের] কলকাতার সম্পদ ও ভান্ডারের প্রতি যেন সেলাই করা ছিল।[৮] তাই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত থেকে আদৌ নড়েন নি।

৪। ন্যাফিসা বেগমের কথা পূর্বে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। সিরাজ কর্তৃক তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা আলোচ্য গ্রন্থ ছাড়া সিয়ার, মোজাফফরনামাসহ অন্য কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে নেই।

৫। এ, এস, কর্তৃক সম্পাদিত আলোচ্য ফারসী গ্রন্থে 'দফে'-ই-ফিতনা-ই-জানকী রাম' (دفع فتنۂ جانکی رام) পাঠ আছে (১৫৭ পৃঃ)। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদে (১১৯ পৃঃ, ৩ পাদটীকা) তিনি বলেন, A. H. (Arther Hughes) writes, 'after dealing with those domestic upheavels' for (بعد دفع فتنه جانک رام)he has profbably read as جانك and hence his tr, 'domestic upheavols'. This is a very serious misreading and is one of the many noticed in A. H', translation".

কিন্তু জানকীরাম তো এর প্রায় ৪ বছর আগে ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মারা গেছেন। তিনি সিরাজের সময়ে ১৭৫৭ খ্রিঃ আসেন কি করে! এই পাঠে ভুল আছে।

৬। আলোচ্য গ্রন্থের এখানেই প্রথমবারের মত ইংরেজদের সঙ্গে বাঙলার নবাবের বিরোধের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কি কারণে ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ করতে হয়েছিল এবং তাদের সামরিক শক্তি তখন কি ধরনের ছিল, সেই সম্বন্ধে কোন বর্ণনাই আলোচ্য গ্রন্থে নেই, নেই তেমন কোনো বর্ণনা সমসাময়িক অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থেও।

৭। রাজা রাজবল্লভ ছিলেন ঘসেটি বিবির অতি ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় বন্ধু এবং তাঁর পূর্ণ সমর্থক। পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ঢাকায় চাকুরিরত থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হন এবং সিরাজের ভয়ে অজস্র অর্থ নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়ে, ইংরেজ কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৮। মূল ফারসি 'চশম-ই-তমায়াবর আমোয়াল ওয়া যোখাইর-ই-কলকাতা দুখতাহ্‌বুদ' (چشم طمع بر اموال و ذخایر کلکته دوخته بود) ='Greedy eyes were as if sewn on the property and furniture of Calcutta.'। এ সম্বন্ধে মোজাফফরনামাতে যে বিশদ বর্ণনা আছে (য. না-৬৩-৬৪ পৃঃ) তা থেকে জানা যায় যে, সিরাজের প্ররোচনাকারীরা তাঁকে বলেছিল যে, কলকাতা লুন্ঠন করলে তিন কোটি টাকা ও প্রচুর সম্পদ পাওয়া যাবে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই যে, আলিবর্দী দশ বছরেরও অধিককাল ধরে মারাঠাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থেকে বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে একের পর এক অভিযান চালিয়েছিলেন। অথচ তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদের অতি নিকটবর্তী কাশিম বাজার ও কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানি যে দিনের পর দিন শক্তি সঞ্চয় করেই চলেছে, সেদিকে তিনি কোনো দৃষ্টিই নিক্ষেপ করেছেন সে উল্লেখ কোথাও নেই।

সেই বছর রমজান মাসের চার তারিখে (জুন, ১৭৫৬ খ্রিঃ) তিনি মুর্শিদাবাদে এসে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখান থেকে বার ক্রোশ দূরে পৌছেন। সেখানে তিনি ফারাজ আলী খান খোরাসানিকে পদচ্যুত করে [নবাব] আলিবর্দী খানের ভগিনীপতি মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানকে[৯] মীর বখশির পদে নিয়োগ করেন এবং গোলাম হোসেন খানকে পদচ্যুত করে শুজাত আলী খানকে কুঞ্চকী[১০] (Chamberlain) পদে নিয়োগ করেন। রমজান মাসের দুই[১১] তারিখে সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর সেনাবাহিনীসহ কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত আমিন চাঁদের বাগানে অবতরণ করেন এবং ইংরেজ কুঠি অধিকার ও শহর লুণ্ঠন করার জন্য সৈন্যদের আদেশ প্রদান করেন।

কলকাতাতে [ইংরেজদের] প্রধান তাঁদের কুঠির তোরণসমূহ বন্ধ করে দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই কয়দিন ধরে হত্যা যজ্ঞের চেষ্টা চালিয়ে কলকাতা শহরকে ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও লুণ্ঠনের শিকারে পরিণত করা হয় এবং [কলকাতা] ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাড়িঘরের হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ ও আসবাবপত্র লুণ্ঠন ও ধ্বংস করা হয়।[১২] সেই ধ্বংসকার্য এমনভাবে করা হয় যে, সেই সেনাবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খল জনতা তাদের পশুগুলিকে চীনামাটির পাত্রে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করে। কেউ কেউ ঘৃতকুমারি ও চন্দন কাঠকে সাধারণ জ্বালানি কাঠ মনে করে সেগুলি আগুনে পোড়ায়। সুরুচিপূর্ণ ও মূল্যবান এখানকার যে সব দ্রব্য সৈন্যদের হাতে পড়েছিল তা ছিল অগণিত। এসব দ্রব্য প্রায় শতবর্ষ ধরে এই শহরে ও প্রকৃতির প্রতিকূল হাত থেকে নিরাপদে রক্ষিত হয়ে আসছিল। সৈন্য ও বাজারের উচ্ছৃঙ্খল জনতা—তারা সবাই মিলে ষাট কি সত্তর হাজার হবে—এই শহরের কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ ধ্বংস, লুণ্ঠন ও অগ্নি দ্বারা জ্বালানোর ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটিই রাখেনি।

৯। মীর মোহাম্মদ জাফর খান ছিলেন (সিয়ারের বর্ণনামতে) হজরত আলীর বংশধর। তিনি আলিবর্দীর বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ্ খানমকে বিয়ে করেছিলেন (৩ পৃঃ ১৭ পাদটীকা দ্রঃ)। তিনি অতি নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ ছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে আলিবর্দী তাঁকে কয়েকবার বরখাস্ত করেন কিন্তু পারিবারিক ও অন্যান্য কারণে তাঁকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করেন। প্রথমদিকে তিনি ছিলেন আলিবর্দীর অধীনে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে একজন সাধারণ কর্মকর্তা মাত্র। আলিবর্দীর বদান্যতায় সেনাবাহিনীর প্রথম বখশির পদে নিযুক্তি লাভ করলেও তাঁর কোনো চারিত্রিক উন্নতি হয় নি।

১০। মূল ফা. পাঠ ঃ 'ই'লাফা-ই-হিজাবত' (علاقۂ حجابت) 'Chamberlain'।

১১। এর আগে এই অনুচ্ছেদের প্রথমদিকেই বলা হয়েছে যে, রমজান মাসের চার তারিখে মুর্শিদাবাদ থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এই বর্ণনা বিভ্রান্তিকর। খুব সম্ভব পাঠে ভুল আছে।

১২। এই সম্বন্ধে মোজাফফর নামা (য. না-৬২-৬৩ পৃঃ) ও সিয়ারে (সিয়ারই, দ্বিতীয় খন্ড, ১৮৯-৯৩ পৃঃ দ্রঃ)।

সংক্ষেপে, বিজয়ী বাহিনী উল্লিখিত মাসের চতুর্দশ দিবসে ঐ নগরের দুর্গের পাদদেশে উপস্থিত হয়। কলকাতার ইংরেজ প্রধান এই আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে নিজেদেরকে শক্তিহীন মনে করে নিজের পরিবার ও কয়েকজন ফিরিঙ্গীকে নিয়ে জাহাজে চড়ে চরম বাধ্যতামূলক অবস্থায় নদীপথে চলে যান।[১৩] [সিরাজের] বীর যোদ্ধাগণ দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে দুর্গ শিখরে ইসলামের পতাকা স্থাপন করে। বিজয় এত সহজে এসে যাবে তা সিরাজ-উদ-দৌলা চিন্তা করতে পারেননি। তিনি হৃষ্টচিত্তে কুঠির ভিতরে প্রবেশ করে সেখানকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ইংরেজদের যে প্রায় একশ জন অনুচর বন্দী[১৪] হয়েছিল তাদের সবাইকে একটি কক্ষে কয়েদ করে রাখার আদেশ দেওয়া হয়।[১৫] এবং কয়েকজন কর্মকর্তার উপর কুঠি পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সিরাজ-উদ-দৌলা কুঠি থেকে বের হয়ে আসেন এবং ইংরেজদের একটি গৃহে অবস্থান করেন।

১৩। পরিবার-পরিজনসহ ইংরেজদের জাহাজে চড়ে পলায়নের প্রচেষ্টা এবং মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানের নির্দেশে তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা আমির বেগ কি করে বেশ কয়েকজন ইংরেজ মহিলাকে নৌকাযোগে গোপনে পলায়নের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সেই বিশদ বর্ণনা সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১৯০-৯১ পৃঃ) আছে।

১৪। মূল ফা. পাঠ, 'ওয়া করিব সদ নফর-ই ফরিঙ্গান কেহ্ দর আন্ রোয্ আসির -ই-পনজাহ্-ই-তকদির শুদাহ্ বুদান্দ হমাহ্ আন্হারা দর হুজরা মহ্বুস্ [নিমুদ] (وقریب صد نفر فرنگان که در آن روز اسیر پنجهٔ تقدیر شده بودند همه آنهارا در همر محبوس [نمود] "He confined nearly a hundred Farangis who fell victim to the claws of fate on that day".—এ. এস. (১২০ পৃঃ)। উল্লেখ্য এ. এস. 'নফর' পাঠের অনুবাদ দেন নি। প্রায় ১০০ জন ফিরিঙ্গী অনুচরকে যে একটি কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেই কথা গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খান পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মধ্যে শুধু তিনিই তা বলে গেছেন। তবে তাদেরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার কোনো কথাই নেই এবং আর্থার হিউয়েজ-এর বর্ণনা (Bengal Past & Present. Voh L xxvii, ph. 12, 1958, pp. 5-19) 'they were all brought together and fastened in a small room' কল্পনা প্রসূত বলে সহজেই ধরা যায়।

এই হতভাগ্য বন্দীরা যে সেই ক্ষুদ্র কক্ষে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল সেই বর্ণনাও ইউসুফ আলী খান পরিষ্কার ভাষায় দিয়েছেন এবং তা ১৫ টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১৫। মূল ফা. পাঠ, 'আয্ কযা দর হুজরাহ্কে ফরাঙ্গান রাফতাহ্ বুদা [নদ্] তমমি আন্জা মখনুক গাশ্তাহ্ রু বু আদি আ'দম আওরদান্দ্' (از قضاء در حجره که فرنگاه رفته بود [ند] تمامی آنجامخنوق گشته روبو ادی عدم آوردند) ="As luck would have it, in the room where the farangis were kept confined, all of them got suffocated and died".—এ. এস (১২১ পৃঃ)।

তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী ইউসুফ আলী খান এখানে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানির প্রায় ১০০ জন ফিরিঙ্গী অনুচর সেদিন বন্দী হয়েছিল এবং সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশে তাঁর কর্মকর্তারা তাদেরকে একটি গৃহে আবদ্ধ করে রেখেছিল। পরদিন প্রভাতে তাদের প্রায় সবাইকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল (খুব সম্ভব জ্যৈষ্ঠ মাস)। খুব সম্ভব কোম্পানির কুঠির যে কক্ষে তাদের আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল সেটি মোটেই বড় ছিল না এবং তাতে বোধ হয় বায়ু প্রবাহের (ventilation) ব্যবস্থা ভাল ছিল না। ফলে বাতাসের অভাবে এই মহা বিপর্যয় ঘটেছিল। সিরাজের কর্মচারীদের অবহেলা যে এর জন্য পুরাপুরি দায়ি ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই ব্যাপারে সিরাজের অবহেলা ছাড়া কোনো ইচ্ছাকৃত দোষ ছিল বলে দেখা যায় না।

ভাগ্যের পরিহাস, যে কক্ষে ফিরিঙ্গীরা আবদ্ধ ছিল সেখানে তারা শাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অন্যদের যারা এই ক'দিনের যুদ্ধে বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছিল-সংখ্যায় বিশ কি ত্রিশ হবে-এক আদেশের বলে সবার দেহ একজনের পা অন্যজনের মাথার দিকে রেখে কুঠির পরিখাতে নিক্ষেপ করা হয়। সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতার নাম রাখেন আলীনগর এবং দুর্গ ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। আলীনগর অঞ্চলের প্রশাসনের দায়িত্ব বর্ধমানের দিওয়ানের পদে বহুকাল ধরে নিয়োজিত মানিক চাঁদের উপর অর্পণ করে সিরাজ-উদ-দৌলা রমজান মাসের শেষ দিকে হুগলীতে প্রত্যাবর্তন করেন। নগদ অর্থ ছাড়াও কুঠির বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মূল্য হবে প্রায় তিন লক্ষ টাকা কি তারও কিছু অধিক।

দুই দিন পরে তিনি হুগলী শহরের ফখর-উৎ-তোজার[১৬] মোহাম্মদ ওয়াজেদের গৃহে উপস্থিত হন। হুগলীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত ওলন্দাজ ও ফরাসি অধিবাসীরা ইংরেজদের দুর্ভাগ্য দেখে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে ভীত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত উপঢৌকনাদি নিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে সিরাজ-উদ-দৌলার সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁদের সবাইকে সম্মানসূচক খিলা'ত প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। সেই বছরের শওয়াল মাসের প্রথম তারিখে তিনি ঈদের নামাজ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি পালন করেন। সেই মাসের দ্বিতীয় তারিখে হুগলী থেকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের পতাকা উত্তোলিত করেন এবং শওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে অত্যন্ত জাঁকজমক ও সমারোহের সঙ্গে রাজধানীতে উপস্থিত হন। আনন্দ ও সুখের গালিচা বিস্তার করে তিনি শত্রুদের সৃষ্ট বিরক্তিকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন।

ইতোমধ্যে সংবাদ আসে যে, তাঁর পিতৃব্য তনয় শওকত জঙ্গ যিনি তাঁর পিতা সওলত জঙ্গের তিরোধানের পর পুর্ণিয়া অঞ্চলের অধিকারী হন তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন। 'তোমার প্রেমিকের বহু অজুহাত আছে'[১৭] এই বাক্য অনুসারে শওকত জঙ্গকে দমন করার জন্য সিরাজ-উদ-দৌলার সর্বদাই সুযোগের সন্ধানে

১৬। 'ফখর-উৎ-তোজ্জার' (فخر التجار) = 'The pride of the Merchants'। এই ব্যক্তিই সিরাজ-উদ-দৌলাকে কলকাতা আক্রমণের প্ররোচনা দিয়ে বলেছিলেন যে, সেখানে তিন কোটি টাকা লুট করে পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সিরাজ সেখানে সমুদয় মালামালসহ তিন লক্ষ টাকার বেশি পাননি। এই ব্যক্তি কোনো কারণে ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন।

১৭। ফারসি প্রবাদ ঃ 'উশাক-ই-তুরা বাহানা বস বাশাদ' (عشاق ترابهانه بس باشد) 'your lovers have lot of excuses'.। এই প্রবচন প্রয়োগ করে ইউসুফ আলী সিরাজের প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন তা সিরাজের প্রাপ্য ছিল বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে সিয়ারের বর্ণনায় (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১৯৬ পৃঃ) দেখা যায় যে, ঘসেটি বেগম ও মীর জা'ফরের প্ররোচনায় দাম্ভিক কিন্তু নির্বোধ ও মুর্খ (যদিও অন্তরে খুব ভাল মানুষ) শওকত জঙ্গ সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকারের হুমকি দেন। তাতে সিরাজ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন না এবং তিনি যদি শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান তবে সেটিকে 'প্রেমিকের বাহানার শেষ নেই' বলে কটাক্ষ করা যায় না এবং গ্রন্থকার এখানে মোটেই সত্য ভাষণ করেননি। যে কোনো কারণেই হোক ইউসুফ আলী সিরাজের প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না এবং সিরাজের সব দোষের কথাই তিনি বলে গেছেন এবং কোনো গুণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তার কার্পণ্যের ত্রুটি দেখাননি।

ছিলেন।[১৮] এখন পুর্ণিয়া অধিকার ও শওকত জঙকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর সেনাপতিদের শপথের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে বন্ধনরত ও একাত্ম করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দশ কি বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি সেই বছরের জিলহজ্ মাসের শেষদিকে পুর্ণিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। রাজা রামনারায়ণ এর আগে থেকেই আজিমাবাদের নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুবাদার ও জমিদারদের প্রতি বিশ্বস্ত সৈন্যদের নিয়ে গঠিত সেনাদল নিয়ে পুর্ণিয়া আসার জন্য তিনি রাজা রামনারায়ণের নিকট হুকুমনামা প্রেরণ করেন। তাঁর গৃহের পুরাতন মুৎসুদ্দি মোহন লাল[১৯] নামক এক ব্যক্তিকে তিনি একদল সৈন্যসহ অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে প্রেরণ করেন।

১১৭১ হিজরী সনের ১১ই মহররম তারিখে (২৬শে সেপ্টেম্বর ১৭৫৬ খ্রিঃ) সিরাজ-উদ-দৌলা নদী[২০] অতিক্রম করে আকবর নগরে শিবির স্থাপন করেন এবং পরদিন সেই স্থান থেকে নদী পথে অগ্রসর হন। সেই নদী ছিল গঙ্গার একটি উপনদী এবং তা নদীর অপর তীরে অবস্থিত মালদহের নিকটবর্তী কোতোয়ালি নামক স্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহানদী[২১] নামে অভিহিত মালদহ নদী অতিক্রম করে। [এর পরে] দুই কি তিন মঞ্জিল অতিক্রম করে শত্রু শিবির থেকে পাঁচ কি ছয় ক্রোশ দূরে তিনি ছাউনি ফেলেন। এই সময়ে সিরাজ-উদ-দৌলা শওকত জঙের নিকট সৌহার্দ্যপূর্ণ পত্রাবলি প্রেরণ করেন এবং তাঁদের মধ্যে বিরোধের কারণ শওকত জঙের কতগুলি দাবি মেনে নিয়ে শান্তি স্থাপনের অনেক প্রচেষ্টা তিনি চালান।[২২] কিন্তু শওকত জঙ ছিলেন ধন ও যৌবন গর্বে গর্বিত এবং তাচ্ছিল্যের মাদকতায় উদাসীন হয়ে এবং [সেই সঙ্গে] দিনরাত সুরা পান করে মাতাল অবস্থায় থেকে সিরাজ-উদ-দৌলার প্রস্তাবের প্রতি কোন মনোযোগ দেননি। উত্তরে তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁর রাজত্বকাল শেষ হয়ে আসছিল বলে তাঁর মতিগতিরও কোনো পরিবর্তনই হচ্ছিল না।[২৩] কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা ও উপদেশ অনুসারে যুদ্ধ পরিচালনার কার্য না করে, সতর্কতার নিয়ম ভঙ্গ করে ও সৈনিকদের শুভেচ্ছা প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য না রেখে—এবং সেগুলিই

১৮। এই মন্তব্যও সত্য ভাষণ নয়। কারণ, সিরাজ শওকত জঙকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে সিরাজের মহানুভবতারই পরিচয় আছে। সেই আপোসমূলক পত্রের কথা সিয়ারের বর্ণনায় আছে।

১৯। মোহনলালকে সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করার কারণে মীর জাফর আলীসহ প্রায় সব সেনাপতিই সিরাজের উপর বিরক্ত ছিলেন তাঁদের কায়েমি স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে দেখে। মীর জা'ফরই ছিলেন তাঁদের নেতা। কিন্তু এছাড়া সিরাজের কোনো উপায়ও ছিল না। চির ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক মীর জা'ফরের উপর নির্ভর করা সিরাজের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

২০। এই নদী নিশ্চয়ই গঙ্গা নদী।

২১। এই নদী যে বর্তমানকালের মহানন্দা নদী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হিমালয় থেকে নির্গত হয়ে অনেক স্থানে বাঙলা ও বিহারের সীমানা নির্দেশ করে এই নদী রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ির নিকট পদ্মায় পড়েছে। শুষ্ক মৌসুমে বর্তমানে এই নদী ক্ষীণস্রোতা হলেও এককালে এই নদী ছিল বিরাট আকারের।

২২। এর পরেও কি সিরাজকে পুর্নিয়ার যুদ্ধের ব্যাপারে দায়ী করা যায়? গ্রন্থকারকে এখানে সিরাজের প্রতি অত্যন্ত সদয় দেখা যাচ্ছে তাঁর সত্য ভাষণের মাধ্যমে।

২৩। গ্রন্থকার এখানে সত্য কথাই বলেছেন এবং সিয়ারেও অনুরূপ মন্তব্যই আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, সিয়ার রচয়িতা গোলাম হোসেন তবতবায়ি ছিলেন শওকত জঙের শিক্ষক ও উপদেষ্টা কিন্তু শওকত জঙ এ ব্যাপারে তাঁর উপদেশ মতো কাজ করেন নি।

হচ্ছে রাজ্য শাসনের অঙ্গ— তিনি তিন প্রহর সময়ের মধ্যে পাগলের মত চৌদ্দ ক্রোশ পথ অতিক্রম করেন। সেই বছরের মহররম মাসের বুধবার দিন শেষে শওকত জঙ শত্রু পক্ষের অগ্রগামী বাহিনীর সম্মুখে মিনহারি নামক স্থানে উপস্থিত হন। তখন সিরাজ— উদ— দৌলা ছিলেন অগ্রগামী বাহিনী থেকে দুই কি তিন ক্রোশ পিছনে। তিনি এই সংবাদ পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং অগ্রগামী বাহিনীকে বহন ও [অন্যান্য] সাহায্য দানের জন্য কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তাঁর ভাগ্য উন্নতির শিখরে থাকার কারণে তা শওকত জঙের পরাজয়ের বার্তা বহন করে আনে। ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

সুদীর্ঘ মঞ্জিল অতিক্রম করার কারণে শওকত জঙের সহযাত্রী অধিকাংশ সৈন্য তাঁর সঙ্গে আসতে না পারা সত্ত্বেও তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েই সিরাজ-উদ-দৌলার বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। [স্বাভাবিক অবস্থায়] তিনি সারাক্ষণই নিজেকে একজন প্রেমিকার মত আড়ম্বরপূর্ণ অবস্থায় সুসজ্জিত করে রাখতেন। এই বাহ্যিক আচরণের বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে এবং তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গের সুসামঞ্জস্য ও উৎকৃষ্ট সুবিন্যস্ততার অভাব ছিল না বলে তিনি পূর্ণ বিক্রমে সামরিক তীব্রতার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন এবং তিনি নিজ হস্তে অতীব স্থৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গীরা ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁদের পক্ষে থেকে কিছুই অনাকাঙ্ক্ষিত না রেখে যুদ্ধে প্রচণ্ড সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর অতি উত্তম সৈনিকদের অন্যতম শেখ জাহান ইয়ার প্রাণঘাতী আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবং অন্যেরা তরবারি ও তীরের প্রাপ্ত আঘাত পেয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করেন।

এদিক থেকে [সিরাজ-উদ-দৌলার] একদল বীর সৈনিক যেমন, মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান, আসালত খান, মীর মোহাম্মদ কাজিম খান, ওমর খানের পুত্র দিলীর খান প্রমুখ শৌর্য ও পৌরুষের পরিচয় দিয়ে আহত ও আঘাতপ্রাপ্ত হন। ইতোমধ্যে বন্দুকের একটি গুলি এসে শওকত জঙের কপালে আঘাত হানার ফলে ভোগের অবস্থায় উপনীত তাঁর জীবনের নবীন বৃক্ষ মৃত্যুর প্রবল বাত্যায় পতিত হয়[২৪] এবং তরবারির আঘাত থেকে রেহাই প্রাপ্ত তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীরা তাঁর মৃতদেহ বহন করে পুর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঠিক সংবাদ অবগত না হওয়ার কারণে সিরাজ-উদ-দৌলা সেদিন সন্ধ্যাকালে অশ্বারোহণে শওকত জঙের সন্ধানে বের হয়ে পড়েন এবং রাত্রি শেষে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। দোস্ত মোহাম্মদ খানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর শিবিরে অবতরণ করেন। যুদ্ধে একটি তীরের আঘাতে দোস্ত

২৪। মূল ফারসি পাঠ ঃ 'দর ইন্ আস্না গৌমি আয্ তফান্নক বর শফিকত-ই-শওকত জঙ রাসিদাহ্ নিহাল-ই-উমরাশ কেহ্ করিব ব-সন্নে - ই- নিশাত রাসিদাহ্ বুদ আয্ সর্ সর্ তনদ বাদ আজল আয্ পা দর আমাদ' (در این اثناء گومي از تفنک برشفیقت شوقتجنگ رسیده نهال عمرش که قریب بسن نشاط رسیده بود از صر صر تند باداجل از پا در آمد) ="In the meantime, a bullet from the gun hit him on the temple and the young plant of his life, which had attained the age of enjoyment, fell own on account of the boisterous wind of death'. ভাষা এখানে কবিত্বপূর্ণ।

মোহাম্মদ খানের একটি দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। সেই সময়ে যুদ্ধকালে বন্দী হেদায়েত আলী খানের পুত্র নকী আলী খান[২৫] ও হাকিম বেগকে সিরাজ-উদ-দৌলার সম্মুখে আনয়ন করা হয়।

অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর প্রভাত কাল উপস্থিত হলে শওকত জঙের পরিণতি অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে সিরাজ-উদ-দৌলা অশ্বারোহণে পুর্ণিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন এবং পথিমধ্যে পর পর সংবাদ পাওয়ার ফলে শওকত জঙের মৃত্যুর সঠিক সংবাদ তিনি অবগত হন। পুর্ণিয়া থেকে আনুমানিক বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত সরনিয়া নামক স্থানে সিরাজ-উদ-দৌলা অবতরণ করেন। মোহন লালকে এর আগে রাজা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। এখানে তাঁকে অসংখ্য উপঢৌকন প্রদান করা হয়। তাঁকে শওকত জঙের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও পুর্ণিয়ার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য [সেখানে] প্রেরণ করা হয়। সিরাজ-উদ-দৌলা নিজে সেই স্থান থেকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বিজয়ের পরে ভোজপুরের জমিদার পাহ্‌লোয়ান সিংহ ও বিহার সুবার বিভিন্ন জমিদারসহ রাজা রামনারায়ণকে প্রভূত উপঢৌকন ও সম্মানসূচক খিলা'ত এবং তাঁদের প্রত্যবর্তনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত কলকাতা ও পুর্ণিয়ার এই দুই যুদ্ধে মহান বিজয়ের পর সিরাজ-উদ-দৌলার ঔদ্ধত্য ও আত্মশ্লাঘা, গর্ব ও আত্মম্ভরিতা সহস্র গুণে বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে বাল্যকাল থেকে তাঁর আচরণে যে রুক্ষতা ও বাক্যে যে কর্কশতা ছিল এখন তা পরিপূর্ণতা পায় এবং তা এমনভাবে পায় যে, যে সব আমির-ওমারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কামনা করেন তাঁদেরকে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর প্রাসাদের তোরণে চোপদারদের আসনে বসে অপেক্ষা করতে হয়। কেউ যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্মান পেতেন তবে তাঁকে তাঁর সম্মান বিসর্জন দিয়ে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার মধ্যে সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট যেতে হত। এমন একদিন ছিল না যেদিন তিনি সম্মানার্হ ব্যক্তিদের প্রতি অসম্মান ও অপমানজনক আচরণ করেন নি।

বাঙলায় আগমনের পর থেকেই হাকিম বেগের পুত্র গোলাম আলী [বেগ] সিরাজ-উদ-দৌলার পিতামহ ও পিতৃব্যদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মানজনক আচরণ পেয়ে আসছিলেন। তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার উভয় দুটি সামরিক অভিযানেই তাঁর সহযাত্রীও ছিলেন। সেই সময়ে সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ প্রদর্শন ও তাঁকে

২৫। সৈয়দ নকী আলী খান ছিলেন সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবতবায়ির কনিষ্ঠ ভ্রাতা।। তাঁর সম্বন্ধে মোজাফফরনামাতে (য. না. ৬৯ পৃঃ) আছে ঃ "Mirza Habib Beg and Ali Naqi Khan, the son of Hedayel Ali Khan, who had stood firm and refused to incur the disgrace of flight, were killed. Their fault was that they refused to fight when in the field and did not ply their weapons before the enemy." অথচ এখানে বলা হয়েছে যে, তাঁরা বন্দী হয়েছিলেন। সিয়ারের পরবর্তী বর্ণনায় দেখা যায় যে, বিশেষ কারণে সিরাজ-উদ-দৌলা এই দুইজনকে মুক্ত করে যেখানে খুশি চলে যেতে বলেছিলেন।

অনেক পারিতোষিক প্রদান করেন। কিন্তু [শেষ অভিযানের] পরদিনই তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে পদচ্যুত করা হয়। সফর মাসের মাঝামাঝি সময়ে হাকিম বেগের মুর্শিদাবাদে আগমনের পর তাঁর অন্যান্য পুত্রসহ তাঁকে মুর্শিদাবাদ থেকে আজিমাবাদে বহিষ্কার করা হয় ও তাঁকে বন্দী করার জন্য তিনি আজিমাবাদের শাসন কর্তাকে কড়া পত্র লিখেন। পরলোকগত আল্লাহ্ ইয়ার খান ও অন্যরা ছিলেন মরহুম মহাবত জঙের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলার মাতামহ। তাঁদেরকে সর্বপ্রকার অসম্মানের সঙ্গে পদচ্যুত করা হয়। জমা'দারদের মধ্যে অনেকেই শওকত জঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি যথেষ্ট বিশ্বস্ততার পরিচয় প্রদান করেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের কাছে পূরণের অসাধ্য দাবির কথা বলে ও লজ্জাজনক আচরণ করে তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ব্যবহার করেন; তিনি তাঁদের সবাইকে তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষোভপূর্ণ করে তুলেন। তিনি সাধারণ আমির-ওমারাদের উপহাস ও অবমাননা করাতে এবং মোহন লালের উপর অধিক আস্থা স্থাপনে নিয়োজিত থাকেন।[২৬] প্রতিদিন তিনি মোহন লালকে উচ্চতর পদে উন্নীত করতে থাকেন। তিনি রায় রায়ান উমিদ রামকে পদচ্যুত করেন। দীর্ঘকাল ধরে উমিদ রাম বাঙলার খালিসা [ভূমির] দিওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর কাজ সুচারুরূপে ও সততার সঙ্গে করছিলেন। সিরাজ-উদ-দৌলা মোহন লালের পিতৃব্য জানকী রায়কে রায় রায়ান উপাধি দ্বারা ভূষিত ও দিওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে কলকাতা থেকে এই মর্মে মানিকচাঁদের[২৭] পত্র আসে যে, ইংরেজরা জাহাজ ও যুদ্ধের সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্যের বন্দর থেকে কলকাতা অধিকার করার অভিপ্রায়ে এসেছে। যদি কলকাতা ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে আগের মত বাণিজ্য করতে দেওয়া হয় তবে তারা অনুগত ও আজ্ঞাবহ থাকবে। যদি তাদের এই শর্ত গ্রহণ করা না হয় তবে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে। তাঁর আগেকার বিজয়ের কারণে সিরাজ-উদ-দৌলা অহঙ্কারের মদে মত্ত ছিলেন। তিনি ফিরিঙ্গীদের দাবি কোনো মতেই মেনে নিতে সম্মত না হয়ে মানিক চাঁদের নিকট উত্তরে লিখলেন, "ইংরেজদের জানা উচিত যে, তাদের কাছে কলকাতা ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। তারা যদি কলকাতার

২৬। রিয়াজ, সিয়ার, মোজাফফর নামা ইত্যাদি সমসাময়িক অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়।

২৭। এই মানিক চাঁদ সম্পর্কে সিয়ার রচয়িতা যথার্থই বলেছেন (সিয়ার-ই, ২য় খন্ড, ১৯২ পৃঃ) ঃ

"This Governor was a man, presumptuous, arrogant, destitute of capacity, and wholly without courage, as it did appear evidently enough at Bardeavan, when he fled with all his might, on seeing Aaly-verdy-qhan surrounded [all] on a sudden by the Marhattas".

কয়েক মাইল দূরে কোনো দেয়াল বা পরিখা নির্মাণ না করে থাকতে চায় তবে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যদি তারা কলকাতা অধিকার করতে চায় তবে আপনি প্রতিহত করবেন।"[২৮]

হস্তী উপঢৌকনসহ ফিরিঙ্গীরা অতি যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের দাবি পেশ করলেও তারা নিরাশ হয় এবং তারা কলকাতা নদী-বন্দরে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে আসে ও যুদ্ধ শুরু করে দেয়।[২৯] তাদের এই যুদ্ধের সংবাদ সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট ক্রমাগত পৌঁছতে থাকলে তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান সৈয়দ উল্লাহ্ খানকে কয়েকজন সেনাপতিসহ মানিক চাঁদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। একই বছরের রবিউল-আখির মাসের ১১ তারিখ (জানুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রিঃ) ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরাজ-উদ-দৌলা নিজেই মুর্শিদাবাদ থেকে হুগলী অভিমুখে অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল যে, তীব্র যুদ্ধের পর মানিক চাঁদ শত্রুদের কাছে কলকাতা সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং গোওয়াছি ঘাট নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কলকাতা থেকে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত এ স্থানে একটি মাটির দুর্গ ছিল। মুর্শিদাবাদ থেকে ষোল ক্রোশ দূরে অবস্থিত আগার দ্বীপ নামক স্থানে পৌঁছে ফিরিঙ্গীদের কর্তৃক হুগলী অধিকার, ফখর-উৎ-তেজার-এর গৃহ ধ্বংস, লুটতরাজ ও তাতে অগ্নিসংযোগ, সেখানকার অধিকাংশ গৃহে [অনুরূপ অত্যাচার] এবং জিয়া উল্লাহ্ খানের যুদ্ধ করার পর পলায়নের সংবাদ পেয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা অস্থির হয়ে পড়েন। সেখান থেকে চার মঞ্জিল অতিক্রম করে হুগলী থেকে বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত আম্বোয়া নামক স্থানে এসে তিনি পৌঁছেন এবং সেখানে সেনাবাহিনীর ছাউনি ফেলেন। এর পরে তিনি বিধ্বস্ত হুগলীতে এসে উপস্থিত হন। ফিরিঙ্গীরা এই স্থান পরিত্যাগ করে [আগেই] চলে গিয়েছিল। সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে দশ হাজার অশ্বারোহী, আট হাজার পদাতিক সৈন্য এবং সেই সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীও ছিল। সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এবং সেনাবাহিনীর উপর আস্থার অভাবে তিনি অস্থিরতায় ভুগছিলেন। তাঁর দুর্ব্যবহারের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সৈনিকদের অভিযোগ ছিল। [এসব কারণে] তিনি অগ্রসর হবেন কি হবেন না, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

২৮। একজন স্বাধীন নৃপতি হিসাবে সিরাজ-উদ-দৌলার এই উত্তর যথাযথই ছিল। তাঁর বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিরা যদি নিজেদের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য সমগ্র দেশের স্বার্থকে বিকিয়ে না দিতেন তবে ইংরেজ কোম্পানি তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারত না। কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়াবার জন্য সারাদেশে তেমন কেউ যে ছিল না, সেই বোধ সিরাজ-উদ-দৌলার ছিল বলে মনে হয় না।

২৯। ইউসুফ আলী খানসহ সমসাময়িক প্রায় ঐতিহাসিকই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষেই কথা বলছেন বলে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একটি বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান একটি স্বাধীন দেশের নৃপতির সঙ্গে যে আপত্তিজনক ব্যবহার করেই চলেছে সেটি কারো কাছেই অন্যায় বলে মনে হচ্ছে না এবং তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই স্বাধীন দেশের রাজার দোষ দেখার ব্যাপারে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ করার কাজে অত্যন্ত সজাগ থাকেন বলে দেখা যাচ্ছে। এর পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না বোধ হয়।

অবশেষে তিনি কলকাতা অভিযানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই শহর হুগলী নদীর অপর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত থাকার কারণে তিনি আম্বোয়া নামক স্থানে নদী অতিক্রম করেন। এবং দুই-তিন মঞ্জিল অতিক্রম করে কলকাতা থেকে চার ক্রোশ দূরত্বের মধ্যে এসে উপস্থিত হন। তাঁর সেনাবাহিনীর দিওয়ান রাজা দুর্লভরামকে একদল সৈন্যসহ অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে প্রেরণ করেন। সেদিন অপরাহ্নে রাজা দুর্লভরাম কলকাতার চারদিকে অবস্থানরত ফিরিঙ্গী সৈন্যদের সঙ্গে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন।[৩০] পরদিন প্রভাতে সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত আমির চাঁদের বাগানে অবতরণ করেন এবং তাঁর সেনাবাহিনী বাগানের নিকটবর্তী স্থানে ছাউনি ফেলে। ইতোমধ্যে প্রায় সন্ধ্যাকালে খাজা পেট্রোস নামক একজন আরমান কয়েকজন ফিরিঙ্গীসহ সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আসেন।[৩১]

সিরাজ-উদ-দৌলা সীমাহীন কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে ছিলেন বলে সেই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তাঁদের (প্রতিপক্ষের) মনকে শান্ত করার প্রচেষ্টায় তাঁদের বিদায় নেওয়ার অনুমতি দেন।

শান্তি স্থাপিত হবে এই ধারণায় সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর সমুদয় সেনাবাহিনীসহ অবহেলার স্বপ্নে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। চতুর ফিরিঙ্গীরা শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আসার সুযোগে এখাণে আগমন ও নিষ্ক্রমণের পথ আগেই জেনে নিয়েছিল। রাত্রি প্রভাতের এক ঘন্টা আগে [সিরাজ-উদ-দৌলার] দুর্দশাগ্রস্ত সৈন্যদলের উপর চরম দুর্দশার মত ফিরিঙ্গীরা হঠাৎ চড়াও হয় ও বন্দুকের গুলিবর্ষণ করতে থাকে। সেই সময়ে প্রবল বাতাস ছিল এবং সেই কারণে আবহাওয়া এত অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে যে, কাছের মানুষও দেখা যায়নি

৩০। ইংরেজদের সঙ্গে রাজা দুর্লভরামের এই যুদ্ধের বর্ণনা সিয়ারে নেই।

৩১। এই শান্তির প্রস্তাব ছিল ইংরেজদের চালাকি এবং এই সুযোগে সিরাজের অবস্থান সম্পর্কে তারা গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রথম থেকেই ইংরেজরা যুদ্ধংদেহি ভাব গ্রহণ করে পুনরায় কলকাতায় এসেছিল এবং সিরাজের সেনাপতিদের বিশেষ করে মীর জাফর ও দুর্লভরাম এবং জগৎশেঠের সঙ্গে যে গোড়া থেকেই তাদের যোগসাজশ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সিয়ারের মোটামুটি নিরপেক্ষ বর্ণনায় দেখা যায় যে, প্রথম যুদ্ধের সময় মীর জা'ফরের গোপন নির্দেশে তাঁর কর্মকর্তা আমির বেগ ইংরেজ মহিলাদের গোপনে ইংরেজ অফিসারদের নিকট নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন।

এবং এ কারণে শত্রুকে বন্ধু থেকে পার্থক্য করা যায়নি।[৩২] ফলে খাজা আবদুল হাদি খান, দোস্ত মোহাম্মদ খানের মত অনেক সেনাপতি এবং সেই সঙ্গে অনেক পশু আহত ও নিহত হয়। দুর্বলতা ও অবসন্নতা সৈন্যদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। সিরাজ-উদ-দৌলা সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং সামান্য কিছু সৈন্য তাঁর সঙ্গে ছিল বলে তিনি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানটিকে নিরাপদ স্থান মনে করে সেখান থেকে বের হননি। যারা এই স্থানের চারদিকে ছিল তারা কামান ও বন্দুকের গুলীতে আহত হয়। ফিরিঙ্গীরা অসীম সাহস ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুই-তিন ক্রোশ ভূমি পদব্রজে অতিক্রম করে এবং কুঠি ইমারতে প্রবেশ করে। আবহাওয়া পরিষ্কার হলে যেসব সেনাপতি ফিরিঙ্গীদের পিছনে ধাওয়া করেছিলেন তাঁরা সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট ফিরে আসেন। [ঘটনার আকস্মিকতায়] তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। তিনি সেনাপতিদের অভিমত জানতে চান। তাঁর অন্যায় আচরণের জন্য ছোট বড় সবাই তাঁকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন বলে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। তাঁদের মধ্যে অধিখাংশ সেনাপতি দৃঢ়তা ও সম্মানের পক্ষে ছিলেন। তার অর্থ ছিল যুদ্ধ এবং খ্যাতি ও মর্যাদাকে রক্ষা করা। আবার অন্যরা সংযত

৩২। ডক্টর আবদুস সোবহান কর্তৃক প্রদত্ত মূল ফা. পাঠ ঃ 'দর আন ওয়াকত কিসরত বযম [বুদ] ওয়া ব- ইন জিহাত কুদরাত -ই- হাওয়া ব-মুরতবাহ বুদ কেহ শখস -ই- করিব মুরঈ নামিশুদ' ও মুখলিফ আজ মুয়াফির। (در ان وقت کثرت بزم [بود] و باینجهت کدورت هوا بمرتبه بود که شخص قریب مرئی نمیشد وخالف از موافق ممنمیر نمسد) পাঠের এ. এ. এর অনুবাদ (১২৭ পৃঃ) "At that time, because of the dense crowd, the air has become so much foul that nothing could be seen and an enemy could not be distinguished from a friend." এই পাঠ অর্থহীন বিশেষ করে শুরু থেকে 'dense crowd' পর্যন্ত। কারণ এখানে 'dense crowd' অর্থাৎ 'ঘন জনতা'র কোন প্রতিশব্দ মূল ফারসি পাঠে নেই। খুব সম্ভব এখানে 'যম' শব্দের সঙ্গে উপসর্গ যোগ করে 'বযম (بزم) শব্দকে 'crowd' অর্থে ধরে নিয়ে 'বুদ' (بود) শব্দকে যোগ করে ('বুদ' শব্দ মূল পাঠে নেই) এ পাঠ দিয়েছেন। ফা. 'বযম' (زم) শব্দের অর্থ, 'A banquet, entertainment, assembly, convivial meeting society। আরবি 'বযম' (بزم) শব্দের অর্থ ঃ Biting with the front teeth, making a camel etc.? ফা. 'যম'(زم) শব্দের অর্থ 'cold; a biting wind, a wound। খুব সম্ভব এখানে 'যম' শব্দের সঙ্গে (ب) উপসর্গ যোগ করে 'বযম' (بزم) শব্দ করা হয়েছিল এবং এর পরে 'বুদ' (بود) শব্দ ছিল না। ফলে এ পাঠের অর্থ ছিল, 'তখন প্রবল বাতাস ছিল .....।' এর সমর্থন পাওয়া যায় মোজাফফর নামার বর্ণনা (য. না, ৭২ পৃঃ)। সেখানে আছে ঃ " As it was winter season the atmosphere up to one *prahar* of the day was so charged with darkness, dust (smoke) and night dew (mist) that none could see his neighbours." এ সম্পর্কে সিয়ারে আছে। (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২২২ পৃঃ)। "...luckily for him there fell such a fog and mist...and it occasioned such a darkness, that two men though even so close could not distinguish each other." - এর অর্থ হয়, 'সে সময়ে প্রবল বাতাস ছিল এবং সে কারণে আবহাওয়া এত অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে যে .....। ডক্টর আঃ সোবহান কর্তৃক সংযোজিত বুদ শব্দ বাদ দিলে মূল ফারসী পাঠ- (در ان وقت کثرت بزم باین....وقت)-এর অর্থ হয়, সেই সময়ে প্রবল বাতাস ছিল এবং সেই কারণে আবহাওয়া এত অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে যে.....।

হওয়ার পক্ষে রায় দেন এবং তার অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ করার শক্তির অভাব। সিরাজ-উদ-দৌলা কাপুরুষের মতো দ্বিতীয় মত গ্রহণ করে পলায়ন করার লজ্জাকে বেছে নেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে [অশ্বা]রোহণ করেন এবং অত্যধিক ভীতির কারণে বাদ্য ও ঢাক বাজাতে নিষেধ করে দেন। তিন কি চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর তিনি যাত্রা বিরতি করেন। এখানে কয়েকজন ইংরেজ সন্ধির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য আসে এবং সিরাজ-উদ-দৌলা তা লাভজনক বলেই মনে করেন। তাদের প্রস্তাব মত সমুদয় লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যার্পণ ও কলকাতাতে একটি টাঁকশাল নির্মাণের বিষয় ইত্যাদি সন্ধির ভিত্তি হিসাবে আলোচিত হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্য সবই সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যদের হাতে পড়েছিল। তারা ছিল সংখ্যায় কয়েক হাজার এবং তাদের অধিকাংশই ছিল সাধারণ সৈনিকদের শ্রেণীভুক্ত। সেই লুণ্ঠিত দ্রব্য [এমন কি পশু ও কুকুর পর্যন্ত] ফেরত না পাওয়ার কারণে [এসবের] বিনিময়ে সিরাজ-উদ-দৌলা তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হন। কয়েকজন ফিরিঙ্গীকে নিয়ে তিনি নিরাপদে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন। তাঁর সৈন্যদের মধ্যে মতানৈক্য এবং তাঁর নিজের দুর্ব্যবহারের কারণে এই পরাজয় ঘটেছিল, এ কথা জানা সত্ত্বেও তাঁর রাজত্বকাল শেষ হয়ে যাবে এই কারণে তিনি তাদের মন পরিবর্তন করার কোনো চেষ্টাই করেননি এবং অজ্ঞানতা ও অবহেলার নিদ্রা থেকে নিজেকে জাগ্রত করেননি। তিনি নিন্দনীয় কাজ করতেই থাকেন। এর ফলে উঁচু ও নিচু সবার কাছেই তিনি সমভাবে ধিকৃত হতে থাকেন। ফিরিঙ্গীরা তাদের অভিরুচি মত যে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিল তা ছিল প্রকৃতপক্ষে মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল। কিন্তু তিনি সেটিকে আলেকজান্ডারের প্রাচীরের চেয়েও সুদৃঢ় মনে করেন। তাদের বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করার কারণে তাঁর চারিত্রিক রূঢ়তা, সেনাবাহিনীর বিশেষ ও সাধারণ সৈনিক, হৃদয়বান ও নিম্নমনের ব্যক্তি সবাইকে অত্যাচার করার প্রবৃত্তি অনেক বেড়ে যায়।[৩৩] প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করার জন্য তিনি কাশিমবাজার ইংরেজদের কুঠির প্রধান মিঃ ওয়াটস ও অন্যান্য [ইংরেজকে] সঙ্গে করে এনেছিলেন। নগদ ও বস্তু মিলিয়ে তিনি তাঁদের হাতে প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য তুলে দেন। তাদের কুঠির তালিকাভুক্ত সামান্যতম গামলা জাতীয় বড়বাটি, বয়ম

৩৩। আলোচ্য গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খানসহ সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থকার যেমন করম আলী খান, গোলাম হোসেন সলিম, সৈয়দ গোলাম হোসেন তবতবায়ী সবাই একবাক্যে সিরাজ-উদ-দৌলার নিন্দা করে গেছেন। খুব সম্ভব সিরাজের যা প্রাপ্য ছিল তাই তাঁরা তাঁকে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সিরাজের লোভী ও বিশ্বাসঘাতক কর্মকর্তারা যে দিনের পর দিন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে নিজেদের স্বার্থের জন্য দেশটাকে বিদেশীর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন, সেই সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিকগণ বিশেষ কিছুই বলছেন না, বিশেষ কিছুই বলছেন না চক্রান্তকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধেও। কারণ, এইসব ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রায় সবাই কোম্পানির অর্থপুষ্ট ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, ইউসুফ আলীর বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও খাপছাড়া। এই সন্ধি ও সিরাজ-উদ-দৌলার আচরণ সম্পর্কে সিয়ারে সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে (সিয়ার ই, ২য় খণ্ড ২২০-২৩ পৃঃ)।

ইত্যাদি অতি সাধারণ বস্তুরও কোনো পার্থক্য না করে রাজকোষ থেকে অর্থ প্রদান করা হয়। এই সময়ে মোহনলাল[৩৪]

আদিষ্ট হয়ে পুর্ণিয়া থেকে [মুর্শিদাবাদে] আগমন করেন। দুরারোগ্য ও মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তাঁর চাকুরি করার ক্ষমতা ছিল না। সিরাজ-উদ-দৌলা নিজেই তাঁকে দেখতে যান এবং তাঁকে নিজগৃহে এনে নগরের সমুদয় চিকিৎসককে সমবেত করে দিনরাত চিকিৎসার জন্য তাঁর পাশে থাকার ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রতিদিন তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে করতে তাঁকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'মাহি ও মোরাত্তব' প্রতীক ও অলঙ্কৃত পালকি ব্যবহার এবং [তাঁর গৃহদ্বারে] 'নওবতের' অনুমতি প্রদান করেন।

এই সবই ছিল সাতহাজারী মনসবদারি আমিরদের বিশেষ সম্মানের প্রতীক। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমুদয় কার্য নির্বাহের সামগ্রিক দায়িত্ব—তা সার্বিক বা আংশিক হোক—তিনি মোহনলালের উপর ন্যস্ত করেন। সমুদয় আমির-ওমারা, উঁচু-নীচু ব্যক্তি তাঁর মাতামহের আমলের কর্মকর্তা ও মুৎসুদ্দিদের মোহনলালের আজ্ঞাবহ হতে সিরাজ-উদ-দৌলা আদেশ প্রদান করেন এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে ঔদ্ধত্য ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ করেন। কপট আচরণের ব্যাপারে মোহনলাল ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর শাসনকালে এমন কোনো অপমান ছিলনা যা তাঁরা পাননি এবং এমন কোনো অবমাননা ছিল না যা তাঁদের কাছে পৌছেনি। অনেক আমির-ওমারা ছিলেন যাঁরা এর আগে তাঁর (মোহনলাল) নাম পর্যন্ত শুনেননি। এবং অনেক সন্ত ও সৈয়দ ছিলেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা বোধ করতেন। কিন্তু তাঁদের সবাইকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর নিকট উপস্থিত হতে হত এবং অনেকেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করতে লাগলেন। এই কাফেরের শাসন জনগণের কাছে যথেষ্ট কষ্ট ও দুঃখ বয়ে আনে।

এই সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল যে, হুগলীর নিকটবর্তী অঞ্চলে কুঠি নির্মাণকারী ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজরা বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। প্রকাশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের

৩৪। রাজা মোহনলালের উপর প্রায় সবাই ক্ষিপ্ত ছিলেন। সিয়ারের ইংরেজি অনুবাদক ও টীকাকারের মতে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ) : "This Mohon lal had made a present of his sister to Seradj-ed-doulah which sister was a true Indian beauty, small and delicate. For nothing is more common amongnt Indians, when they want to give an idea of a surpassing beauty, than to say, *when sheato pan you might have seen through her skin......*

ভাব দেখালেও সিরাজ-উদ-দৌলা ফরাসিদের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন।[৩৫] সেই সৈন্যদের যুদ্ধ করার শক্তির উপর ভরসা না থাকায় তারা ফরাসডাঙ্গা পৌঁছলে ফরাসি অধিনায়ক তাদেরকে কুঠির বাইরে রেখে দেয়। ইতোমধ্যে ইংরেজরা ফরাসিদের চেয়ে দুই গুণ যুদ্ধজাহাজ নিয়ে ফরাসডাঙ্গার জলসীমায় এসে উপস্থিত হয়। কলকাতা ও ফরাসডাঙ্গা স্থাপিত হওয়ার পরে এই পর্যন্ত ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হয়নি। তদুপরি [এদেশে আগত] সমুদয় ইউরোপীয়দের উপর তাদের কর্তৃপক্ষের আদেশ ছিল যে, তারা যেন ভারতে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হয়। অতএব ফরাসিদের প্রধান একটি ক্ষুদ্র [সেনা] বাহিনী নিয়ে প্রতিরোধ করতে বাধ্য হন। সপ্তাহকাল ধরে দিনে ও রাতে তাদের গোলন্দাজ বাহিনীর মধ্যে এমন তীব্র যুদ্ধ হয় যে, গোলাবারুদের ধুয়ায় বাতাস কাল হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ফরাসি পক্ষের অনেক সৈন্য নিহত হয় এবং তাদের সমুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে অবশেষে বাধ্য হয়ে ফরাসি প্রধান তাদের কুঠির চূড়ায় ইংরেজদের নিশান উত্তোলন করেন। ফরাসিদের দুর্বলতা ও পরাজয়ের এই অবস্থা দেখে ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। ফলে যুদ্ধ ও হত্যার অবসান ঘটে। এই বিজয়ও ইংরেজদের সাহস ও শক্তির কারণ রূপে দেখা দেয় এবং সিরাজ-উদ-দৌলার জন্য বয়ে আনে অধিকতর ভয় ও আতঙ্ক। এ কারণে সিরাজ-উদ-দৌলা সেনাবাহিনীর বখশি মীর মোহাম্মদ জাফর খান ও দিওয়ান দুর্লভরামকে কয়েক হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের মাঝামাঝি স্থানে ও রাস্তার পাশে এবং খরপা নদীর তীরে প্রেরণ ও সেখানে অবস্থানের আদেশ প্রদান করেন। কিছুদিন পরে [কোন] বাহ্যিক কারণে এই দুইজনকে ডেকে পাঠান এবং কোনো অপরাধ না করলেও[৩৬] মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানকে অপমান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

৩৫। গ্রন্থকার সিরাজকে যতটা অপদার্থ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন দেখাতে চেয়েছেন গ্রন্থকারের এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি ততটা নির্বোধ ছিলেন না। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে একা পেরে উঠছেন না দেখে তিনি ফরাসিদের নিজের দলে টানতে চেয়েছিলেন। অথচ গ্রন্থকার সিরাজ সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাঁর মধ্যে কোনো গুণ ছিল বলে দেখা যায় না। খুব সম্ভব কোনো ব্যক্তিগত কারণে এ ধরনের বিষোদগার।

৩৬। গ্রন্থকারের এই বর্ণনা যে অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট তা বোঝা যায় মোজাফফর নামার বর্ণনা (য. না.-৭২ পৃঃ) থেকে। সেখানে আছে ঃ "Mir Md. Ja'far Khan and Raja Durlabh Ram at the time when they were at Agradwip, on hearing that Siraj-ud-daula was sunk in pleasure and complelety negligent, and seeing the fame of the valour of the English spreading in all quarters of the sky (*lit.* horizon), seized the opportunity and sent an envoy most secretly, to the English sahibs, professing their friendliness and instigating them to make war on the Nawab......Siraj-ud-daula on hearing of the disloyatty called him to his presnce and dismissed Mir Md. Ja'far Khan along with Khadim Husain Khan and deprived Raja Durlabh Ram of the trust even more than before." । অথচ গ্রন্থকার বলছেন, কোনো অপরাধ না থাকলেও ইত্যাদি।

তাঁকে পদচ্যুত করে খাজা আবদুল হাদি খান তুরানীকে মীর বখশির পদে নিযুক্ত করেন। প্রকাশ্যে মীর মোহাম্মদ জা'ফরকে মুর্শিদাবাদ নগর ছেড়ে চলে যেতে বললেও ভিতরে ভিতরে সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁকে শেষ করার পরিকল্পনা করেন। মীর মোহাম্মদ জাফর খান নিজের মান ও ইজ্জত রক্ষার জন্য তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও কয়েকজন বন্ধু বান্ধবসহ নিজ গৃহে মরা বা মারার জন্য সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন।[৩৭] উঁচু ও নিচু, আমির-ওমারাহ্ সকল লোকের সঙ্গে সিরাজ-উদ-দৌলার বিবাদ ও শত্রুতা সব সীমা অতিক্রম করে গেল। কাজে কাজেই নিয়তির দাবা খেলোয়াড় দাবার ছকে নতুন রঙের প্রলেপ দান করেন এবং সময়ের শত্রুতা তার চরম দুর্দশার বালিকে ছেঁকে তাঁর অবশিষ্ট ভাগ্যের মাথায় নিক্ষেপ করেন।[৩৮]

এর দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ এই সময়ে ইংরেজদের প্রতিনিধি ও ফিরিঙ্গী মিঃ ওয়াট [কলকাতা] কুঠির প্রতিশ্রুত দ্রব্যাদি আদায় করার জন্য মুর্শিদাবাদে ছিলেন। সেইসব দ্রব্য হস্তগত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একেএকে, এমনকি সিরাজ-উদ-দৌলাকে না জানিয়ে কলকাতা যাত্রা করেন। এর কারণ অনুসন্ধানে রত থাকা কালে সিরাজ-উদ-দৌলা হঠাৎ সংবাদ পান যে, [কর্নেল ক্লাইভ] সাবিতজঙ্গ ফিরিঙ্গী একদল ফিরিঙ্গী অনুসারী (সৈন্য)সহ নৌকাযোগে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে যাত্রা করেছেন এবং [ইতোমধ্যে] কাটোয়া অতিক্রম করেছেন। এই বিপদের কথা শুনে সিরাজ-উদ-দৌলা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং চরম বিভ্রান্তির মধ্যে এই বিপদের মোকাবেলা করার কথা চিন্তা করেন। মোহনলাল ছিলেন তাঁর কাছে সুদৃঢ় স্তম্ভের মত। (নবাব) নিজে অগ্রসর হওয়ার আগে তাঁকে অগ্রগামী হিসাবে প্রেরণ করেন এবং একই বছরের রমজান মাসের সাতাশ তারিখে (জুন, ১৭৫৭ খ্রিঃ) যুদ্ধ করার জন্য তিনি নিজেই প্রাসাদ থেকে নির্গত হন। নগর থেকে সাত ক্রোশ দূরে তিনি যাত্রা বিরতি করেন এবং মীর মোহাম্মদ জাফর খানকে নিজের দলে আনতে চেষ্টা করেন। পূর্বে মীর

৩৭। এই প্রসঙ্গে সিয়ারের বিস্তারিত বর্ণনা (সিয়ার-ই, ২য় খন্ড ২২৮-২৯ পৃঃ) দ্রঃ। সেখানে মীর জা'ফরের বিশেষ দূত আমির বেগের মাধ্যমে মীর জাফর, জগৎ শেঠ, দুর্লভরাম, উমি চাঁদ প্রমুখ সমুদয় বিদ্রোহীর লিখিত চুক্তিনামা ইংরেজদের কাছে প্রেরণের কথা আছে। যথা " "His agent went so far as to show the very paper, signed by all the malcontents, by which they promised to stand by him against Siraj-ud-daula. He then added these words: "Do you, Gentlemen, but put yourselves in motion, and come to some skirmishes with Siraj-ud-daula; and we engage after that to do his business amongst ourselves effectively. By a small motion of yours, you shall put it in our power to rid ourselves and the world of the oppressions and violences of the tyrant."

৩৮। সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কে গ্রন্থকারের সব উক্তিই এখানে একদেশদর্শী বলে দেখা যাচ্ছে এবং প্রতিপক্ষ যে রাজদ্রোহিতার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল গ্রন্থকার সেই সম্বন্ধে একটি কথাও বলছেন না দেখে তাঁর মন্তব্য খুব গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না।

মোহাম্মদ জা'ফর খানের সঙ্গে তিনি যে অশোভনীয় আচরণ করেছিলেন সেই জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। মীর মোহাম্মদ জাফর খানের বন্ধুত্বের বিনিময়ে নবাব তাঁর সব শর্ত মেনে নিতে সম্মত হন। সিরাজ-উদ-দৌলা সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে দাউদপুর নামক স্থানে মীর মোহাম্মদ জাফর খানের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। সিরাজের বারবার অনুরোধ, জোর ও মিনতি করা সব সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর চাকুরি পরিত্যাগ করা ও বিবাদের পরিসমাপ্তির পর বকেয়া বেতন গ্রহণ করার শর্তে সিকরি গলি থেকে চলে যাওয়া সব জমাদারকে একত্র করে তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট আসেন।[৩৯]

পরদিন ৫ই শওয়ালের (জুন, ১৭৫৭খ্রিঃ) প্রভাতকাল ছিল সিরাজ-উদ-দৌলার ভাগ্যের সন্ধ্যাকাল। ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করেন এবং পলাশীতে উপস্থিত হয়ে গোলা-বারুদের যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন। বিপক্ষ দলের সৈন্য সংখ্যা দুই হাজার লোকের অধিক ছিল না এবং অশ্বারোহী ও

৩৯। মূল ফা. পাঠ, 'ওয়া চুন আসরার ওয়া ইয্তিরার ওয়া ইলতেজায়ি-ই-সিরাজ-উদ-দৌলা আয্ হদ্ দর গুযাশ্ত্ মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান ব-শরত-ই-আ'দম-ই-নৌকরি ওয়া বা'দ-ই-ফারগ-ই-কযিয়া গেরেফতান-ই-যরতলব-ই-বাকি ওয়া রাফতান-ই-আয্ সিকরিগলি কুল জমা'দারনরা দর মিয়ান আওরদাহ্ নয্দে সিরাজ-উদ-দৌলা আমাদ' (وچون اصرار و اضطرار والتجاوی سراج الدوله از حددر گزشت میر محمد جعفر خان بشرط عدم نوکری و بعد فراغ قضیه گرفتن زر طلب باقی و رفتن از سکریگلی کل جمعداران را درمیان آورده نزد سراج الدوله آمد) অনুবাদ ঃ "When the persistence, perplexity and entreaty of Siraju-'l-Daulah exceeded all limits, Mir Muhammad Ja'far Khan having collected all the Jama'dars, on conditirua of resigning from service, being paid him arear of dues after the termination of the dispute and departure from Sikrigali, came to Siraj-ud-Daula." মূল ফারসি পাঠ মোটেই প্রাঞ্জল নয় এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদও তার চেয়ে কম বিভ্রান্তিকর নয়। আমরা বাংলা অনুবাদ মোটামুটি বোধগম্য করার চেষ্টা করেছি।

এই সম্পর্কে রিয়াজে (রিয়াজ-বা ২৮৯ পৃঃ) আছে ঃ "মীর জাফর কৈফিয়ৎ দেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন; কিন্তু গোপনে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন এবং ভালিয়া সেনাপতিগণ, অন্য সেনাপতিগণ ও জগৎশেঠকে দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন। পারস্পরিক প্রতিভা ও প্রতিশ্রুতি দ্বারা ষড়যন্ত্র অনুমোদিত হওয়ার পর মীর জাফর তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত আমির বেগকে পত্র দিয়ে কলকাতা পাঠান ও ইংরেজ-সৈন্য সাহায্য চান। আমির বেগ নানা প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরেজ-প্রধানদের কলকাতা থেকে পলাশী অগ্রসর হতে প্ররোচিত করেন। কর্মের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর (অর্থাৎ যখন কাজ করা উচিত ছিল তখন না করে) সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে নগর (মুর্শিদাবাদ) থেকে অগ্রসর হন। তখন হঠকারিতা ত্যাগ করে তিনি উপরোক্ত খানের (মীর জাফর) তোষামোদ করতে থাকেন এবং মহব্বত জং-এর বেগমকে পাঠিয়ে অতীতের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতিশ্রুতি ও কার্যের উপর আস্থা না থাকায় মীর জাফর তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই।"

পদাতিক মিলিয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সিরাজ-উদ-দৌলা বিপক্ষ দলের কাছাকাছি স্থানে অবস্থানরত ছিলেন এবং বিপক্ষ দলের সৈন্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত।[৪০] [এই অবস্থায়] এবং সেনাপতিদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও পূর্ণ ভীতির কারণে সিরাজ-উদ-দৌলা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যেতে সম্মত হননি এবং নিজের স্থান ছেড়ে নড়েননি।[৪০] দুই দলের মধ্যে বন্দুক-কামানের যুদ্ধ চলতে থাকাকালে একটি কামানের গোলার আঘাতে সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় বখশি ও

৪০। গ্রন্থকার শুধু সিরাজের ত্রুটি উল্লেখের জন্যই কলম ধরেছেন বলে মনে হয়। প্রধান সেনাপতি ও সেনাপতি রায় দুর্লভ ও অন্যান্যরা যে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সাদরে ডেকে আনছেন সেই সম্বন্ধে গ্রন্থকার একটি কথাও বলছেন না দেখে মনে হচ্ছে যে, সিরাজের দোষ ধরার জন্যই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, সত্যকে প্রকাশ করার জন্য নয়। এই প্রসঙ্গে সিয়ারের বর্ণনা (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃঃ) তুলনীয়। সেখানে আছে ঃ

"The Prince at the same time sent part of his forces to Palassy, under the command of Radja Dooloob-ram, to prepare an entrenched camp and every thing necessary for defence and war. That commander repaired thither, and in appearance, seemed busy in executing the orders he had received; but in fact he was only intent upon his own business; for he not only entered into a private agreement with the English, but added some articles to their treaty with Mir djaafar—qhan, whilst at the same time he was daily gaining to his party some officers amongst the troops he commanded, under promise of doing for them something according to their own wishes The same mangement was likewise practised by Mir-djaafar-qhan, who now commenced to appear at Court, but always well accompanied."

এরপরে যুদ্ধের বর্ণনায় সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৩১ পৃঃ) আছে ঃ

"All this while Mir-djaafar-qhan, the author of all these evils and troubles contended himself with standing at a distance with troops under his command, exactly like one who had come only to see the engagement, although his sole aim was to effect Siraj-ed-doula's downfall. But this was not the case with Mir-maden and a few others who were in earnest, and wished to gain victory; these were in despair on seeing that inaction. The cannon balls meanwhile fell so thick amongst them, that this officer did not dare to come to a close engagement; but yet he advanced little by little in good order and with a good countenance, till at last he and Mohon-lal arrived near the grove of Palassy, from where the English made so violent a fire. It was about three o'clock in the afternoon. It is reported that the Colonel, at sight of this, severely reprimanded some agent, who was then near his person, and said, 'that his master had promised and pledged himself, that the troops, as well as the Commanders were totally alienated from Siradj-ed-doulah, and that as soon as some engagement should take place, they would do his business effectually.'

'As, much as I can see' added the Colonel, 'the very reverse of all that is taking place'.

"The agent answered, that those that were now pressing upon him, were those corps that were attached to Siraj-ed-doulah; and that when ever these should be vanquished, the Colonel would not fail to see tokens of what he (the agent) had promised.

"And in reality the day of retribution was now come; for Seradj-ed-doulah and his fortune had now become liable to the laws of retaliation. That valorous Mir-meden, who now behaved so well in the engagement, and who to his heroical valour joined sentiments of attachment and zeal, was overset by a common-ball, whilst he was advancing and encouraging his men. This ball.....left him for dead......".

সিরাজ-উদ-দৌলার অতিশয় বিশ্বাসভাজন [সেনাপতি] মীর মদন নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পরে সিরাজ-উদ-দৌলার বিভ্রান্তি চরমে পৌঁছে এবং তাঁর আকাশচুম্বী অহঙ্কার অবজ্ঞায় পরিণত হয়। মীর মদনের মৃত্যুর পর বারবার অনুরোধ করলে মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট আসেন। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে সিরাজ-উদ-দৌলা হস্তী পৃষ্ঠ থেকে নেমে আসেন এবং মাথার পাগড়ি খুলে মীর মোহাম্মদ জা'ফর খানের পায়ের উপরে রাখেন।[৪১] তখনই আরম্ভ হয় একদিক (সিরাজের) থেকে অনুনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা এবং অন্যদিক অপমান ও অপরাধ শূন্যতার বাক্যাবলীর বিনিময়। নবাবের অনুমতি ছাড়াই মীর মোহাম্মদ জাফর খান যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই প্রত্যাবর্তন

৪১। মীর মদনের মৃত্যুতে হতভম্ব সিরাজ-উদ-দৌলা প্রধান সেনাপতি মীর জাফরকে কয়েকবার ডেকে পাঠানোর পর তিনি অনেক বিলম্বে এসে তাঁকে ডেকে পাঠানোর জন্য সিরাজকে তিরস্কার করেন। এই সম্পর্কে সিয়ারে আরও বর্ণিত আছে (২৩১ পৃঃ) ঃ

"Seradj-ed-doulah spoke to him in the humblest strain, and at last descended to the lowest supplications; he even took his turban from off his head (at least this was the report) and placed it before the general, to whom he addressed these very words : 'I now repent of what I have done; and availing myself of those ties of consanguity which subsists between us, as well as of those rights which my grandfather Aaly-verdy-qhan, has doubtless acquired upon your gratitude, I look up to you, as to the only representative of that venerable personage: and hope therefore, that, forgetting my past trespasses, you shall henebforward behave as becomes a Seyd, a man united in blood to me, and a man of sentements, who conserves a grateful remembrance of all the benefits he has received from my family, I recommend myself to you, take eare of the conservation of my honour and life".

করেন। তাদের রীতি অনুসারে ফিরিঙ্গীরা মধ্যাহ্নের দিকে আক্রমণ করে। সিরাজ-উদ-দৌলা সেই স্থানে ছায়ার নিচে নিজের অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বামদিকে তাঁর সেনা দলের সঙ্গে অবস্থানরত ছিলেন মীর মোহাম্মদ জাফর খান। নবাব তাঁকে দ্বিতীয় বারের মতো ডেকে পাঠান। নবাব তাঁকে যতই আহবান করেন তত অল্প প্রতিক্রিয়াই তাঁর (মীর জা'ফর) মধ্যে দেখা যায়।[৪২]

৪২। অন্তত এখানে গ্রন্থকার কিছুটা সত্য কথা বলেছেন বলে দেখা যায়। মীর জাফরের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড ২৩২-৩৩ পৃঃ) আছে ঃ "This affecting speech had no effect on Mir—djaafer-qhan, who finding that the occasion for which he was looking out this long while, was now at hand, thought only of availing himself of it; so far—was he from forgetting what indeed he ought to have forgotten. Treason having already taken possession of his heart, he coldly answered, that the day was now drawing to its end; and there was no time for an attack. Send a counter order to the troops that are advancing, said he; recall those engaged; and tomorrow, with the blessings of God, I will join all the troops together, and provide for the engagement.

"Seradj-ed-doulah observed, that they might be attacked by the enemy in the night. This also the general took upon himself to provide against, and he promised that the enemy would not form a night attack."

মোজাফফরনামাতেও পলাশীর যুদ্ধের প্রায় অনুরূপ বর্ণনাই আছে এবং করম আলী খান অন্তত এই যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু সত্য কথা বলেছেন বলে দেখা যায়। সেখানে (ম. না. ৭৫-৭৬ পৃঃ) আছে ঃ

"...............the English entrenched themselves in the park of Plassey, and busily engaged in firing on their enemies. Siraj-ud-daula, placing Raja Mohan Lal and Mir Madan in the van of his army, himself remained in the rear as the support on the two.......Mir Md. Ja'far Khan and Husain Khan, at a distance of one kos on the left hand of the Nawab, stood as spectators. Maharaja Durlabh Ram, also took post two kos away from our army, on the right hand of the English army and looked at the spectacle. The *bahlias* (musketeers) grieving that the sardar was not attending to the business, stood in ranks in one corner on the battle-field and were butchared by the fire of the enemy."

একই গ্রন্থে মীর জাফর সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে (৭৬ পৃঃ) ঃ

"However, Mir Madan who made great efforts to push to the front, was hit by a cannon—ball in his stomach and he died. Nawab Siraj-ud-daula, losing heart at the death of Mir Madan, called Mir Md. Ja'far Khan with a thousand entreaties before himself and taking off the turban from his head said that he must defend the honour of the Nawab. Mir Md. Ja'far Khan out of his treacherous design, said "Only four *gharies* of the day remain. The English troops are in great power and spirit. Signs of weakness and defeat are visible among our soldiers.......It is advisable and our final safety depends on this that you should now order our guns to be brought back from the field and placed within the entrenchment so that our men may pass the night at ease. Tomorrow we shall see what can be done."

তিনি (নবাব) তখন মোহনলাল, খাজা আবদুল হাদি, মীর মোহাম্মদ কাজিম খান ও রাজা মানিক চাঁদকে ডেকে পাঠান।[৪৩] তাঁরা রণক্ষেত্রে নিজ নিজ স্থানে শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য অবস্থানরত ছিলেন। সেই অবস্থায় শত্রুর আক্রমণের মুখে শত্রুকে ছেড়ে স্থান ত্যাগ করার বিরুদ্ধে তাঁরা অনেক আপত্তি জানালেও সিরাজ-উদ-দৌলার কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। নিরুপায় হয়ে তাঁরা তার কাছে আসেন। ফিরিঙ্গীদের আক্রমণের কথা জানা সত্ত্বেও তাঁকে এই সময়ে আহবান করার

৪৩। মীর মদনের আকস্মিক মৃত্যুর পর মীর জাফরের কুমন্ত্রণায় হতবুদ্ধি নবাব যে তাঁর অনুগত সেনাপতিদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেই বর্ণনা আলোচ্য গ্রন্থে নেই। প্রকৃত পক্ষে ইউসুফ আলী কর্তৃক প্রদত্ত এই যুদ্ধের বর্ণনা অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ ও অত্যন্ত বেশি রকমের পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি সিরাজের দোষকেই দেখিয়েছেন, সত্যকে নয়। করম আলীর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি সম্পূর্ণ এবং সিয়ারের বর্ণনা অনেক বিস্তারিত। মোজাফফরনামায় এই যুদ্ধের বর্ণনায় আছে (য. না.-৭৬ পৃঃ) ঃ

"As soon as the Nawab's soldiers turned back and his guns were taken back, the English sahibs, being strengthened at heart, placing their guns in front, began to fight [again]. Siraj-ud-daula, on seeing the signs of weakness and defeat among his troops, told them, high and low, about the good qualities of Alivardi, and said, "The effect of handing Bengal over to the English will be nothing but ruin and loss. Fight bravely now, that you may not be ranked among cowards'. But as the retreat had utterly destroyed the order of the troops, none listened to his words. In a short time all the soldiers turned their faces away from the battle field."

এই সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ) বর্ণিত আছে ঃ "By this time Mohonlal, who had advanced with Mir Medon, was closely engaged with the enemy; his cannon was served with effect: and his infantry having availed themselves of some covers and other grounds were pouring a quantity of bullets in the enemy's ranks. It was at this moment he received the order of falling back, and of retreating. He answered that this was not a time to retreat; that the action was so far advanced, that whatever might happen, would happen now; and that should he turn his head, to march back to camp, his people would disperse, and perhaps abandon themselves to an open fight.' Siradj-ed-doulah, on this answer, turned towards Mir-djaafer-qhan, and the latter coldly answered, 'That the advice he had proposed was the best in his power; and that as to the rest His Highness was the master of taking his own resolutions'. Seradj-ed-doulah, intimidated by general's coldness, and overcome by his own fears and apprehensions, renounced his own natural sense and submitted to Mir— djaafur-qhan's pleasure; he sent repeated orders, with pressing messages, to Mohon—lal; who at last obeyed, and retreated from the post to which he had advanced."

এই সম্পর্কে সিয়ারে আরও বর্ণিত আছে (২৩৩ পৃঃ), "This retreat of Mohon-lal's made a full impression on his troops. The sight of their general's retreat damped their courage; and having at the same time spied some parties which were flying (for they were on the complot), they disbanded likewise, and fled, every one taking example from his neighbour; and as the flight now had lost all its shame, whole bodies fled although no one pursued; and in a little time the camp remained totally empty. Seradj-ed-doulah informed of the desertion of his troops, was amazed; and fearing not only the English he had in his front, but chiefly the domestic enemies he had about his person, he lost all firmness of mind. Confounded by that general abandonment, he joined the runaway himself; and after marching the whole night, he the next day at about eight in the morning arrived at his palace in the city."

জন্য মীর মোহাম্মদ কাজেম খান সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। সেনাপতিগণকে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য বিদায় দিয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা নিজে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে হতবুদ্ধি হয়ে রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন। এই অবস্থায় ফিরিঙ্গী সৈন্যরা কাছে এগিয়ে এসে অনবরত গোলা নিক্ষেপ করে নবাবের অনেক সৈন্যকে ধরাশায়ী করে। সমগ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য বিরাজমান হয় ও দলে দলে সৈন্য পালাতে থাকে। মানিক চাঁদ, খাজা আব্দুল্ হাদি খান ও মীর মোহাম্মদ্ কাজেম খান শত্রুর কাছাকাছি স্থানে অবস্থানরত থেকে বন্দুক যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজেদেরকে কোনো মতেই রেহাই দেননি। কিন্তু প্রাণপণে সাহায্যের আবেদন করলেও এ পক্ষ থেকে কেউ তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে যায়নি। নিরুপায় হয়ে তাঁরা নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করে সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে মিলিত হন।

দিন শেষ হতে যখন আনুমানিক দুই ঘন্টা বাকি তখন তাঁর হাজার হাজার সৈন্যের মধ্যে সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট চার কি পাঁচশতের অধিক সৈন্য উপস্থিত ছিলনা। তিনি মনকে পরাজয়ে সমর্পণ করে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। রাতের কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে যে অল্পসংখ্যক লোক [তখন পর্যন্ত] তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের অধিকাংশই তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কয়েকটি হাতি, কিছু সৈন্য ও কিছু মশালচি ব্যতীত আর কেউ তাঁর সঙ্গী ছিলনা। সারারাত অনবরত ভ্রমণ করে তিনি যখন [পরদিন] প্রভাতে তাঁর গৃহের সামনে উপস্থিত হন তখন তাঁর কোনো এক সঙ্গীর পাদুকা পায়ে দিয়ে তিনি হাতির পিঠ থেকে নেমে নিজ গৃহে প্রবেশ করেন।

সেদিন ছিল শওয়াল মাসের ষষ্ঠ দিন। তিনি তাঁর মূল্যবান সম্পদ, মণি মুক্তা ও স্বর্ণসহ মোহনলালকে ভগবান গোলায় প্রেরণ করেন[৪৪] এবং তিনি নিজে সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কুৎরুব পাখির মত ছটফট করতে থাকেন। তিনি এক সময় ভাবলেন আজিমাবাদে চলে যাবেন, আবার পুর্ণিয়া যাওয়ার কথাও চিন্তা করেন। অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, পলায়ন করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ় সংকল্প হন। তাঁর সেনাবাহিনীর নিকট থেকে কোনোও সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হলেও তিনি রাজা দুর্লভ রামকে সৈন্যদেরকে সেই দিন পর্যন্ত বকেয়া বেতন পরিশোধের আদেশ দেন। উঁচু-নিচু যে কোনো লোক (কর্মচারী) সেদিন তাঁর (নবাব) রাজকোষে

৪৪। এই ঘটনার কথা সিয়ার, মোজাফফরনামা বা রিয়াজে নেই।

গেলে তাদের পদবি অনুসারে শত, হাজার ও লক্ষ টাকা [বকেয়া বেতন] পেয়ে যায়। এই গ্রন্থকার বখশি [খাজা] আবদুল হাদি খানের মুখে [পরে] শুনেছিল যে, সেই রাতে এই ভাবে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছিল।[৪৫]

মীর মোহাম্মদ জাফর খান পলাশীর যে গৃহে আস্তানা গেড়েছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর সেখান থেকে অগ্রসর না হয়ে সেই গৃহেই রাত্রি যাপন করেন। পরদিন তিনি সাবিত জঙ্গ ফিরিঙ্গীর (কর্নেল ক্লাইভ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

৪৫। এই ঘটনা সম্পর্কে মোজাফফর নামাতে (য. না., ৭৬-৭৭ পৃঃ) আছে ঃ

"The Nawab waited for an hour with some *Khawases* but seeing the supremacy and power of the English, necessarily took to flight towards Murshidabad. Entering the palace of Mansurganj, he summoned Jagat Seth and laid the head of humility at his feet, and told him, "Turn the English back by taking on yourself the payment of any amount for which the English may agree to make peace." Jagat Seth who was not composed in mind about Siraj, and out of his friendship with Mir Md Jafar Khan, was his enemy, agreed to the request in the presence of the Nawab; he secured the release of Ranjit Rai, his wakil who was in confinement, took his conge, and sent Kundhmal Munshi as his envoy to Mir Md. Ja'far Khan to say, 'Why are you delaying to coming to the capital?'

এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় রিয়াজে (রিয়াজ-বা, ২৯০-৯১ পৃঃ) আছে ঃ "মোটের উপর পরদিন সকালে মোতাবেক ৫ই শাওয়াল বাদশাহ্ দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে একদিকে ইংরেজ সৈন্যরা পলাশী থেকে এবং অন্যদিকে সিরাজ-উদ-দৌলা দাউদপুর থেকে কামানের গোলাবর্ষণ দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মীর মোহাম্মদ জাফর খান তাঁর বাহিনীসহ বাম দিকে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। সিরাজ তাঁকে নিকটে আসবার জন্য তলব করা সত্ত্বেও মীর জাফর নিজ স্থান ত্যাগ করলেন না। ঘোরতর যুদ্ধের সময় যখন হত্যাকান্ড চলছে ও সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যবাহিনীর বিজয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে, সেই সময় অকস্মাৎ একটি কামানের গোলার আঘাতে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান মীর মদনের পতন হয়। এই দৃশ্য দেখে সিরাজের সৈন্যদের মনোভাব পরিবর্তিত হয় ও গোলন্দাজরা মীর মদনের লাশ নিয়ে শিবিরে চলে যায়। তখন বেলা দ্বিপ্রহর; শিবিরের লোকেরা পলায়ন করতে আরম্ভ করে। নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা তখনো যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন; সেই সময় শিবিরের অনুচরগণ পলায়ন করে দাউদপুর থেকে অন্যদিকে চলে যায় এবং সৈন্যরাও ক্রমে পলায়ন করতে থাকে। সূর্যাস্তের দু'ঘন্টা পূর্বে সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যরা পলায়ন করে; এবং সিরাজও আর প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পলায়ন করেন। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত মনসুরগঞ্জে পৌঁছে তিনি কোষাগারের দ্বার খুলে সমস্ত অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। কিন্তু অত্যধিক উদ্বেগে সেখানে থাকতে না পেরে সন্ধ্যার পর সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর বেগম, সন্তান এবং মালমাত্তা, মূল্যবান মণি মুক্তা ও প্রচুর মুদ্রাসহ এক নৌকায় উঠে পুর্ণিয়া ও আজিমাবাদের দিকে রওয়ানা হন।

মুর্শিদাবাদে সিরাজ-উদ-দৌলার অবস্থান সম্পর্কে সিয়ারের বর্ণনায় (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৩৪ পৃঃ) আছে ঃ

"Seradj-ed-doulah abandoned by his troops and deserted by his whole Court, resolved to retain some people at least about his person; and he ordered that whoever had any demand upon the treasury, should be immediately satisfied. Numbers immediately thronged into in, some for their arears, and some for advances to help themselves out. Some others likewise, under a variety of pretences, crowded into it, and received as much as they pretended to; for orders had been given to reject no man; so that during the whole night the treasary was full of people, who took money on every pretence they could devise, and carried it home; but none remained with him (Siraj) notwithstanding that liberality; for he had mistaken the time when it was necessary, not only to abslairn from acquiring gold and wealth, but also to spend that already hoarded up at home. He had never thought of being liberal, nor ever had entertained any thoughts about restraining either his tongue or hand from injuring and oppressing people;"

এবং বাঙলা রাজ্য প্রশাসনের ব্যাপারে [তাঁরা] অনেক আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁদের দুইজনের মধ্যে প্রতিশ্রুতি বিনিময় ও চুক্তি হয়। যেদিন প্রভাতে সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর প্রাসাদে ফিরে এসেছিলেন সেদিন সন্ধ্যায়ই এই মহান খান[৪৬] তাঁর নিজ সেনাবাহিনীসহ রাজধানীতে ফিরে আসেন। যে পবিত্র কোরান স্পর্শ করে তিনি [মীর জা'ফর] সিরাজ-উদ-দৌলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করবেন না বলে শপথ করেছিলেন, সেই পবিত্র কোরানসহ সিরাজ-উদ-দৌলা রাজারাম ও মীর মোহাম্মদ কাজেম খানকে মীর মোহাম্মদ জাফর খানের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা তাঁর কাছে তাঁদের বক্তব্য পেশ করলে তিনি [তাঁদের মাধ্যমে] সিরাজ-উদ-দৌলাকে বলেন, "আজ পর্যন্ত আমার দ্বারা কোনো অন্যায় কার্য করা হয়নি। এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, সবই আপনার দুষ্কর্ম ও কুপরিচালনার কারণে। এখন থেকে আমার দ্বারা কোন অন্যায় করা হবে না। তবু সমুদয় কর্তৃত্ব আমার কাছে ছেড়ে দিতে হবে।"

৪৬। মূল ফা. পাঠ ঃ 'আন খান-ই-ওয়ালা শান' آن خان والا شان 'that exalted Khan'। বিচিত্র মানুষ বলে মনে হচ্ছে গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খানকে। ষড়যন্ত্রকারী, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক মীর জা'ফরের এসব গুণের কথা একবারও উল্লেখ না করে তাঁকে মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান বাহাদুর, মহান খান ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করতে শুরু করেছেন। এই ইতিহাস রচনার ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ে যে রকমই হোক না কেন, সিরাজের ব্যাপারে যে গ্রন্থকার একদেশদর্শী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মীর জাফরকে তোষামোদ করার কারণ অবশ্য ছিল। নবাব মীর কাসেমের অনুগামী গ্রন্থকার মীর কাসেমের পরাজয়ের পর এলাহাবাদ থেকে মুর্শিদাবাদ আসার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন এবং তাঁর ইংরেজ বন্ধু ডক্টর ফুলারটন (Dr. Fullerton)-এর বারবার সুপারিশে মীর জাফর তাঁকে ১৭৬৪-৬৫ সালে মুর্শিদাবাদে আসতে অনুমতি প্রদান করেন। অতএব মীর জাফর ও ইংরেজ উভয়ের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞ থাকার কথা।

সংক্ষেপে, সেই বছরের শওয়াল মাসের ৭ তারিখে (জুন, ১৭৫৭ খ্রিঃ) সিরাজ-উদ-দৌলা পলায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪৭] রাত্রির প্রথম ভাগ অতিক্রান্ত হলে তিনি রথে আরোহণ করে বিশ্বস্ত হরকরাগণ ও অন্য একজনকে সঙ্গে করে ভগবান গোলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শুজাত আলী খান সাহেব এই সংবাদ পেয়ে সেই সময়ে মীর মোহাম্মদ [জাফর] খান বাহাদুরকে তা জানিয়ে দেন। মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান

৪৭। সিরাজ-উদ-দৌলার পলায়ন সম্পর্কে মোজাফফর নামার বর্ণনা (য. না.-৭৭ পৃঃ) নিম্নরূপ ঃ

"Next day, Siraj-ud-daula turned out of the house nearly five hundred women, with food and dress that they had with them. That day upto midnight he stayed at Mansurganj, and there after decided to go to Patna.

"At midnight getting into a *rath*, with his wife Lutf-un-nisa Begam and his three years old daughter, and one eunuch, he set out for Bhagwangola to take a boat there. Owing to the darkness of the night, the trouble and excess of mud, the *rath* of the Begam became separated from his. So he reached Bhagwangola alone and there getting into a boat called *Bhaolia* with the eunuch, decided to go by the route of Malda, because on the [other] way at Rajmahal, the brothers of Mir Md. Ja'far Khan lived. Arriving at Malda, he told the eunuch to go to the daragah of the baskets of mangoes [which used to be sent to the Nawab] and tell him to send the footmen under him to him. That merciless infidel, put the eunuch in prison and planned to arrest Siraj and wait on Mir Md. Ja'far Khan with such a present. But God willed it otherwise; the eunuch escaped came back to his master and told him all the facts.

"Siraj seeing dangers coming to him from all sides, indistraction had no help but to turn the reins towards Rajmahal. Alighting in the out skirts of Rajmahal, he revealed his identity to a faqir living there thinking him to be a man of God, but that dark-hearted man, at once sent the news to Mir Daud, the brother of Mir Md. Ja'far Khan, who came with some men and seized Siraj-ud-daula. From Murshidabad, Mir Muhammad Sadiq Khan, the son of Mir Md. Ja'far Khan, himself came by forced marches against Siraj, placed him in a cart (*chakra*) with every disgrace and took him to Murshidabad; on that very day he ordared Muhammad Beg todespatch him."

এই সম্পর্কে সিয়ারে আছে (২৩৯ পৃঃ) ঃ "This unfortunate Prince, already overtaken by the claws of destiny, was arrived at the shore opposite to Radj-mahl where he landed for about one hour, with intention only to dress up some *Kichri* for himself and for his daughter, as well as for his women, not one of whom had tasted food for three days and nights. It happened that a fakir resided in that neighbourhood. This man whom probably he had either disobliged or oppressed in the days of his full power, rejoiced at this fair opportunity of glutting his resentment, and of enjoying a revenge. He expressed a pleasure at his arrival; and taking a busy part in preparing some victuals for him, he meanwhile sent an express over the water, to give information to the Prince's enemies, who were actually rummaging heaven and earth, to find him of out. Immediately on this advice of Shah-dana's (for such was that man's name), Mir- Cassem and Mir- daood crossed the water, and having got him surrounded with their armed men, they had the pleasure of becoming masters of his person, as well as of his family and jewels".

তৎক্ষণাৎ সিরাজ-উদ-দৌলার অনুসরণে লোক প্রেরণ করতে চাইলে খাদেম হোসেন খান তাঁকে বলে যে, এই কথা রাতের বেলায় রাষ্ট্র হয়ে গেলে নগরে গোলমাল হতে পারে। তাতে মীর মোহাম্মদ জাফর খান এই কাজ পরদিন প্রভাত পর্যন্ত স্থগিত রাখেন।

১১৭১ হিজরী সনের ৭ই শওয়াল তারিখে (জুন, ১৭৫৭ খ্রিঃ) মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান বাহাদুর সিরাজ-উদ-দৌলার প্রাসাদে গমন করেন এবং বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর জামাতা মীর মোহাম্মদ কাসেম খানকে একদল সৈন্যসহ সিরাজ-উদ-দৌলার অনুসরণে প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র রহমতে যদি সময় পাই তবে মীর মোহাম্মদ জাফর খানের বর্ণনা শেষ করে শীঘ্রই মীর কাসেম খান সম্বন্ধে বর্ণনা পেশ করার আশা রাখি।

নিরাশার মরুভূমিতে ভ্রমণকারীর অবস্থা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ভগবানগোলাতে আগমনের পর তিনি কয়েকজন স্ত্রীলোক ও তিন-চারজন ভৃত্যসহ একটি নৌকায় আরোহণ করে পুর্ণিয়ার পথে যাত্রা করেন এবং মালদহে পৌঁছেন এবং সেখানে এক রাত্রি অবস্থান করে পুর্ণিয়া যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তিনি আজিমাবাদের পথে অগ্রসর হন। নিয়তি ও ভাগ্যের প্রতিনিধিরা তাঁর ভ্রমণ ও ভাগ্যের তরী নিরাশার কূলে ভিড়িয়েছিল বলে আকবর নগর (রাজমহল) পৌঁছার পর অল্প পানির কারণে তাঁর নৌকা চড়ায় ঠেকে যায়। নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী শাহ্‌দান নামক এক দরবেশের নিকট এই সংবাদ পাঠিয়ে অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র নৌকা সংগ্রহের জন্য সিরাজ তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এর আগে সিরাজ-উদ-দৌলার রাজত্বকালে শাহ্‌দান একবার অপমানিত হয়েছিলেন। দরবেশদের রীতি অনুযায়ী [বিপন্ন] সিরাজকে সাহায্য না করে শাহ্‌দান মীর দাউদের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র ইপ্সিত রত্নকে পাওয়ার আশায় মীর দাউদ নদী তীরে আসেন এবং ভাগ্যহত লোকটিকে বন্দী করে একদল রক্ষীসহ মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন।[৪৮]

৪৮। প্রায় অনুরূপ বর্ণনা রিয়াজেও (রিয়াজ-বা, ২৯১ পৃঃ) আছে। রিয়াজের মতে এই দরবেশের নাম দানশাহ্ পীরজাদাহ্। তিনি প্রকাশ্যে সিরাজ-উদ-দৌলার জন্য আহারের বন্দোবস্তে নিজেকে ব্যস্ত দেখালেও গোপনে মীর দাউদকে সিরাজের আগমন সম্পর্কে সংবাদ প্রেরণ করেন।

সিরাজ-উদ-দৌলার অবস্থা সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৩৯ পৃঃ) আছে ঃ

"Seradj-ed-doulah, sensible that the day of retribution and retaliation had overtaken him, descended to the lowest supplications; but they only served to render him an object of taunt and reproach to a set of men, to whem, but a few days before he might have disdained to speak; everyone of them he entreated to obtain a pension for him, and a corner of grounds where he might live forgotten; but no one heard him.

পথিমধ্যে সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে নবাব মীর মোহাম্মদ কাসেম বাহাদুরের সাক্ষাৎ ঘটে। এবং তিনি সিরাজকে সঙ্গে করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন।[৪৯] মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান বাহাদুরের নির্দেশ অনুসারে মীর কাসেম খান সিরাজ-উদ-দৌলাকে তাঁদের এক পুরাতন বন্ধু খাজা রহমত উল্লাহ্‌র গৃহে কিছু সময় রাখেন এবং তার পরে তাঁকে মীর মোহাম্মদ জাফর খানের আগের বাড়িতে নিয়ে আসেন।[৫০]

সিরাজ-উদ-দৌলা এই পৃথিবীর রাজত্বে তৃপ্ত ছিলেন না এবং [কোনো কিছুতেই তিনি] সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর অত্যধিক অত্যাচারের মাত্রা, অত্যধিক রক্তপিপাসুতা ও সীমাহীন গালিগালাজপ্রিয়তা এই দেশের সব সিংহের পিত্তকে পানিতে পরিণত করতে পারত। আজ তাঁর মাথার উপরে ছিল একটি টুপি, (পরিধানে) ছিল পায়জামা এবং

৪৯। এই সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৩৯-৪০ পৃঃ) আছে ঃ

Mir-Cassem-qhan, who had got Lootf-en-nessa in his power, engaged her partly by threats and partly by promises, to disclose where was her casket of jewels; and this casket the value of which could not he computed but by lacs, fell in his hands of course.

৫০। সিরাজ-উদ-দৌলার শেষ সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে রিয়াজে (রিয়াজ-বা, ২৯১-৯২ পৃঃ) আছে ঃ "....মীর মুহম্মদ কাসিম খান তাঁকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যান। মীর মোহাম্মদ জাফর খান তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। পরদিন ইংরেজ প্রধানদের পরামর্শে ও জগৎশেঠের জেদাজেদিতে তিনি তাঁকে হত্যা করেন এবং এই অত্যাচারিত শিকারের লাশ হাতির পিঠে হাওদায় করে নগর পরিক্রম করান। পরে নওয়াব মহব্বত জং-এর সমাধি সৌধে খোশবাগে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। কিছুদিন পরে সিরাজ-উদ-দৌলার ছোট ভাই মীর্জা মেহদি আলী খানকেও অত্যাচার করে হত্যা করে ও সিরাজের পাশে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।"

এ সম্পর্কে মোজাফফর নামাতে আছে, (য. না.-৭৮ পৃঃ) ঃ His body was placed on an elephant and paraded through the town with ignominy. When the elephant arrived at the house of his mother, she rushed out with bare feet and head and flung herself at the feet of this beast, but the servents of Khadim Husain Khan forocibly turned her back. When the elephant arrived below the terrace (*balakhana*) of Khadim Hussain Khan, he out of shamelessness, threw a *than* of cloth on the corpse for shroudig it at burial.

"When Siraj's dead body was at last thrown into the market square and nobody turned to wash and bury it, Mirza Zainul-'abidin baqawal, keeping in view the oldness of this family and preparing for his own death, bathed the murdered man's body, put it in a coffin and buried it by the side of Alivardis tomb. His reign was for fifteen months.

"Mir Md. Jafar Khan becomes the ruler: the English gain control over Beagal.

"After the distribution of the territory and tressures [of Siraj] Mir Ja'far and Miran divided between themselves the wives and concubines of the late Nawab. Although both father and son, under the stimulation of brute passion, asked for the hand of the honoured wife of Siraj-ud-daula, namely Lutf-un-nisa Begam, she declined and sent this reply, 'having ridden an elephant before, I can not now agree to ride an ass;"

সিরাজ-উদ-দৌলার জীবনের শেষ সময়ের কথা সম্পর্কে সিয়ারে (সিয়ার-ই, ২য় খণ্ড, ২৪১-৪২ পৃঃ) যে বর্ণনা আছে তা নিম্নরূপ ঃ

"Such was the man (Miran), who first heard of Siradj-ed-doulah's arrival; for his father was then fast asleep at noon-day. He immediatcly ordered him into confinement, near his own apartment, and proposed to a large company

কাঁধে ছিল একটি কম্বল। সেই অবস্থায় পৃথিবীর মানুসের কাছে তিনি এই ধরণীর একটি ক্ষুদ্র কোণ মাত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁর এই বিধ্বস্ত দেহ বিরাট বিক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ালে তিনি তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণের সুযোগ আর পাননি এবং মহা প্রতিশোধ গ্রহণকারী বিচারকের আদেশে মৃত্যুর তরবারি তাঁর সব আকাঙ্ক্ষার শিকল ছিন্ন করে দেয়। মীর মোহাম্মদ জা'ফর খান বাহাদুরের আদেশে তাঁকে মহাবত জঙের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়। এই ঘটনা এগারশ একাত্তর হিজরী সনের ১৫ই শওয়াল তারিখে ঘটে। তাঁর রাজত্বকাল দুর্যোগপূর্ণ হলেও এক বছর তিন মাস ছিল।[৫১]

অবশ্যই চির স্থায়িত্ব বিশ্বের প্রভুর জন্য।

---

of friends, then present, to go directly, and dispatch that unfortunate. This was peremtorily refused by them, to a man, not one of them choosing to sully his hands with so ugly an action, and some even complained of the proposal. At last, one Mahmedy-beg accepted the commission, which so many had rejected with indignation. This man who had been bred in the house of Seradj-ed-doulah's father and in that of Aaly-vardy-qhan's consort, who made his fortune by marrying an orphan virgin, in whose education that unfortunate had taken pleasure; this was the man who undertook the murder; this was the man who accepted the horrid commission: and two or three hours after the fugitives arrival, he setout to dispatch him. Siradj-ed-doula had no sooner cast his eyes upon that miscreant, than he asked, whether he was come to kill him? And the other having answered in the affirmatives the unfortunate Prince, on the confession, despaired of his life. He humbled himself before the Author of all mercies, asked pardon for all his past conduct, and then turning said his murderer, "They are not then, (broke he with a passionate tone of voice), they are not satisfied with my being ready to ratire into some corner, there to end my days upon a pension; (here he paused a while, and, as in recollecting something, he added)-No-they are not—I must die to atone for Hossein-cooli-qhan's murder. He had no time to say more for at these words the butcher smote him repeatedly with his sabre.....the Prince sunk on the ground, but with these words in his month : 'Enough—that is enough—I am done for.—Hossein-cooli-qhan's death is revenged'. On uttering these words, he fell on his face, returned his soul to its Maker, and emerged out on this valley of misries, by wading through his own blood.....

"Such was the end of Seradj-ed-doulah."

৫১। গ্রন্থকার হতভাগ্য সিরাজ-উদ-দৌলার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর চুলচেরা বিচার করেছেন এবং তাঁর প্রতি গ্রন্থকারের ঘৃণার শেষ যেন নেই। অথচ যে লোকটি সারা জীবন ধরে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং সেই বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের সাময়িক স্বার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিয়েছেন সেই অমানুষ মীর জাফরের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি।

নির্ঘণ্ট

নামসূচি (উপক্রমণিকা)

অ

অওরঙ্গজেব (সম্রাট) : নয়, দশ, এগার, তের, চব্বিশ
অন্ধকূপ হত্যা : ছত্রিশ
অযোধ্যা : নয়, পঁচিশ, উনত্রিশ

আ

আউদল শাহ : ছয়
আকা বা আগা সাদেক : তেইশ
আকিল খান (নবাব) : এগার
আজম (শাহ্‌জাদা) : তের, তেইশ
আজাদ-আল-হোসায়নি : তেইশ
আজিম-উদ-দীন বা আজিম-উশ-শান (শাহ্‌জাদা) : নয়, দশ
আজিমাবাদ (পাটনা) : পাঁচ, দশ, ছাব্বিশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, তেত্রিশ
আতাউল্লাহ খান : চৌদ্দ
আফগান : উনিশ, আটাশ, উনত্রিশ
আফশার : এগার, তের
আবদুস সোবহান (ডক্টর) : সাইত্রিশ, আটত্রিশ
আমির বেগ : পঁয়ত্রিশ
আমেনা বেগম (সিরাজ জননী) : আটাশ
আলমগীর (সম্রাট) : তের
আলমচাঁদ (রায়রায়ান) : তের, চৌদ্দ
আলা-উদ-দৌলা সরফরাজ খান (নবাব) : নয়, বার, তের, উনত্রিশ
আলিবর্দী খান (নবাব) : পাঁচ, ছয়, আট, নয়, তের, চৌদ্দ, পনের, ষোল, সতের, আঠার, উনিশ, বিশ, একুশ, তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, সাইত্রিশ
আলী ইয়ার সুলতান (শুজা খানের পূর্ব পুরুষ) : এগার
আলী ইবরাহিম খান (গ্রন্থকার ইউসুফ আলী খানের জামাতা) : সাত, আট
আলীজাহ্‌ (নবাব মীর কাসেম) : সাত
আহ্‌ওয়াল-ই-আলিবর্দী খান : আটত্রিশ
আহ্‌ওয়াল-ই-মহাব্বত জঙ্গী : আটত্রিশ

ই

ইংরেজ : সাত, বিশ, একুশ, বাইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ
ইংরেজি : আটত্রিশ
ইউসুফ আলী খান (তারিখ রচয়িতা) : পাঁচ, ছয়, সাত, তের, তেইশ, চব্বিশ, আটাশ, ত্রিশ, একত্রিশ, বত্রিশ, ছত্রিশ
ইকরাম-উদ-দৌলা : বিশ, [illegible]
ইবরাহিম খান (বাঙলার [illegible]
ইরান : এগার, [illegible]
ইস্ট ইন্ডিয়া কো[illegible] [illegible] পঁচি[illegible]

উ

উড়িষ্যা : ছয়, নয়, দশ, [illegible] চৌদ্দ, পনের, সতের, আঠার, [illegible] [illegible]বিশ, ছাব্বিশ আটাশ, উন[illegible]শ, [illegible], একত্রিশ, তেত্রিশ
উমদাত-উল-মুল্ক আমির খান : চৌত্রিশ
উমিচাঁদ : বিশ, আটাশ

এ

এডিনবরা : সাইত্রিশ, আটত্রিশ
এলাহাবাদ : সাত, [illegible]ইশ
এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা : আটত্রিশ
এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ : চব্বিশ

ও

ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ : সাত, পঁচিশ

ক

কটক : পাঁচ, ছয়, দশ, বার, তের, সতের, আঠার, আটাশ, উনত্রিশ
করম আলী খান : তেইশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, ত্রিশ, একত্রিশ
কর্নেল ক্লাইভ : একুশ
কলকাতা : বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ
কাটোয়া : আঠার, একত্রিশ
কাবুল : চৌত্রিশ
কারতলব খান : এগার
কাসেম আলী : সাত
কৃষ্ণ বল্লভ : বিশ
কোরবান আলী (মহল্লা) : পঁচিশ
কোরান শরীফ : ষোল, একুশ, বত্রিশ

খ

খাদেম হোসেন খান : পঁয়ত্রিশ
খালিসা ভূমি : পাঁচ, সতের
খোরাসান : এগার

গ

গিরিয়া (যুদ্ধস্থান) : উনত্রিশ
গোলাম আলী খান (সেনাপতি) : পাঁচ, ছয়, সাত, একত্রিশ
গোলাম মোস্তফা খান (আফগান সেনাপতি) : ছয়, উনত্রিশ, তেত্রিশ
গোলাম হোসেন সলিম (ঐতিহাসিক) : তেইশ, পঁচিশ
গ্ল্যাডুইন (Gladwin) : চব্বিশ

ঘ

ঘসেটি বিবি : একুশ
ঘোড়াঘাট : সাতাশ

চ

চাকলা : এগার
চৌথ : নয়, আঠার, উনিশ

জ

জইদপুর : পঁচিশ
জগৎ শেঠ : তের, চৌদ্দ, বিশ, একুশ, আঠাশ, ত্রিশ
জয়ন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জঙ্গ : সতের, উনিশ, আটাশ, উনত্রিশ, চৌত্রিশ
জরিয়ত-উজ-জোহরা : সাত
জর্জ উডনি (George Uday) : পঁচিশ
জাজপুর : ছয়
জানকীরাম (রাজা) : উনত্রিশ, ত্রিশ
জাফর খান বাহাদুর নাসিরী নাসির জঙ্গ (নবাব মুর্শিদকুলি খান) : আট, এগার, চব্বিশ, একত্রিশ
জাহাঙ্গীরনগর : দশ
জেবুন্নেসা বা জিন্নতেন্নেসা : বার

ঢ

ঢাকা : দশ, এগার, তের, সতের, বিশ, তেইশ, চব্বিশ

ত

তকী খান (নবাব) : বার, তের
তাওয়ারিখ-ই-মহাবতজঙ্গী : সাইত্রিশ
তাযকির (ফারসি কবিতা সংকলন) : সাত, আট
তারিখ-ই-ইবরাহিম খান : সাত
তারিখ-ই বঙ্গালা ইলাহাবাদী খান মহাবত জঙ্গী : সাইত্রিশ, আটত্রিশ
তারিখ-ই-বঙ্গালাহ্ : তেইশ, ছাব্বিশ
তারিখ-ই-বঙ্গালাহ্-ই-মহব্বত জঙ্গী : পাঁচ; সাত, তেইশ, আটাশ, ত্রিশ, সাইত্রিশ, আটত্রিশ
তারিখ-ই-মহাবত জঙ্গ : সাইত্রিশ, আটত্রিশ
তুর্কী : এগার
ত্রিপুরা (রাজ্য) : তেইশ
ত্রিমোহিনী (খাল) : ছয়

দ

দাক্ষিণাত্য : নয়, দশ, এগার, সতের, আঠার
দিওয়ান : পাঁচ, নয়, দশ, এগার, বার, সতের, বাইশ, চব্বিশ, ছাব্বিশ
দিল্লী : নয়, বার, তের, পনের, চব্বিশ, পঁচিশ, আটাশ, উনত্রিশ, চৌত্রিশ
দুর্দানা বেগম (নবাব সরফরাজ খানের কন্যা) : বার, তের, তেইশ, তেত্রিশ
দুর্লভ রাম (রাজা) : একুশ, পঁয়ত্রিশ

ন

নও বাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানি (গ্রন্থ) : তেইশ
নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান শাহামত জঙ্গ : সতের
নফিসা বা নাফিসা বেগম : বার, সতের, তেত্রিশ
নাদির শাহ্ : আট, নয়, তেত্রিশ
নিজাম-উল-মুলক আসফ জঙ্গ : আঠার
নূর-উদ-দীন খান (নবাব শুজা খানের পিতা) : এগার
নূহ নবী (হজরত) : ছাব্বিশ
নোটা মিনাস (Nota Minus) : পঁচিশ

প

পলাশি : একুশ, পঁয়ত্রিশ
পাটনা : সাত, দশ, বাইশ, ছাব্বিশ, আটাশ, বত্রিশ, তেত্রিশ, সাইত্রিশ
পুর্ণিয়া : একুশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ

ফ

ফখর-উদ-দীন হোসেন খান (পুর্ণিয়া) : চৌত্রিশ
ফররুখ সিয়ার (সম্রাট) : দশ
ফরাসি : পঁচিশ
ফরো (প্রদেশ) : এগার
ফারসি : তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, সাইত্রিশ, আটত্রিশ
ফিরিঙ্গী (Farangi) : বত্রিশ
ফুলার্টন (ডক্টর) : সাত
ফ্রান্সিস গ্লাডুইন (Francis Gladwin) : চব্বিশ

ব

বঙ্গ : পঁচিশ, ছাব্বিশ
বরওয়া : ছয়
বর্গী : আঠার
বর্ধমান : পাঁচ, নয়, দশ, বার, আঠার, ছাব্বিশ, উনত্রিশ, একত্রিশ
বলদাহ্-ই-বঙ্গালাহ্ (মুর্শিদাবাদ) : ছাব্বিশ
বাঙলা : পাঁচ, ছয়, আট, নয়, দশ, এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনের, সতের, আঠার, উনিশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ

বাজিরাও : আঠার, উনিশ, উনত্রিশ
বারবাটি (দুর্গ) : আঠার, উনত্রিশ
বারান : সাত
বালাজিরাও : আঠার
বালেশ্বর : সতের, উনিশ, তেত্রিশ
বিহার : সাত, নয়, দশ, এগার, তের, চৌদ্দ, পনের, সতের, চব্বিশ, পঁচিশ, আটাশ, উনত্রিশ
বুরহানপুর : এগার
বেঙ্গল নওয়াবস গ্রন্থ (Bengal Nawabs) : আটত্রিশ
বেরার (রাজ্য) : এগার
ব্রাহ্মণ : এগার
ব্রিটিশ মিউজিয়াম : সাইত্রিশ

ভ
ভগবান গোলা : বাইশ
ভদ্রক (নদী) : ছয়
ভারত : আট, নয়, এগার, বাইশ, চব্বিশ
ভাস্কর পণ্ডিত : ছয়, আঠার, উনত্রিশ, একত্রিশ, তেত্রিশ, ছত্রিশ

ম
মজম-ই-ইউসুফি (গ্রন্থ) : পাঁচ, সাত
মর্দান আলী খান : ষোল
মসনদ : বার, একুশ, বাইশ, আটাশ, উনত্রিশ, চৌত্রিশ
মহাবত জঙ্গ (নবাব আলিবর্দী খান) : নয়, পনের, সাইত্রিশ
মানিকচাঁদ : একুশ
মারাঠা : পাঁচ, নয়, আঠার, উনিশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ, ছত্রিশ
মালদহ : পঁচিশ
মীর কাসেম খান (নবাব) : ছয়, সাত, আট, বাইশ, চব্বিশ
মীর জুমলা (সুবাদার) : তেইশ
মীর দাউদ : বাইশ
মীর মদন (সেনাপতি) : বিশ, একুশ, বাইশ
মীর মর্তুজা আলী : ষোল
মীর মোহাম্মদ জাফর খান (নবাব) : ছয়, সাত, বিশ, একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ, ছাব্বিশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ
মীর হাবিব উল্লাহ খান শিরাজী : উনিশ, তেইশ, উনত্রিশ
মীরন (মীর জাফরের পুত্র) : বাইশ, ত্রিশ
মীর্জা বাকের (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খানের জামাতা) : পাঁচ, সতের, আঠার, উনত্রিশ, তেত্রিশ
মীর্জা মোহাম্মদ : তের
মীর্জা মোহাম্মদ (নবাব আলিবর্দীর পিতা) : তের
মীর্জা মোহাম্মদ আলী (নবাব আলিবর্দী খান) : তের
মুখসুসাবাদ : নয়, দশ
মুঙ্গের : সাত
মুনশি সলিমউল্লাহ (ঐতিহাসিক) : তেইশ, ছাব্বিশ
মুর্শিদকুলি খান (দ্বিতীয়) রুস্তম জঙ্গ : তের, সতের, তেইশ, আটাশ, উনত্রিশ, তেত্রিশ
মুর্শিদকুলি জাফর খান (নবাব) : আট, নয়, দশ, এগার, বার, চৌদ্দ, পনের, আঠার, বাইশ, চব্বিশ, আঠাশ, বত্রিশ, চৌত্রিশ
মুর্শিদাবাদ : সাত, আট, নয়, দশ, বার, চৌদ্দ, পনের, সতের, আঠার, বাইশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, উনত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ, চৌত্রিশ
মেদিনীপুর : দশ
মোঘল : নয়, এগার, চব্বিশ
মোজাফফরনামা (গ্রন্থ) : তেইশ, ছাব্বিশ, আটাশ, ত্রিশ, একত্রিশ, ছত্রিশ
মোতামাদ-উল-মুলক আলা-উদ-দৌলা জাফর খান বাহাদুর নাসির জঙ্গ : এগার
মোহনলাল (রাজা) : বিশ, একুশ
মোহাম্মদ আলী রেজা : বিশ, একুশ
মোহাম্মদ ঘউস খান : ষোল
মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী : পঁচিশ
মোহাম্মদ শাহ্ (সম্রাট) : আঠার
মোহাম্মদ হাদি (মুর্শিদকুলি খান) : এগার

য
যদুনাথ সরকার (স্যার) : তেইশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, তেত্রিশ, চৌত্রিশ, আটত্রিশ

র
রওশনাবাদ : তেইশ
রঘুজি ভোঁসলা (মারাঠা রাজা) : আঠার, উনিশ, উনত্রিশ
রাঙ্গামাটি : সাতাশ
রাজবল্লভ (রাজা) : বিশ
রাজমহল (আকবরনগর) : তের চৌদ্দ, পনের বাইশ
রামপুর : সাইত্রিশ
রায় দুর্লভ (রাজা) : বিশ, একুশ, আটাশ, ত্রিশ
রিয়াজ-উস-সালাতিন : তেইশ, পঁচিশ
রুস্তমজঙ্গ (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান) : সতের
রেজা লাইব্রেরী : সাইত্রিশ
রেমণ্ড এম. (M. Ramand) : পঁচিশ

ল
লুৎফ-উল্লাহ (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান) : সতের
লুৎফুন্নেসা (সিরাজের বেগম) : বাইশ

শ
শওকত জঙ্গ (পুর্ণিয়া) : একুশ, পঁচিশ, সাতাশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ
শফি ইসফাহানি : এগার
শমশির খান (আফগান সেনাপতি) : উনত্রিশ
শাহ্ আলম বাহাদুর শাহ্ (সম্রাট) : নয়, দশ, বাইশ, চব্বিশ, পঁচিশ

শাহ্ খানম (মীর জাফরের স্ত্রী) : বিশ
শাহ্জাদা আজম : তের
শাহ্জাদা আলী গওহর : চব্বিশ
শুজা-উদ্-দীন মোহাম্মদ খান বা শুজা-উদ্-দৌলা (নবাব) : নয়, এগার, বার, তের, পনের, সতের, উনিশ, তেইশ, চব্বিশ, ছাব্বিশ, আটাশ, উনত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ
শেখ মাসুম : আঠার
শ্রীহট্ট : দশ

স
সওলত জঙ্গ : আঠার, উনত্রিশ
সফদর জঙ্গ (অযোধ্যার নবাব) : উনত্রিশ
সরদার খান (আফগান সেনাপতি) : উনত্রিশ
সরফরাজ খান (নবাব) : পাঁচ, ছয়, বার, তের, চৌদ্দ, পনের, ষোল, সতের, চব্বিশ, ছাব্বিশ, আটাশ, ত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ
সাইফখান (পুর্ণিয়া) : উনত্রিশ, চৌত্রিশ
সালার জঙ্গ : সাইত্রিশ
সিয়ার-উল-মুতাখ খিরিন বা সিয়ার : পাঁচ, তেইশ, চব্বিশ, ত্রিশ, একত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ
সিরাজ-উদ-দৌলা (নবাব) : ছয়, আট, নয়, সতের, উনিশ, বিশ, একুশ, বাইশ, চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ
সুবর্ণরেখা (নদী) : উনিশ
সৈয়দ আহম্মদ খান (সওলত জঙ্গ) : সতের, আঠার, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ, চৌত্রিশ
সৈয়দ ইমাম-উদ-দীন (ডক্টর) : চব্বিশ
সৈয়দ গোলাম-হোসেন খান তবতবায়ি (সিয়ার রচয়িতা) : পাঁচ, তেইশ, চব্বিশ
সৈয়দ মেহদি নিসার খান : উনত্রিশ
সৈয়দ রেজা খান মোজাফ্ফর জঙ্গ : ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ
সৈয়দ হাসান আশকারি : সাত
সৈয়দ হেদায়েত আলী খান : চব্বিশ

হ
হাকিম আবদুল মজিদ : পঁচিশ
হাজী আবদুল্লাহ খোরাসানি : এগার
হাজী আহমদ (আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) : তের, চৌদ্দ, পনের, সতের, উনিশ, ছাব্বিশ, আটাশ, উনত্রিশ, একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ, ছত্রিশ
হাজী মোস্তফা (Haji Mustapha) : পঁচিশ
হাজী লুৎফে আলী খান : ষোল
হাজী শফি ইসফাহানি : এগার,
হাদিকাত-উস-সোফা : সাত, আট
হাম (নূহ্ নবীর পুত্র) : ছাব্বিশ
হায়দর আলী খান (সেনাপতি) : ছয়
হায়দরাবাদ : সাত, আঠার
হায়দারাবাদ সালার জঙ্গ মিউজিয়াম : আটত্রিশ
হাসনাবাদ : সাত
হুগলী : এগার
হেনরি ভ্যান্সিটার্ট : তেইশ
হোসেন কুলী খান : উনিশ, ত্রিশ, চৌত্রিশ

নামসূচি (মূল পাঠ)

(তারকা চিহ্নিত নামগুলি পাদটীকায় আছে)

অ

অওরঙ্গজেব (সম্রাট) : ১*, ২*, ৩*, ৫*, ৬*, ১১*, ৪২*, ৮৭*

অগ্রদ্বীপ : ১৭৮

অনঙ্গভীম (রাজা) : ১২৭*

অযোধ্যা : ১৫*, ৫৭, ৫৭*, ১৪৭, ১৫২

আ

আইন-ই-আকবরী (গ্রন্থ) : ৭৭*

আউদল শাহ্ : ৭২,৭৩

আকবর(শাহ্‌জাদা) : ২*

আকবর (সম্রাট) : ২৯*, ৭৭*

আকবর কুলি খান : ৮৭, ৮৭*, ৮৮

আকবর নগর (রাজমহল) : ৮,৮*,৯, ৩১, ৫২, ৫৪*, ৮৬, ৮৭, ১১৭, ১৫২*, ১৬৫, ১৬৯

আকা বা আগা বাকের (ঢাকা নগরের) : ৬৫*

আকা আবদুল আজিজ : ১১৯

আকাবাবা (নবাব সরফরাজ খানের পুত্র) : ৩*, ১৭*, ১৪৬, ১৪৬*, ১৬৪

আ.কা. মো.যাকারিয়া (গ্রন্থকার) : ১১৪*

আকা বা আগা সাদেক (ঢাকা নগরের) : ৩২*, ৪৭*, ৬৫*

আকা বা আগা সাদেক (বলদাখালের জমিদার) : ৪৭*

আকা মোহাম্মদ সুরাটি : ৩২

আকিল খান (নবাব ও নবাব শুজা খানের পিতামহ) : ৭*, ১০*

আগার দ্বীপ : ১৭৩

আগ্রা : ১১*

আজমত উল্লাহ্ খান : ১৫২

আজম শাহ্ (শাহ্‌জাদা) : ১, ১*, ২, ২*, ৩, ৪, ২৫*, ৮৭

আজাদ-আল-হোসায়নি : ৪৭*

আজিম-উশ-শান (শাহ্‌জাদা) : ২*, ১১*

আজিমাবাদ (পাটনা) : ১১, ১২, ১৬, ১৭, ১৯, ৩০, ৩১, ৪৮, ৪৮*, ৪৯*, ৫৭, ৫৭,*, ৫৮, ৬১, ৭০, ৭১, ৭২*, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৯৫, ৯৫*, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৭*, ১১২, ১১৩, ১১৪*, ১১৫, ১১৬, ১১৬*, ১১৭, ১১৭*, ১১৯, ১২১, ১৩২, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪১*, ১৪২, ১৪৪, ১৫৪*, ১৫৫, ১৬৯, ১৭২, ১৮৫, ১৮৯

আতাউল্লাহ্ খান : ১৫, ১৫*, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯*, ৩১, ৩১*, ৫১, ৫৪, ৫৬*, ৫৮, ৬৪, ৬৪*, ৮১, ৮৪, ৮৪*, ৮৬, ৮৬*, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১*, ৯৩*, ৯৪, ৯৪*, ৯৫, ৯৫*, ১০৭, ১০৭*, ১০৮, ১১৬, ১১৬*, ১৩১, ১৩৯*, ১৪৭, ১৫২, ১৫৩*, ১৫৪, ১৫৫

আফগান : ৭৪, ৭৪*, ৭৫, ৮০, ৮১, ৮৩, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৫*, ৯৬, ৯৭*, ৯৮, ৯৮*, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৩*, ১০৬, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১২০, ১২১, ১২২, ১৩২, ১৩৫, ১৩৫*, ১৫৩, ১৫৪

আফশার : ৫*, ৬*, ৭*, ১০*

আফশারী (গোত্র) : ৩*, ১৫*

আবদুর রসিদ খান : ১০১*

আবদুর রসুল খান : ৫৭, ৫৭*, ৭৫, ৭৫*

আবদুস সালাম : ৭৭*

আবদুস সোবহান (ডক্টর) : ১২,*, ১৩*, ১৬*, ১৮*, ১৯*, ৩৫*, ৪৯*, ৫০*, ৬০*, ৬২*, ৬৩*, ৬৬*,৬৮*, ৬৯*, ৭০*, ৭১*, ৭৮*, ৮০*, ৮৩*, ৮৪*, ৯২*, ৯৩*, ৯৫*, ৯৯*, ১০০*, ১০২*, ১০৫*, ১০৬*, ১০৭*, ১০৯*, ১১০*, ১১৫*, ১১৮*, ১১৯*, ১২২*, ১২৪*, ১২৫*, ১২৬*, ১২৮*, ১৩০*, ১৩১*, ১৩৩*, ১৩৪*, ১৩৫*, ১৩৭*, ১৩৮*, ১৪১*, ১৪২*, ১৪৩*, ১৫১*, ১৫৫*, ১৫৭*, ১৫৯*, ১৬৩*, ১৬৫*, ১৬৭*, ১৭৫*

আমদহ্ : ১৩২*

আমানত শাহ্ নকদী : ৪

আমিন চাঁদ বাগান : ১৬৬

আমানিগঞ্জ : ৫১, ৫১*, ৮২, ৯৬, ৯৭, ৯৭*, ১০৩, ১০৫

আমির চাঁদ : ১৭৪

আমির বেগ (মীর জাফরের অনুচর) : ১৬৭*, ১৭১*, ১৭৪*, ১৮০*, ১৮৮*

আমেনা বেগম (আলিবর্দী খানের কন্যা) : ৩*, ৩০*, ৩৩*, ৮৬, ১১২, ১৩৯, ১৫৬*, ১৫৯*

আম্বোয়া (স্থান) : ১৭৩, ১৭৪

আয়াজ-উদ-দীন (শাহ্‌জাদা) : ২*

আরমান শাহ্ : ৭১

আর্থার হিউয়েস (Arther Hughess) : ১৬৫*, ১৬৭*

আলমগীর (সম্রাট অওরঙ্গজেব) : ১, ২, ২*, ৪, ৬, ৭, ৭*, ৮৭

আলমগীর (সম্রাট দ্বিতীয়) : ২*

আলমচাঁদ (রায় রায়ান) : ১৫, ২৫*, ২৯*, ৮৬, ১৩১

আলা-উদ-দৌলা সরফরাজ খান (নবাব) : ১০*, ১৩, ১৪, ৪৭, ৮১, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৯, ১৪৬, ১৬৫
আলিবর্দী খান (নবাব) : ১, ১*, ২, ৩, ৩*, ৪*, ৬, ৬*, ৭, ৭*, ৮, ৮*, ৯, ৯*, ১০, ১২, ১২*, ১৩, ১৪, ১৫*, ১৬, ১৭, ১৭*, ১৮, ১৮*, ১৯, ১৯*, ২০, ২০*, ২১, ২২, ২৩, ২৩*, ২৪, ২৫*, ২৬, ২৭, ২৭*, ২৮, ২৮*, ২৯, ২৯*, ৩০, ৩০*, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৩*, ৩৪, ৩৪*, ৩৫, ৩৫*, ৩৬, ৩৬*, ৩৭, ৩৮, ৩৮*, ৩৯, ৩৯*, ৪০, ৪১*, ৪৩, ৪৪*, ৪৭*, ৪৮, ৪৯*, ৫০, ৫০*, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৫*, ৫৭, ৫৭*, ৫৮, ৫৯, ৬০*, ৬১*, ৭০, ৭০*, ৭১, ৭৩*, ৭৪*, ৭৫*, ৭৭, ৭৭*, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৩*, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯০*, ৯১, ৯৩*, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৮*, ৯৯, ১০০, ১০৪, ১০৪*, ১০৫, ১০৫*, ১০৬*, ১০৭, ১০৭*, ১১০*, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৪*, ১১৫*, ১১৮, ১১৯, ১১৯*, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৫* ১২৬, ১৩০* ১৩১, ১৩২, ১৩৫*, ১৩৮*, ১৩৯*, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৭*, ১৫১*, ১৫৪, ১৫৮, ১৫৮*, ১৫৯, ১৫৯*, ১৬০*, ১৬১*, ১৬২, ১৬৩, ১৬৩*, ১৬৪*, ১৬৫*, ১৬৬, ১৬৬*, ১৮৩*
আলী ইবব্রাহিম : ১১৭
আলী আসগর কোবারা : ৯০, ৯০*, ৯২, ৯৩, ৯৩*, ১৫২
আলী কদর, মোরাত্তাবাত প্রভৃতি : ৬
আলী কবির : ৬*
আলী করওয়াল (আলীভাই) : ৬৬, ৬৭, ৬৭*, ৬৮, ৬৮*, ৬৯*
আলী কুলি খান সাফাহানী : ১৩৩
আলী কুলি বেগ : ১৩৮
আলী জাহ্ (নবাব মীর কাসিম) : ৫৯
আলী তেবার (শাহজাদা) : ২*
আলী নগর (কলকাতা) : ১৬৮
আলী মোহাম্মদ রোহিলা : ৭৭, ১৫২
আলেকজাণ্ডার : ১৪৬
আশরাফ খান : ১১*
আসালত খান : ১৭০
আহমদ খান বিঙ্গাস : ১৫৩
আহমদ নগর : ৮৭
আহমদ শাহ (সম্রাট) : ২*, ১১৪, ১৫২, ১৫৩

ই

ইংরেজ : ৪৭*, ১৬৫, ১৬৫*, ১৬৭, ১৬৮, ১৭২, ১৭৪, ১৭৪*, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৭৯*, ১৮০*, ১৮৩*
ইউরোপীয় : ১৭৮
ইউসুফ আলী খান (গ্রন্থকার) : ৬*, ১০*, ১৫*, ১৭*, ১৮*, ২১*, ২৩*, ২৭*, ৩৩*, ৪২*, ৪৩*, ৪৯, ৪৯*, ৫৯, ৫৯*, ৭২, ৮৫*, ৯৮*, ৯৯*, ১১৬*, ১২০*, ১২৫*, ১৪২*, ১৪৭*, ১৩৯*, ১৬৭*, ১৬৮*, ১৭৩*, ১৭৬*, ১৮১*, ১৮৪*, ১৮৭*
ইকরাম-উদ-দৌলা (সিরাজ ভ্রাতা) : ৩*, ৮৪, ৮৪,* ৮৫*, ৮৬*, ১৫৬, ১৫৮*
ইজ্জাজ-উদ-দৌলা (আতাউল্লাহ্ খান) ; ৮৭
ইজ্জত আলী খান : ১১৫, ১১৭, ১১৯,
ইবরাহিম (শাহজাদা) : ২*
ইবরাহিম খান : ৮৫
ইমাম হোসেন : ৯*
ইয়াসিন খান : ১৬*, ৬৩, ৬৪,
ইয়াসিন খান (মৌলভী) : ১১৭
ইরাক : ৯*
ইরাজ খান (মীর্জা মোহম্মদ ইরাজ খান দ্র.)
ইরান : ৫*, ৬*, ৭*, ১০*, ৩২*, ৪৭*
ইসমাইল খান (সেনাপতি) : ১৫৪
ইসলাম খান (সুবাদার) : ২৯*, ৬৪*
ইসলামী : ৭৫
ইসহাক খান মোতামাদ-উদ-দৌলা : ৩০
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি : ৪৯*, ৫৯*, ১৭৩*, ১৭৬*, ১৭৮*
ইহ্তিরাম-উদ্-দৌলা : ৫৮, ৫৮*
ইহ্তিশাম-উদ্-দৌলা : ৫৮, ৫৮*

উ

উইলসন (Wilson) : ১২৭*
উজ্জালন সরাই : ৪৪*
উড়িষ্যা : ৪*, ৫, ৫*, ৬*, ৮*, ১২*, ২৭*, ৩০*, ৩২, ৩৩*, ৩৪, ৩৪*, ৪২*, ৪৭*, ৪৯*, ৫৩*, ৫৬*, ৫৭*, ১১০*, ১৫১*, ১৬৫*
উমদাত-উল-মুলক আমির খান আলমগিরী : ১১৮, ১১৮*
উমিচাঁদ : ১৭৯*
উমিদরাম (রায় রায়ান) : ১৫৫

এ

এলাহাবাদ : ৫, ৬*,২৭*, ৩০*, ৩৩*, ৩৪, ৩৬*, ৪২, ৪৭*, ৪৯*, ৫৩*, ৫৬*, ৫৭*, ৫৯, ৫৯*, ১১২, ১৫১*

ও

ওমর খান : ৪০, ৪৪,৪৪*, ৪৮, ৯০, ১০৩, ১২৬, ১৭০
ওয়াট (মি.) : ১৭৯
ওয়াট্স্ (মি.) : ১৭৬
ওয়ালাদা (শাহ্জাদা) : ২*
ওয়ালিশাহি : ৪, ৪*
ওলন্দাজ : ১৬৮

ক

কটক : ৫, ৬, ৭, ৩৩, ৩৩*, ৩৪, ৩৬, ৩৬*, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৫২, ৫৬, ৫৬*, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬৩, ৭০, ৭৭*, ৮০, ৮১*, ৮৯, ৯০,

১২২, ১২২*, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৭*, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩
কদমরসুল (কটক) : ৮২*
কনসাই বা কানসাই (নদী) : ৯০, ৯০*, ৯৮, ১২৩, ১২৯, ১৩৩
কবচি (ছোট তাবু) : ১০২, ১০২*
কমর-উদ-দীন খান : ৩০*,
করম আলী খান (মোজাফফরনামা রচয়িতা) : ১*, ৪*, ১৭*, ৩৩*, ৪৭*, ৭৪*, ৮৪*, ৯০*, ৯৮*, ১০৫*, ১১৩*, ১১৬*, ১৩৭*, ১৪৩*, ১৪৭*, ১৫০*, ১৫৯*, ১৬২*, ১৬৩*, ১৭৬*, ১৮৩*, ১৮৪*
করিম-উদ-দীন (শাহজাদা) : ২*
কর্নেল ক্লাইভ সাবিত জঙ্গ : ১৮৬
কলকাতা : ৪৭*, ১৬৫, ১৬৫*, ১৬৬, ১৬৬*, ১৬৭, ১৭১, ১৭১*, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০*,
কাজেম আলী খান : ৩৫, ৩৬, ৩৬*, ১১২, ১২২
কাটাজুরি (নদী) : ৩৯, ১২৭, ১২৮
কাটোয়া : ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫০*, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৪*, ৫৫, ৬১, ৬২, ৬৬, ৬৭, ৮২, ১২১, ১৩৩, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৮*, ১৫০, ১৭৯
কাবুল : ২*
কামগার খান (বিহারের জমিদার) : ১০৮, ১১০, ১১২
কামবক্শ (শাহজাদা) : ২*
কারতলব খান (নবাব মুর্শিদকুলি খান) : ৫*, ৬*, ৮৬, ৮৬*
কারতলব খান (নবাব শুজার আত্মীয়) : ৮৬, ৮৬*
কালী কিঙ্কর দত্ত (ডক্টর) : ১*, ১৪*
কাশিম বাজার : ১৬৫*, ১৭৬
কাসেম আলী খান (আলিবর্দীর শ্যালক) : ২৯, ২৯*, ৩৫, ৩৬, ৩৬*
কাসেম খান : ১৫৩
কিকীরি (স্থান) : ৯০
কিশোয়ার খান : ১২৩
কীরাত খান : ১৪৫
কীরাত চাঁদ : ১৫৫
কুৎরব বা কুৎরিব : ৬০, ৬৩, ১০২, ১০২*, ১০৯, ১৩১, ১৪১, ১৪১*, ১৫১, ১৮৫,
কৃষ্ণবল্লভ (রাজ বল্লভের পুত্র) : ১৬৫*
কোরবান আলী খান : ২৪
কোরান শরীফ : ১০৫, ১০৫*, ১২৩, ১৮৭

খ

খরপা (নদী) : ১৭৮
খাজা আবদুল হাদি (সেনাপতি) : ১৩৪, ১৩৬, ১৬৩, ১৭৫, ১৭৯*, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬
খাজা আসম (সমসাম-উদ-দীন) : ১১*
খাজা পেড্রোস আরমান : ১৭৪,
খাদেম হোসেন খান (মীর জাফরের আত্মীয়) : ১১৪, ১১৭, ১১৯, ১৩১, ১৭৮*, ১৮০*, ১৮৯
খানাজাদ : ১১০*
খালিসা ভূমি : ১৫, ১৫*, ২৯, ৭২, ৭২*, ১২১, ১৩১, ১৭২
খিলাত : ৫৮, ৭০*, ৮৯, ১০৯, ১১৮, ১৬০
খুজিস্তা আগতার (সম্রাট জাহান শাহ) : ২*, ৫*
খোমরা খাল : ১১, ২১, ২১*
খোয়াজা সরাই : ৭৩*

গ

গউসখান : ২৪
গঙ্গা (নদী) : ১৯*, ৫২*, ৬২, ৭৫, ৯৬, ১০০, ১১০, ১১৪, ১৪৪, ১৬৯
গজনফর হোসেন খান (সরফরাজ খানের জামাতা) : ২৬*
গয়া : ১১০*, ১১৩*, ১৬৯*
গিয়াস খান : ১৪৩
গিয়াসপুর : ১০৩, ১৪৩
গিরিয়া : ১৮*, ১৯, ২৯
গুজরাট : ৮৭, ৮৮
গোওয়াছি ঘাট : ১৭৩
গোকুল চাঁদ : ৬৩, ৬৩*, ৬৪
গোজর বা গাজর খান : ৩৭, ৩৮, ৩৮*
গোদা গাড়ি : ৫৩, ৫৫
গোলাম আলী খান (গ্রন্থকারের পিতা ও সেনাপতি) : ৩২*, ৪৯*, ৫৯*
গোলাম আলী বেগ : ৯০, ১৭১
গোলাম মর্তুজা : ৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৩*, ১০১, ১৩১
গোলাম মোস্তফা খান (আফগান সেনাপতি) : ৩৯, ৪০, ৪১, ৪১*, ৪৩, ৪৪, ৪৫*, ৪৬, ৪৮, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৮*, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৩*, ৭৪, ৭৪*, ৭৫, ৭৫*, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৮*, ৭৯, ৮০, ৯৬, ৯৬*, ৯৮*
গোলাম হোসেন খান : ৩০, ১৬১, ১৬২, ১৬৬
গোলাম হোসেন খান তবতবায়ি সৈয়দ (সিয়ার রচয়িতা) : ১৮*, ৩৩*, ৪২*, ৪৮, ৪৮*, ৫৭*, ৭২*, ৭৬*, ৮১*, ১১৪*, ১১৭*, ১৩৩*, ১৩৭*, ১৪৩*, ১৬১*, ১৬২*, ১৬৩*, ১৬৬*, ১৬৯*, ১৭৬*
গোলাম হোসেন সলিম (রিয়াজ রচয়িতা) : ১৮, ২২*, ২৩*

ঘ

ঘউস খান (মোহাম্মদ) : ২২, ২৪
ঘয়রত খান : ৮৮, ৮৮*
ঘসেটি বিবি (আলিবর্দীর কন্যা) : ৩*, ২৯*, ৩৫*, ৬৩*, ৬৪, ৬৪*, ১৩৯*, ১৪৬, ১৫৭, ১৫৯*, ১৬০, ১৬০*, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৫*, ১৬৮*
ঘালিব আলী খান সৈয়দ (সিয়ার রচয়িতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা) : ১১৪*
ঘোড়াঘাট : ১৬*, ৭৪*

চ

চন্দনগড় : ৫৬
চম্পক নগর : ৮২

চম্পানগর : ১০৮
চাঁপাইদহ : ৮২
চিনরায় রায় রায়ান (রাজস্ব কর্মকর্তা) : ২৯, ১২১, ১২১*, ১৩১, ১৩১*
চিহিল সিতান : ১০০*, ১০১
চুনার গড় : ৭৮
চৈত্র (মাস) : ১৬০
চৌথ : ৪২, ৪২*
চৌপালাহ্ : ১০২*

ছ
ছোটনাগপুর : ৫৫*

জ
জগৎ ইসর : ৪১*
জগৎশেঠ : ১৫, ২১*, ২৩*, ২৫*, ৫০, ৫১, ৫১*, ৭৪, ১০৫, ১০৫*, ১৬০, ১৭৪*, ১৭৯*, ১৮০*, ১৮৬*, ১৯০*
জগদিশপুর : ২২*, ৭৭*
জজানকীরাম (রাজা) : ৪৫, ৪৫*, ৪৬, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ১১৬, ১২০, ১৩৭, ১৪১, ১৪১*, ১৪২, ১৪৩, ১৪৩*, ১৪৪, ১৫৫, ১৬৫, ১৭২
জমিদার : ৩৭, ৩৭*, ৪৬, ৭৪, ৭৪*
জমিনাহ্ (স্থান) : ৭৭
জয়ন বা য়ুয়ন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বতজঙ্গ (আলীবর্দীর জামাতা) : ৩*, ১৬, ১৬*, ১৮, ১৮*, ৩১, ৩১*, ৪৮, ৫৭, ৫৭*, ৭১, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৬*, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৬*, ৯৫, ৯৮*, ৯৯, ৯৯*, ১০০, ১০০*, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৩*, ১০৯, ১১২, ১১৩, ১৪৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৬*, ১৫৭, ১৬৫, ১৮০*,
জলঙ্গি : ৫৪*
জলেশ্বর : ৩৪, ১৩৩, ১৩৩*
জসারত খান (সওলত জঙ্গের পুত্র) : ৩*
জাগরবর ভঞ্জ (ময়ূরভঞ্জেরাজা) : ৪১
জাগির ভূমি : ৭২*
জাজনগর : ৫৬
জাজপুর ১২৪, ১২৪*, ১২৯
জানকি রায় (মোহন লালের পিতৃব্য) : ১৫২
জানুজ (মেরাঠা রাজা) : ১২৪, ১২৪*, ১২৯
জাফর খান (নবাব মুর্শিদকুলী খান) : ৫, ৫*, ৬, ৬*, ৭, ৭*, ১২*, ২৭*
জাফর খানের কাটরা : ৮২
জাফর খানের বাগান : ১৯, ১৯*, ৭৫, ৮২, ১০০, ১০২, ১০৫,
জাভেদ খান (খোজা) : ১৫২, ১৫৩
জাহান ইয়ার বেগ খান : ১১১,
জাহাঙ্গীরনগর : ২৬*, ২৯, ৩০, ৫২, ৫৪*, ৫৮*, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৫*, ১৬৫
জাহান শাহ্ (সম্রাট) : ২*, ৫*
জিনসি : ৪৮*, ১১০, ১১০*
জিয়া উল্লাহ্ খান : ১২৪*, ১৩১, ১৭৩
জেবুন্নেসা বা জিন্নতেন্নেসা (নবাব মুর্শিদকুলি খানের কন্যা) : ৫*, ৬*, ১০*, ১২, ১২*

ঝ
ঝাপাইদহ : ৮২*, ১০৯, ১০৭
ঝিকর (স্থান) : ৪৩
ঝিক্কা : ৪১, ৪৩

ট
টিকারী (স্থান) : ৮০, ১০৮, ১১০, ১১০*

ঢ
ঢাকা : ১*, ৫*, ১১*, ২৬*, ৩২*, ৪৭*, ৫৪*, ৬৩*, ১৬৫*

ত
তকী আলী খান : ৮১, ৮১*
তকী খান, নবাব (নবাব শুজা-উদ-দীনের পুত্র) : ১০*, ১১, ১২, ৮১*
তবকাত-ই-নাসিরী (গ্রন্থ) : ১২৪*
তাজ-উদ-দীন (হাকিম) : ১৪৪
তারকপুর : ৫১, ৫১*
তারিখ (গ্রন্থ) : ৬১*
তারিখ-ই-বঙ্গালাহ্ (মুনশি সলিম উল্লাহ রচিত গ্রন্থ) : ১*, ১৮*, ২১*, ২৩*, ২৪*, ২৫*, ২৬*, ২৭*, ২৮*, ৩০*, ৩৪*, ৩৫*, ৩৬*, ৩৭*, ৩৮*, ৩৯*, ৪০*, ৪২*, ৪৩*, ৫১*, ৫২*, ৫৫*, ৫৬*, ৬১*, ৬৬*, ১০০*, ১০৩*, ১১৬*
তারিখ-ই- বঙ্গালাহ্-ই-মহাবত জঙ্গী : ৪৯*
তুরানি মোঘল : ৪০*
তুর্কি : ২*
তেলিঙ্গা : ৩৯
তোরা : ৮৫
ত্রিপুরা (রাজ্য) : ৩২*, ৪৭*
ত্রিমোহিনী (খাল) : ১২৯
ত্রিহুত (রাজ্য) : ৭৫, ৯৮

দ
দস্তী : ৪৮*, ১১০, ১১০*, ১৩১
দাউদ আলী খান : ১১৭
দাউদপুর (স্থান) : ১৮০, ১৮৬*
দাক্ষিণাত্য : ৩, ৩৩, ৩৩*, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪২*, ৫১, ৬১, ৬৩, ৬৮, ৯২*, ৯২, ৯৭, ১২০, ১৪৮, ১৭২
দানশাহ্ : ১৮৯*
দারভাঙ্গা : ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১১২*, ১১৩
দিওয়ান : ৫*, ৪৭, ৬৩, ৬৬, ৮৭, ১২১, ১৩১, ১৩৫, ১৫৫, ১৬৪, ১৭২

দিলির খান : ১৭০
দিল্লী : ৫•, ৭•, ১৭•, ৩০, ৭২•, ৭৫•, ৯৭•, ১১২•, ১৩৫, ১৬০
দীন মোহাম্মদ খান : ১১৭
দুর্দানা বেগম (নবাব দ্বিতীয় মুর্শিদ খানের কন্যা) : ১০•, ৩২•
দুর্লভ রাম (রাজা): ১২৬, ১৩০, ১৩০•, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৪•, ১৪৫, ১৪৭, ১৫৫, ১৭৪, ১৭৪•, ১৭৮, ১৭৮•, ১৭৯•, ১৮১•, ১৮২•, ১৮৩•, ১৮৫
দোস্ত বেগ বদখশি : ১০৭, ১০৭•
দোস্ত মোহম্মদ খান (সেনাপতি) : ১১০, ১১০•, ১১২•, ১২৪, ১৭০, ১৭৪, ১৭৫

ধ
ধর্মদাস হাজারী : ১২৪, ১২৫, ১২৬

ন
নউল রায় : ১৪৭, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৪•
নওবত : ৬৯, ৬৯•, ৭০, ৮৭, ১১৬, ১৭৭
নওবাহার-ই-মুর্শিদ কুলি খান (গ্রন্থ) : ৪৭•
নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান (শাহাম্মত জঙ্গ) : ৩•, ২৯, ২৯•, ৩০, ৩১, ৪৭, ৫০, ৮৬•, ৯৩•, ১০৩•, ১০৭, ১৬৪, ১৮০
নওয়ারা : ২৯
নকতাবালি (স্থান) : ২৫•, ২৬•
নকী আলী খান (সৈয়দ, সিয়ার রচয়িতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা) : ৭৬•, ১১৪•
নকী কুলি খান : ১১৭
নজফ (শহর) : ৯•
নফিসা বা নাফিসা বেগম (নবাব শুজা খানের কন্যা) : ১, ১০•, ২৭, ২৭•, ২৮, ৩৩•, ১৪৬, ১৪৬•, ১৫৬, ১৫৭, ১৬৫, ১৬৫•
নসর উল্লাহ্ বেগ খান : ২৫, ২৯
নাগপুর : ৪২
নাদির শাহ্ (ইরানের শাহ্) : ১১•, ১২•, ৩০•
নানাজী (মারাঠা প্রধান) : ১২১, ১২১•, ১২৪, ১২৪•
নারায়ণগড় : ৩৪, ১৩৩
নারায়ণ সিংহ : ১৫২, ১৫৭
নাসির-উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ (সম্রাট) : ৩০•
নিকোসিয়র (শাহজাদা) : ২•
নিজাম-উল-মূলক আশফজাহ্ : ৩০•, ৩৮, ৩৮•, ৪২, ৪২•
নূর-উল্লাহ্ বেগ খান : ৪•, ৯১, ১০৭, ১১০
নূর-উদ্-দীন খান (নবাব শুজা খানের পিতা) : ১০•

প
পদ্মা (নদী) : ৫৩•
পলাশি : ৫১, ৫৪, ১৮০, ১৮০•, ১৮১•, ১৮৩•, ১৮৬, ১৮৬•
পাচেট (গিরিপথ) : ৪২, ৪৩, ৫৫, ৫৫•, ৫৬, ৯৩
পাটনা : ১৬•, ১৯•, ৫৭•, ১০৭•, ১৩৭•, ১৩৮, ১৪১•
পাঠান : ১০১•
পাল (তাবু) : ১২৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৬৯•
পালকি : ৪৫, ৪৫•
পাহ্‌লোয়ান সিংহ : ১৭১
পীরজাদা দান শাহ : ১৮৭•
পুণ্যাহ : ১৬০, ১৬১, ১৬১•, ১৬২•
পূর্ণিয়া : ১০৭, ১১৮, ১১৮•, ১১৯, ১৪০, ১৪৬, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৭•, ১৫৮, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, ১৮৫, ১৮৯
পোশতাহ্ : ১২৭, ১২৭•
প্ল্যাটু : ১৪৫

ফ
ফকির আলী খান : ৮১•, ১০৫
ফকির উল্লাহ বেগখান : ৪•, ৬৭, ৬৯, ৯১, ১১০, ১১১, ১২০•, ১২১, ১২৪, ১২৬
ফখর-উৎ-তেজার (মোহাম্মদ ওয়াজেদ) : ১৬৮, ১৬৮•
ফখর-উদ-দীন হোসেন খান : ১১৮, ১১৮•, ১১৯, ১১৯•, ১২০•, ১৩৫, ১৩৫•
ফখর-উদ-দৌলা : ১১
ফয়াজ আলী খান খোরাসানি : ১৬৩, ১৬৬
ফরমান : ৭০,৭০•
ফররুখ সিয়ার (সম্রাট) : ২•, ১১• ৮৮, ৮৮•
ফররুখাবাদ : ১৪৩, ১৫৩, ১৫৪
ফরাস ডাঙ্গা : ১৬৮, ১৭৮
ফলওয়ার (স্থান) : ৩৪
ফাতিমা বেগম (নবাব মীর কাসেমের বেগম) : ৯•
ফারসাঙ্গ : ৮১, ৮১•
ফারসি : ২•, ৪•, ১২•, ১৩•, ৪৪•, ৪৬•, ৪৯•, ৫০•, ৬৮•, ৭০•, ৭৪•, ৭৬•, ৭৮•, ৮০•, ৮২•, ৮৩•, ৮৮•, ১০০•, ১০২•, ১০৪•, ১০৫•, ১০৬•, ১০৭•, ১১১•, ১২১•, ১২৯•, ১৩৪•, ১৬৮•, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৮•
ফিরিঙ্গী : ১৬৭, ১৬৭•, ১৬৮, ১৬৮•, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৪•
ফিরোজমন্দ (শাহ্জাদা) : ২•
ফুলারটন (Fullerton) ডক্টর : ১৮৭•
ফৌজদার (ফৌজদারি) : ৬, ৮, ৮•, ১৫• ৬৪, ৭০, ৭১, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯৫, ১০৭, ১১৯, ১৩৩, ১৩৮, ১৪০, ১৫২

ব
বদাখসান : ১১•, ৪৭•
বহ্নিবেগম (আতাউল্লাহ্ খানের কন্যা) : ৮৬•, ১৩•
বরকন্দাজ : ১০৬•
বরখোরদার বেগ : ১৬১, ১৬২, ১৬২•,
বরোয়া (নদী) : ১২৯
বর্গী : ১৪•, ৫২, ৮৯•

বর্ধমান : ৪২, ৪৩, ৪৩* ৪৪*, ৪৬*, ৪৭, ৪৯*, ৫২, ৫৫, ৫৫*, ৫৬, ৬১, ৬২, ৭৯, ৮০, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ১২২, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৫*, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৭, ১৫৫, ১৬৬, ১৭২, ১৭২*

বলদাখাল পরগনাহ্ : ৪৭*

বসন্ত খাজা : ১১, ১১*, ৯৯

বাইজ : ১৪

বাঙলা, বাংলা : ৫*, ৬*, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১২*, ১৪, ১৭, ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ২৯*, ৩০, ৩০*, ৩১, ৩৩, ৩৩*, ৪২, ৪২*, ৪৩, ৪৩*, ৪৪*, ৪৬, ৪৭, ৪৭*, ৫০, ৫১, ৫৩*, ৬১, ৬১*, ৬২, ৬২*, ৬৩, ৬৬, ৬৯, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১০৯, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২০*, ১২২, ১২৮, ১৩০, ১৩০*, ১৪৭*, ১৪৮, ১৪৯, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬*, ১৬০, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯*, ১৭১, ১৮৭

বাজীরাও : ৬১, ৬১*

বাড় (স্থান) : ৬৯, ৬৯*, ৭০

বাবরজঙ্গ : ৬৯, ৬৯*, ৭০

বারবাটি (বা বড়ভাটি দুর্গ) : ১২৪, ১২৪*, ১২৭, ১২৭*

বারাণসি : ৪৭, ৭৭, ১৫১, ১৫৫

বারোয়া (স্থান) : ১২৯

বারোহ (স্থান) : ১২৪, ১২৪*

বালারাও : ৬১, ৬১,*, ৬২, ৬২*, ৬৩,

বালেশ্বর : ৩৪, ৩৪*, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪১, ৫২, ৫৬, ৭৮, ৮৯, ৯০, ১৩১, ১৩৩, ১৪৪, ১৪৭

বাহাদুর শাহ্ (সম্রাট) : ২*, ৪*, ১১*

বাহারিস্তান-ই-গায়েবী (গ্রন্থ) : ৬৪*

বিষ্ণুপুর : ৫৬, ৯৩, ৯৪

বিহার : ৫*, ১১, ১২, ১৭*, ১৯, ২১, ৩০*, ৫৭*, ৭৫*, ৭৭, ৮৭, ৯৮, ১০৯, ১১০, ১১৫*, ১২২, ১৪৪, ১৫৫, ১৬৯*, ১৭১

বীরভূম : ৫০, ৫২, ৭৮, ৮০

বীরুদত্ত রায় রায়ান : ১২১, ১৩১, ১৫৫

বুলন্দ খান (সর) : ৮০, ৮৩, ৮৩*

বুন্দেল খণ্ড (স্থান) : ৬১

বেতিয়া (স্থান) : ১১৩

বেদার বখত (শাহজাদা) : ২*

বেরার (রাজ্য) : ৫*, ৪২, ৪৭*

বেরিলী : ১৫২

বৈশাখ (মাস) : ১৬০

বোকাসিও (পণ্ডিত) : ১৩৯*

বোরহান-উল-মুলক (সাদত খান) : ৯৭,৯৭*

ব্লকম্যান (Blockman) : ৭৭*

ভ

ভগবান গোলা : ৯৬, ৯৭, ১০৫, ১০৬, ১১৭, ১৮৮, ১৮৮*, ১৮৯

ভদ্রক (স্থান) : ৪০, ১২৪, ১২৯, ১৮৫

ভদ্রক (নদী) : ১২৭, ১২৯

ভাগনগর (স্থান): ৫৩

ভাগলপুর (স্থান) : ৫৩, ৬১, ৬৪, ৮২, ৮৭*, ১৩৯

ভাগীরথী (নদী) ; ৫১, ৫২, ৫৩*, ৫৪, ৫৪*, ৫৫*, ৬১, ৬৩, ৬৭, ৮২, ৯৬, ১১৭

ভারত : ৯*, ১১*, ৪৭*, ১৬০

ভাস্কর পণ্ডিত : ৪২, ৪২*, ৪৩, ৪৩*, ৪৫, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৬*, ৫৭, ৬১, ৬২, ৬২*, ৬৩, ৬৬, ৬৬*, ৬৭, ৬৭*, ৬৮, ৬৮*, ৬৯, ৭৮, ৭৮*

ভোজপুর : ৭৯

ম

মখসুসাবাদ (স্থান) : ৬*

মঞ্জিল : ৯*, ২১, ২১*, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪১, ৫৫, ৫৮, ৬৩, ৭৮, ৯০, ৯০*, ১১২, ১৩৪

মতিঝিল (প্রসাদ) : ১৬৪

মদীনা : ১১৪*

মনকরা বা মানকরা (স্থান) : ৬১,৬৭

মনসুরগঞ্জ (প্রাসাদ) : ১৮৬*, ১৮৮

ময়ূরভঞ্জ (রাজ্য) : ৩৫*, ৪১, ৪১*, ৪৪*

ময়দান আলী খান : ১৫, ২০, ২২,

মর্তুজা খান : ২৮, ৮০, ৮১, ১৩১

মসনদ : ১৪, ৩০*, ৬২, ১০১*, ১৬১

মহানদা (নদী) : ১২৪, ১২৫, ১২৭

মহাবত জঙ্গ (আলিবর্দী খান) : ১, ১*, ১৩, ১৩*, ২১, ২৫, ২৭*, ২৮* ৩০*, ৩৪*, ৪০*, ৪৪, ৪৪*, ৪৬, ৫০, ৫৪, ৬৬*, ৭৪, ১০৯, ১১২*, ১১৫*, ১৫২*, ১৬৪, ১৬৪*, ১৭২, ১৮০*

মহাম-উদ-দৌলা : ৫৮*

মাত্রিকোহ : ৮০,

মানাঙ্গি (Manangi) : ১২৪

মানিক চাঁদ (দিওয়ান) : ৪৭, ৪৭,*, ৬৮, ১৩৬, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৮৪, ১৮৫

মালব : ২*

মারাঠা : ৪২, ৪২*, ৪৩, ৪৪, ৪৪*, ৪৫*, ৪৭, ৪৭*, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫১*, ৫২, ৫২*, ৫৫*, ৫৬*, ৫৭, ৬১,৬২, ৬২*, ৬৭, ৬৯, ৬৯*, ৮১, ৮২, ৮২*, ৮৩, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৭, ১০৫, ১০৫*, ১০৬, ১০৬*, ১৫৭*, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১২১, ১২২,*, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩০, ১৪৮*, ১৪৯, ১৪৯*, ১২৭, ১৩০, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৫*, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৮*, ১৪৯, ১৪৯*, ১৫১, ১৬৫*

মালদহ : ৫২, ৫৪*, ১১৭, ১৬৮, ১৮৮*, ১৮৯

মাসির-উল-ওমারা (গ্রন্থ) : ৫*

মাহি-উৎ-তোজার (শাহজাদা) : ২*

মাহী ও মোরাত্তাব : ১৭৭
মিঠাপুর (স্থান) : ৭৬
মিনকারা (স্থান) ৭৭
মিনহারি (স্থান) : ১৭০
মিনুচিহির খান : ১৬, ২৮
মীনহাজ (ঐতিহাসিক) : ১২৪*
মীর আবু-উল-মালী : ৯৭, ৯৮, ৯৯
মীর আলী : ৯০
মীর আলী ইয়ার খান : ১১৮*
মীর আব্দুল আজিজ : ৩৫*
মীর আল্লাহ্ ইয়ার খান : ১১০, ১১০*
মীর ইওয়াজ আলী : ১৫০
মীর ইসমাইল : ৮৯, ৮৯*, ১৩৬, ১৩৬*
মীর কলন্দর : ৫২, ৫২*, ৬৪
মীর কাজেম খান (নবাব মীর জাফরের ভাই) : ৯*, ১১০, ১৭০*
মীর কামিল : ২৪
মীর কাসিম খান : ১১০*
মীর কাসিম খান (আলীজা, নবাব) : ৯*, ৫৯*, ১৬৯, ১৮৭*, ১৯০, ১৯০*
মীর কুদরত উল্লাহ্ : ১৬৪
মীর গদাই : ২৪
মীর গোলাম আলী : ৯০, ১৬৪
মীরজাই : (সওলত জঙ্গের পুত্র) : ৩*
মীর জান মোহাম্মদ : ৯
মীর দাউদ খান (মীর জাফরের ভ্রাতা) : ৯*, ১৮৯
মীর দিলির আলী খান : ২৪
মীর ফজলে আলী : ১২৩
মীর মদন (সেনাপতি) : ১৮১*, ১৮২, ১৯২*, ১৮৩*, ১৮৪*
মীর মর্তুজা খান : ৯, ১৫, ২২
মীর মোহাম্মদ আদাম উল্লাহ্ : ১১৭
মীর মোহাম্মদ কাজিম খান : ১১০, ১১০*, ১২৪, ১৭০, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯
মীর মোহাম্মদ কাজেম খান : ১২৪, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭
মীর মোহাম্মদ আদামাল্লাহ্ জামাল রাফতি : ১০৭
মীর মোহাম্মদ জাফর খান (নবাব) : ৯, ৯*, ২৯, ২৯*, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪৮, ৫৪, ৫৯*, ৬৭, ৬৯, ৮১, ৮৯, ৮৯*, ৯০, ৯১, ৯১*, ১০৭, ১০৭*, ১১০*, ১২৪, ১২৬, ১৩৬, ১৩৬*, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৪*, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৬৬, ১৬৬*, ১৬৭*, ১৬৮*, ১৭০, ১৭৪, ১৭৪*, ১৭৮, ১৭৯, ১৭৯,*, ১৮০, ১৮০*, ১৮১*, ১৮২, ১৮৩, ১৮৩*, ১৮৪*, ১৮৬*, ১৮৭, ১৮৭*, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯০*, ১৯১
মীর মোহাম্মদ মাসুম : ১০৮
মীর মোহাম্মদ রেজা : ৫২*
মীর শরফ-উদ-দীন : ১৬*, ১৬৪
মীর শরীফ : ৫১, ৫১*,
মীর সিরাজ-উদ-দীন : ২৪
মীর সুপন : ৯*
মীর সৈয়দ মোহাম্মদ বসাউল : ১৩৪
মীর হাবিব উল্লাহ্ খান শিরাজী : ৩২*, ৪৭, ৪৭*, ৪৮, ৪৮*, ৫০, ৫০*, ৫১, ৫১*, ৫৬, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৩*, ৯৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৭, ১৪৮, ১৪৮*, ১৪৯*, ১৫০, ১৫১, ১৫১*
মীর হাসান আলী : ১৫০
মীরন (মীর জাফরের পুত্র) : ১১২*
মীর্জা আকবর কুলি খান : ৮৭*
মীর্জা আতা ইয়ার (আলিবর্দীর সৎভাই) : ৩*
মীর্জা আমিন খান (আলিবর্দীর সৎভাই) : ৩*
মীর্জা আল্লাহ্ ইয়ার খান (আলিবর্দীর সৎভাই) : ১৭২
মীর্জা আহমদ খান (হাজী আহমদ) : ২, ৩, ৩*, ৪
মীর্জা তকী খান : ৮৭*
মীর্জা নজর আলী : ৩০
মীর্জা নথন : ৬৪*
মীর্জা প্যারন ওরফে মীর্জা মোহাম্মদ (?) : ৫২
মীর্জা বন্দি বা বন্দে (আলিবর্দী খান) : ১*, ৩*
মীর্জা বরখোরদার : ১৬১, ১৬২, ১৬২*
মীর্জা বাকের আলী বা বাকের খান (উড়িষ্যা) : ১০*, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬*, ৩৭, ৩৭*, ৩৮, ৩৮*, ৩৯, ৩৯*, ৪০, ৪২, ৩৮
মীর্জা মীরক : ২৯*
মীর্জা মেহদি (জয়ন-উদ-দীন আহমদ খানের পুত্র) : ৩*, ১৩*, ১৬*, ১০০, ১১২, ১৫৬
মীর্জা মোহাম্মদ (আলিবর্দীর পিতা) : ১, ২, ৩*, ৪, ৪*
মীর্জা মোহাম্মদ আলী (আলিবর্দী খান) : ১, ২, ৩*, ৪, ৬ ৮,
মীর্জা মোহাম্মদ ইয়ার খান ওরফে প্যারন (আলিবর্দীর সৎভাই) : ৫২, ৫২*, ১১৯*
মীর্জা মোহাম্মদ ইরাজ খান (সিরাজের শ্বশুর) : ২৪, ৮৬, ৮৭*, ৮৮, ১১০, ১১২*, ১২২, ১৪২
মীর্জা মোহাম্মদ রেজা (নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান) : ৮
মীর্জা মোহাম্মদ মোস্তফা কুলি খান : ৮৭, ৮৭*, ১৪২, ১৪২*, ১৪৩, ১৪৩*
মীর্জা মোহাম্মদ সালেহ : ১০৯, ১১০, ১৫০, ১৫১, ১৮৬, ১৮৬*
মীর্জা মোহাম্মদ সাঈদ (সৈয়দ আহমেদ খান) : ৮
মীর্জা শাহ্ কুলি খান : ৮৭
মীর্জা শাহরিয়ার খান (আলিবর্দী ভ্রাতা) : ৩*
মীর্জা হাকিম বেগ : ১২৩
মীর্জা হাবিব বেগ : ১৭১*
মুইজ-উদ-দীন (শাহজাদা) : ২*
মুকুন্দদেব : ১২৭*
মুখলিস বা মোখলিস আলী খান : ৩৪*, ৩৫*, ৪০, ৪০*, ৪১
মুখসুসাবাদ : ৪৬*

মুঙ্গের : ৭৫, ১০৮
মুৎসুদ্দি : ৬৬, ১৩৪, ১৬৯, ১৭৭
মুনএম আলী খান : ৭৯
মুফতি মিএগা উল্লাহ্ খান : ১১৭
মুবারক বা মোবারক মঞ্জিল : ১১*, ৩৩, ৪৩
মুরাদ খান : ৩০*, ৩৬*
মুরাদ শির খান : ১০০, ১০০*, ১০১, ১১২
মুর্শিদ কুলি খান (নবাব, দ্বিতীয়) : ১০*, ২৭*, ৩২, ৩৩, ৩৩*, ৩৪, ৩৪*, ৩৫, ৩৫*, ৩৬, ৩৬*, ৩৭, ৩৭*, ৪০*, ৪৭, ৪৭*
মুর্শিদ কুলি জাফর খান (নবাব) : ৫*, ৬,৬*, ৮*, ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৩*, ৮৬*
মুর্শিদাবাদ : ৫, ৫*, ৭, ৭*, ৮, ৯, ২১, ২৩*, ২৫, ২৬*, ২৭, ২৭*, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৩*, ৩৬, ৩৮*, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭*, ৫০, ৫১, ৫১*, ৫২, ৫৩, ৫৩*, ৫৮, ৬২, ৬২*, ৬৩, ৬৪, ৬৪*, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭০*, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৭৮*, ৮২, ৮৩, ৮৩*, ৮৭, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৩*, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ৯৮*, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১৩, ১১৬, ১১৭*, ১১৯, ১১৯*, ১২৩, ১৩১, ১৩২, ১৩২*, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৮*, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯
মুহিব আলীপুর (স্থান) : ৮১
মেদিনীপুর : ১১*, ৩৪, ৩৮, ৪১, ৪৯*, ৫০, ৫২, ৫৬, ৬১, ৬৩, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৩*, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭*, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৮*, ১৫১
মেহ্দি নিসার খান : (পরে সৈয়দ দ্র.)
মেহেরপুর : ১৩২, ১৩২*,
মোঘল : ১*, ১৩*, ৪০, ৪২, ৬৪*, ৭২*, ১০১*
মোজাফ্ফর আলী খান : ৮১, ৮১*,
মোজাফ্ফরনামা (গ্রন্থ) : ১*, ৪*, ৭*, ৮*, ১৪*, ২০*, ২১*, ২৭*, ২৯*, ৩৮*, ৪৩*, ৪৫*, ৫৫*, ৬৫*, ৬৭*, ৬৮*, ৬৯*, ৭৪*, ৮৪*, ৯৮*, ১০০*, ১০৩*, ১৫০*, ১৫৮*, ১৫৯*, ১৬০*, ১৬৪*, ১৬৫*, ১৬৬*, ১৬৭*, ১৭১*, ১৭২*, ১৭৫*, ১৭৮*, ১৮০*, ১৮৩*, ১৮৪*, ১৮৬*, ১৮৮*
মোবারেজ্জ-উল-মূলক সরবলন্দ খান : ৮৮
মোয়াজ্জেম (শাহজাদা, পরে সম্রাট বাহাদুর শাহ) : ২*, ১১*
মোরিদ খান : ৩০, ৩১
মোসাহিব খান : ৪৪, ৪৪*
মোস্তফা কুলি খান : ৮৭
মোহনপুর : ১১৭
মোহনলাল (রাজা) : ১৬৯, ১৬৯*, ১৭১, ১৭২, ১৭৭, ১৭৭*, ১৭৯, ১৮১, ১৮৩*, ১৮৪, ১৮৪৮, ১৮৫
মোহন সিংহ : ১০৯
মোহাম্মদ ইবরাহিম (শাহজাদা) : ২*
মোহাম্মদ ওয়াজের ফকর-উৎ-তেজার : ১৬৮, ১৬৮*
মোহাম্মদ খান বিন্নাস : ১৫৩
মোহাম্মদ রেজা : ৫২*
মোহাম্মদ শাহ্ (সম্রাট) : ২*, ১২, ১৪, ৩০*, ৫৭*, ৫৮, ৬১, ৭০, ৭৭, ৯৭*, ১১৪, ১১৪*
মোহাম্মদ সাইদ : ১৬৪*
মোহাম্মদ সুলতান, (অওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র) : ২*
মোহাম্মদ হাদি : ৫*

য

যদুনাথ সরকার (স্যার) : ১২*, ১৯*, ২১*, ২৩*, ২৪*, ২৫*, ২৮*, ২৯*, ৩০*, ৩৫*, ৩৯*, ৪৩*, ৪৪*, ৪৫*, ৪৬*, ৪৭*, ৪৯*, ৫০*, ৫৪*, ৬০*, ৬২*, ৬৩*, ৬৫*, ৬৮*, ৬৯*, ৭০*, ৭২*, ৭৮*, ৮২*, ৯২*, ৯৩*, ৯৪*, ৯৯*, ১০০*, ১০২*, ১০৩*, ১০৪*, ১০৫*, ১০৬*, ১০৭*, ১১২*, ১১৬*, ১১৮*, ১১৯*, ১২২*, ১২৪*, ১২৫*, ১২৬*, ১২৮*, ১৩০*, ১৩১*, ১৩২*, ১৩৩*, ১৩৪*, ১৩৫*, ১৩৬*, ১৩৭*, ১৩৮*, ১৩৯*, ১৪১*, ১৪২*, ১৪৩*, ১৪৪*, ১৪৫*, ১৪৭*, ১৫০*, ১৫২*, ১৫৭*, ১৫৮*, ১৫৯*, ১৬২*, ১৬৩*, ১৬৫*, ১৭১*, ১৭৫*, ১৮৪*, ১৮৬*
যশোবন্ত নগর : ১৪৩*
যুগোল কিশোর : ১৬, ১৭, ২৮*, ৩০*

র

রংপুর : ১৬, ১৬* ৩৬, ৫২
রওশন আখতার শাহজাদা (পরে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্) : ২*, ৫*
রওশন খান : ৩৫, ৯৮, ১৬৫, ১৬৫*
রওশনাবাদ (ত্রিপুরা রাজ্য) : ৩২*, ৪৭*
রফি-উদ্-দরজাত (শাহজাদা) : ২*
রফি-উদ্-দৌলত (শাহজাদা) : ২*
রফিউল কদর (শাহ্জাদা) : ২*
রঘুজী ভোঁসলা : ৪২, ৪২*, ৪৭*, ৬১, ৬১*, ৬২, ৬৩, ৭৭, ৭৮, ৭৮*, ৭৯, ৮০, ৮০*, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৩*, ৮৯, ৯০, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১২১, ১৫০, ১৫১, ১৫১*
রহম খান (আফগান সেনাপতি) : ৫৪, ৭৪, ৭৮, ৮১, ১০৩, ১১০, ১১১
রহীম খান (সেনাপতি) : ৪৮, ৫৪
রাজঘাট : ১৬, ১৩৩
রাজ বল্লভ(রাজা) : ৩৫, ৬৫, ১৬৫, ১৬৫*
রাজশাহী : ৫২, ৫৩, ৫৩*, ১৬৯*
রাজমহল (আকবরনগর) : ৮*, ৯, ১৫*, ১৬*, ১৯, ৪৩*, ৫২, ৬১, ৮৬, ১১৭, ১৪৫, ১৬৫, ১৮৮*

রাজারাম : ১৪২, ১৮৭
রানীর সরাই : ১১০
রাবেয়া বেগম (আলিবর্দীর কন্যা ও সওলত জঙের স্ত্রী) : ৩*, ১৫*, ৮৬*
রাবেয়া বেগম (হাজী আহমদের কন্যা ও আতাউল্লাহ্‌র স্ত্রী) : ৩, ১৫*, ১৯*, ৮৬*, ১৩৯*, ১৫৪, ১৫৪*
রাম নারায়ণ : ১৫৫, ১৬৯
রায়গ্রাম : ১১০
রায় রায়ান আলমচাঁদ : ২৫, ২৫*, ২৯, ২৯*, ৮৫, ১৫৫
রিয়াজ-উস-সালাতিন : ২*, ৩*, ৭*, ১১*, ১৬*, ১৭*, ১৮*, ২১*, ২২*, ২৩*, ২৪*, ২৫*, ২৬*, ২৭*, ২৮*, ২৯*, ৩০*, ৩৪*, ৩৫*, ৩৬*, ৩৭*, ৪০*, ৪১*, ৪৩*, ৪৪*, ৪৭*, ৫১*, ৫২*, ৫৪*, ৫৫*, ৫৬*, ৫৭*, ৬১*, ৬৩*, ৬৬*, ৬৭*, ৬৮*, ৬৯*, ৭৪*, ৭৫*, ৭৬*, ৭৭*, ৭৮*, ১০০*, ১০৩*, ১০৬*, ১১২*, ১১৫*, ১১৬*, ১১৭*, ১৭২*, ১৮০*, ১৮৬*, ১৮৯*, ১৯০*
রুদখানা-ই-মহানদা (নদী) : ১২৪*
রেনেল (মানচিত্র কারক) : ১৯*

ল
লক্ষ্মী : ১৫৪*
লালবাগ : ১২৭*
লুৎফ-উল্লাহ (দ্বিতীয় : মুর্শিদকুলি খান) : ৩২*
লুৎফুন্নেসা বেগম (সিরাজ মহিষী) : ৮৮*, ১৯০*

শ
শওকত জঙ (পূর্ণিয়ার নবাব) : ৩*, ১৬৮, ১৬৮*, ১৬৯, ১৬৯*, ১৭০, ১৭০*, ১৭১, ১৭২
শন রেখা (Shanrekha = সুবর্ণ রেখা) নদী : ১৩৩*
শমশির খান (আফগান সেনাপতি) : ৪৮, ৫৪, ৭৪, ৮১, ৯০, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০০*, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩*, ১২১, ১২২, ১৫২*
শামস-উদ্-দৌলা : ৪
শামস-উদ্-দৌলা খান দওরান : ১১*
শায়েস্তা খান (সুবাদার) : ২৯
শাহ্ আলম দ্বিতীয় (সম্রাট) : ২*
শাহ্ কুলি খান : ১*, ৮*, ৮৭
শাহ্ খানম (মীর জাফরের স্ত্রী) : ৩*, ৮*, ৯*, ৬৬*
শাহজাদা আজম : ৮৭
শাহজাদা আলী গওহর : ৫৭*, ১১৪*
শাহজাহান (সম্রাট) : ২*
শাহজাহানাবাদ (দিল্লী) : ৭০
শাহ দান (দানশাহ) : ১৮৯
শাহনওয়াজ খান সাফাভি ; ২*
শাহামত আলী খান : ২৫
শাহামত জঙ (নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান) : ৩১, ৩১*, ৩৩, ৫০*, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৫৮*, ৬৩, ৬৪*, ৬৫, ৭০, ৭০*, ৭৩*, ৭৫, ৭৫*, ৭৮, ৮২, ৮৪, ৮৪*, ৮৫, ৮৭, ৯৯, ১০৫, ১০৭, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১২৩, ১৩১, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৮*, ১৪০, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬০*, ১৬১, ১৬২, ১৬৪
শাহুরাজা (মারাঠা রাজা) : ৪২*
শিরাজ নগর : ৪৭*
শুকুর উল্লাহ্ খান (আকাবাবা) : ১০*, ১৪৬, ১৪৬*, ১৫৬, ১৬৫
শুজা আলী খান (হুগলীর ফৌজদার) : ২১*
শুজা-উদ-দীন মোহাম্মদ খান (নবাব শুজা খান) : ৩*, ৪*, ৫, ৫*, ৬, ৬*, ৭, ৭*, ৮, ৮*, ৯, ৯*, ১০, ১০*, ১২, ১২*, ১৩*, ১৪, ১৪*, ১৫*, ১৭, ২১, ২২*, ২৩*, ২৫*, ২৭, ২৭*, ৪৩*, ৪৭, ৪৭*, ৬৩, ৮৬, ৮৬*, ৮৮, ১৪৬, ১৪৬*, ১৫৫, ১৬৫
শুজাত আলী খান : ২১, ১৬৬, ১৬৮, ১৮৮
শেখ আবদুস সোবহান : ১২৮, ১৩০, ১৩০*,
শেখ জাহান ইয়ার খান : ১১০, ১১২, ১৭০
শেখ দীন মোহাম্মদ : ১০৭, ১১০, ১৪৬, ১৪৬*, ১৫৫, ১৬৫
শেখ পুরা : ৮০
শেখ মাসুম : ৪১, ৪৬*, ৪৭, ৫২, ৫৬, ৫৬*, ৫৭
শোন নদী : ৮০, ৮১

স
সওলত জঙ (সৈয়দ আহমদ খান) : ৩১, ৩৩*, ৩৬, ৩৭, ৩৭*, ৩৮, ৩৮*, ৩৯, ৪০, ৪০*, ৫০, ৫০*, ৫৮, ৬৭, ৭০, ৭১, ৮৯, ৯৪, ৯৯, ১০৫, ১১০, ১১৪, ১১৫, ১১৫*, ১১৭, ১১৮*, ১৩১, ১৩৭, ১৪০, ১৪৬, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৮
সদরুল হক খান (নবাব) : ১১৬, ১১৬*
সফদর খান : ১১৮*
সফদর জঙ (অযোধ্যার নবাব) : ৫৪, ৫৭, ৫৭*, ৫৮, ৭৭, ৭৭*, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪
সমসাম-উদ-দৌলা : ১১, ১১*
সর আন্দাজ খান : ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৬*
সরদার খান (আফগান সেনাপতি) : ৪৮, ৫৪, ৭৪, ৮১, ৯০, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২
সরফরাজ খান (নবাব) : ৭, ৭*, ১১, ১২, ১৪*, ১৫, ১৫*, ১৬, ১৬*, ১৭, ১৭*, ১৯, ২০, ২১, ২১*, ২২, ২২*, ২৩, ২৩*, ২৪, ২৪*, ২৫, ২৬*, ২৭*, ৩০, ৩৩*, ৮৬*, ৮৮, ১০৫, ১৪৬, ১৪৬*, ১৫১*
সরবুলন্দ খান : ১২৫, ১২৬
সরু (স্থান) : ১২৪
সলিমউল্লাহ মুনশি (তারিখ-ই-বঙ্গালাহ্ রচয়িতা) : ১*, ১৮*, ২৬*

সাইদ বা সৈয়দ আহমদ খান সওলত জঙ্গ (হাজী আহমদের পুত্র) : ৩*, ১০* ১৬, ১৮, ২৮, ২৮*, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৮৬, ৯৭, ১০০, ১০৬, ১১৮*
সাঈফ আলী খান : ১১৮*
সাঈফ খান (পুর্ণিয়া) : ১০৭, ১০৮*, ১১৭, ১১৮, ১১৮*
সাচক (অনুষ্ঠান): ১৫৬, ১৫৬*, ১৫৭, ১৫৮
সাদ-উদ-দীন আহমদ খান : ৩০
সাদ উল্লাহ্ : ১৫১, ১৫৩
সাদত খান বোরহান-উল-মূলক : ৫৭*, ৯৭*
সাবিত জঙ্গ (আতাউল্লাহ্ খান) : ৩১, ৩১*, ৫৮, ৬৪*, ৮৯, ১০৫, ১১৪
সাবিত জঙ্গ ফিরিঙ্গী (লর্ড ক্লাইভ) : ১৮৬
সায়সার (উপাধি) : ৩২*
সিকাকুল (স্থান) : ৩৬*
সিক্রিগলি (স্থান) : ১৯, ৩৪, ৪৩, ৮৭, ১০০, ১০০*
সিতাকুল (স্থান) : ৩৮*
সিয়ার-উল মুতাখ্খিরিন বা সিয়ার (গ্রন্থ) : ৪*, ৫*, ৭*, ৮*, ৯*, ১০*, ১২*, ১৪*, ১৫*, ১৭*, ১৮*, ২২*, ২৩*, ২৪*, ২৫*, ২৭*, ৩৩*, ৩৪*, ৩৫*, ৩৬*, ৩৭*, ৩৯*, ৪০*, ৪২*, ৪৩*, ৪৫*, ৪৯*, ৫০*, ৫১*, ৫২*, ৫৪*, ৫৫*, ৫৬*, ৫৭*, ৫৮*, ৬১,*, ৬২*, ৬৩*, ৬৪*, ৬৫*, ৬৬*, ৬৭*, ৬৮*, ৮১*, ৮২*, ৮৪*, ৮৯*, ৯০*, ৯১*, ৯২*, ৯৩*, ৯৪*, ৯৭*, ৯৮*, ৯৯*, ১০০*, ১০২*, ১০৩*, ১০৪*, ১০৫*, ১০৬*, ১০৭*, ১০৯*, ১১০*, ১১২*, ১১৪*, ১১৬*, ১১৭*, ১১৯*, ১২০*, ১২৪*, ১২৬*, ১৩৩*, ১৩৪*, ১৩৫*, ১৩৭*, ১৩৯*, ১৪২*, ১৪৩*, ১৪৬*, ১৫০*, ১৫১*, ১৫২*, ১৫৯*, ১৬০*, ১৬১*, ১৬৫*, ১৬৬*, ১৬৭*, ১৬৬*, ১৬৭*, ১৬৮*, ১৬৯*, ১৭১*, ১৭২*, ১৭৪*, ১৭৫*, ১৭৬*, ১৭৯*, ১৮২*, ১৮৩*, ১৮৪*, ১৮৬*
সিরাজ-উদ-দৌলা মীর্জা মোহাম্মদ (নবাব) : ৩*, ১৮*, ৩০*, ৩৩*, ৪৫*, ৪৭*, ৬৩*, ৬৫*, ৭৩*, ৮৪*, ৮৫*, ৮৬*, ৮৭*, ৮৮, ৮৮*, ৯৯*, ১১০*, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৩*, ১১৩*, ১১৪*, ১১৫, ১১৫*, ১১৬, ১১৬*, ১১৭, ১১৯, ১১৯*, ১২০*, ১২১*, ১২৫, ১২৫*, ১২৬, ১২৬*, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৭*, ১৩৮, ১৩৯, ১৩৯*, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪২*, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৫২*, ১৫৬* ১৫৯, ১৫৯*, ১৬০*, ১৬১, ১৬২, ১৬২*, ১৬৪, ১৬৪*, ১৬৫, ১৬৫*, ১৬৬, ১৬৭*, ১৬৮, ১৬৮*, ১৬৯, ১৬৯*, ১৭০, ১৭১, ১৭১*, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৬*, ১৭৭, ১৭৭*, ১৭৮, ১৭৯, ১৭৯*, ১৮০, ১৮০*, ১৮১*, ১৮২, ১৮২, ১৮৩, ১৮৩*, ১৮৪, ১৮৪*, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৮*, ১৮৯, ১৮৯*, ১৯০, ১৯০, ১৯১*
সুজান সিংহ ৮৯, ৮৯, ৯১
সুতি নদী : ২৪
সুবর্ণ রেখা নদী : ১৩৩, ১৫১
সুন্দর সিংহ (রাজা) : ১৪৮, ১১০, ১১০*, ১১২, ১১২*
সুরাট নগর : ৩২*
সৈয়দ হাকিম উল্লাহ আয়েসি (সিয়ার রচয়িতার পিতামহ) : ১১৪*
সৈয়দ আহমদ খান (সিয়ার রচয়িতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা) : ১১৪*, ১৪৬*
সৈয়দ আহমদ নজফী (মীর জাফরের পিতা) : ৮, ৯*
সৈয়দ উল্লাহ খান : ১৭৩
সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবতবায়ি (সিয়ার রচয়িতা) : ৫৭*, ৭২*, ৮১*, ৯৯*, ১১৪*, ১১৭*, ১২০*, ১৩১*, ১৩৭*, ১৪০*, ১৬১*, ১৭১*, ১৭৬*
বসয়দ নকী খান (সিয়ার রচয়িতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা) : ১৭১, ১৭১*
সৈয়দ নিশান জামিল খান : ১১৪
সৈয়দ নূর : ১২৪, ১২৫
সৈয়দ মুরাদ খান : ১০*, ২৭*
সৈয়দ মেহদি নিসার খান (সিয়ার রচয়িতার চাচা) : ৯৯, ৯৯*, ১১৪, ১১৪*, ১১৭, ১১৯, ১৩১, ১৩১*, ১৩২, ১৩৭, ১৩৭*, ১৩৮, ১৪১, ১৪২*, ১৪৩*
সৈয়দ মোহাম্মদ ইসাউল : ৯১, ৯১*
সৈয়দ রাজি খান : ১০*, ২৭*, ১৪৬*
সৈয়দ সাদাকাত মোহাম্মদ খান (মীরন) : ৯*, ৯৩
সৈয়দ হাদি খান (হাকিম) : ১৪৪, ১৪৫
সৈয়দ হাদি খান (হাজী) : ১৪০, ১৪৫
সৈয়দ হেদায়েত আলী খান (সিয়ার রচয়িতার পিতা) : ৫৭*, ১১৪, ১১৪*, ১১৭*, ১১৯, ১২৪, ১৩১, ১৭১, ১৭১*
সৈয়দ হোসেন খান ২৫
সৈয়দ হোসেন আলী ; ৮৮*
স্টার্লিং (Starling) : ১২৭*

হ

হাজী আবদুল্লাহ্ খোরাসানি : ৫*
হাজী আহমদ (আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) : ৮, ৮*, ১৫, ১৫*, ১৬, ১৭, ১৭*, ২০, ২২, ২৫*, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৪*, ৪০, ৪০*, ৪৭, ৪৮, ৪৮*, ৫০, ৫১, ৬৪,*, ৬৯*, ৭০, ৭০*, ৭১, ৭১*, ৮৩, ৮৬*, ৮৭, ৯৮*, ৯৯, ১০২, ১০২*, ১০৩, ১০৩*, ১৪৩*, ১৪৭*
হাজী আহমদ ওরফে হাজী আলম : ৭৫
হাজী মোস্তফা (সিয়ারের ইংরেজি অনুবাদক) : ১৮*, ১৩৯*
হাজী মোহাম্মদ আমিন : ৪০*
হাজী লুৎফে আলী খান : ১৫, ২২, ২৪, ২৮
হাজী শফি ইসফাহানী : ৫*, ৬*, ৮
হাফিজ উল্লাহ্ খান (সরফরাজ খানের পুত্র) : ১৩*, ১৭*, ২৬*,

হাবিব বেগ : ১১২
হায়দর আলী খান (সেনাপতি) : ৩০, ৩০*, ৪৮, ৫৪, ৮১, ৮৪, ১১০, ১১১, ১২২, ১২৩, ১৩১
হাসান মোহাম্মদ খান (সরফরাজ খানের জামাতা) : ১০*, ১৬*, ৮৬
হিজলী (স্থান) : ৩৮*, ৫৫, ৮০, ৮৯, ৯১
হিন্দুস্তান : ৩৩
হুগলী : ৫২, ৫২*, ৫৫, ৭০, ৭১, ৮৯, ১১৯, ১১৯*
হুমায়ুন বখত (শাহজাদা) : ২*
হেজাজ : ১৬৮, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭
হোসাম-উদ-দৌলা (আশিরদীর উপাধি) : ৩১, ৫৮, ৫৮*
হোসায়েন-উদ-দীন খান : ৬৫
হোসেন কুলি খান : ১৮*, ৩০, ৩০*, ৬৩, ৬৩*, ৬৪, ৬৫, ৬৫*, ৬৬, ৬৭*, ১১৭, ১৩১, ১৩৯, ১৩৯*, ১৫৯, ১৫৯*, ১৬০, ১৬০*, ১৬১, ১৬১*, ১৬২, ১৬২*, ১৯১*